কথা ছিল
ইমদাদুল হক মিলন

A New Dream , A New Destination
www.shopnil.com
we request you to join our text and voice chat

This Book Download From

www.shopnil.com

লনে দাঁড়িয়ে বাবা ডাকলেন, কী হলো মুনা! এত দেরি করছ কেন?

বাইরে তখন ভোরবেলার আলো মাত্র ফুটে উঠেছে। মুনাদের বাড়ির লনে সবুজ ঘাস আর কিছু পাতাবাহার ও গোলাপ হাসনুহেনার ঝোপ। ভোরবেলার ম্লান বিষণ্ণ আলোয় স্বপ্নের মতো লাগে।

লনের একপাশে হালকা আকাশি রঙের নতুন ঝকঝকে একটা মিটসুবিসি ল্যান্সার। সেই গাড়িটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির দারোয়ান সলিমুল্লাহ। তার হাতে পাতলা সিলোফিন পেপারে মোড়া বিশাল একটা ফুলের প্যাকেট। শুধু গোলাপের। ডাটি সুদ্ধ বড় বড় সব গোলাপ। ফুলগুলো তীব্র লাল।

সলিমুল্লাহর হাতে ফুলের প্যাকেট দেখে তার দিকে তাকিয়েছিলেন বাবা। কিন্তু একটা বলতে যাবেন, তখুনি দোতলার সিঁড়ি ভেঙে পাখির মতো লাফাতে লাফাতে নেমে এল মুনা। নীল রঙের জগিংস্যুট পরা। সদ্য ঘুমভাঙা পবিত্র সুন্দর মুখ। মুনার পায়ে ছিল নীল রঙের কেডস। বয়কাট করা মোলায়েম চুল উসকো-খুসকো। বিশাল সুন্দর চোখে এখনও রাতে দেখা মনোরম স্বপ্নের চিহ্ন।

বারান্দায় নেমেই বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল মুনা। হাই পাপা!

মুনার হাসি এত সুন্দর, মুহূর্তে আলোকিত হয়ে গেল চারদিক। মুনার গলা এত মিষ্টি, মুহূর্তে জলতরঙ্গের মতো মায়াবী শব্দ ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

মুনা বলল, আজ আমার একটু লেট হয়ে গেল পাপা।

বাবা মৃদু হেসে বললেন, ইটস অল রাইট ডার্লিং।

লেটস গো।

ইয়েস।

তখনই সলিমুল্লাহ এগিয়ে এল মুনার কাছে। ফুলের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এক সাহেব দিয়া গেছেন।

শুনে মুনা খুব চমকে ওঠে। কখন?

আপনেরা উঠনের অনেক আগে।

কী নাম?

নাম বলে নাই।

কী রকম দেখতে?

মোটর সাইকেল লইয়া আইছিল। দেইখা মনে হইল আপনের বন্ধু।

আমাদের বাড়ি কখনও এসেছে? আগে কখনও দেখেছ?

না।

শুনে মুনা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। আর চিন্তিত হলে যা হয়, মুনা তার নিচের ঠোঁটের ডান দিকটা কামড়ে ধরল। চোখে চলে এল উদাসীন দৃষ্টি।

বাবা বললেন, কী ব্যাপার মামণি ?

সঙ্গে সঙ্গে কামড়ে ধরা ঠোঁট ছেড়ে দিল মুনা। চোখের উদাসীনতা কেটে গেল তার। ফিরে এল স্বাভাবিক দৃষ্টি। কিছু না পাপা। তারপর একটু হেসে বলল, এক মিনিট পাপা। আসছি।

ফুলের প্যাকেট হাতে দৌড়ে আবার দোতলায়, নিজের রুমে চলে গেল মুনা। তারপর ফুলের প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রাখতে যাবে চোখে পড়ল প্যাকেটের ভেতর একটা খাম। সিলোফিন ছিঁড়ে দ্রুত খামটা বের করল মুনা। খামের ভেতর ছোট্ট একটা কার্ড। তাতে গোটা গোটা ইংরেজি হরফে লেখা, হ্যাপি বার্থ ডে টু মুনা। নিচে লেখা ওমর।

ওমর নামটা দেখে মুনা আবার একটু চিন্তিত হলো। অজান্তে কামড়ে ধরল নিচের ঠোঁটের ডানদিক। চোখে এসে গেল উদাসীন দৃষ্টি।

ওমর নামে মুনার কোনও বন্ধু নেই। ওমর নামের কোনও যুবককে চেনেই না মুনা।

তাহলে ?

কে, ছেলেটা কে ?

মুনার যে আজ জন্মদিন এটাই বা সে জানল কেমন করে!

নিচের ঠোঁটের ডানদিক কামড়ে ধরে, চোখে উদাসীন দৃষ্টি নিচে নেমে এল মুনা। বাবা অপেক্ষা করছেন। প্রতিদিন ভোরবেলা বাবার সঙ্গে জগিংয়ে বেরোয় মুনা।

পার্কের পাশে সুন্দর বিষণ্ণ একটা রাস্তা পড়ে আছে। ভোরবেলা রাস্তাটা খুব নির্জন। সেখানে কোনও গাড়ি নেই, লোকজন নেই, তখনও রোদ ওঠেনি বলে পার্কের গাছপালা থেকে অন্ধকার পুরোপুরি কেটে যায়নি। রাস্তাটা ডুবে আছে আবছা অন্ধকারে। তাকালে ঘুম-ঘুম একটা পরিবেশ চোখে পড়ে। এই রাস্তা দিয়ে বাবার সঙ্গে আস্তে ধীরে দৌড়চ্ছে মুনা। দুজনেই জগিংস্যুট পরা। পায়ে কেডস আছে। খানিক আগেই জগিংয়ে বেরিয়েছে তারা। এতক্ষণ দুজনেরই ঘাড়ে মুখে চিনির রোয়ার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

পাশাপাশি দৌড়ুতে দৌড়ুতে বাবা বললেন, ছেলেটা কে ?

কথাটা শুনে চমকে উঠল মুনা। বাবার দিকে তাকাল। কিন্তু বাবা তার দিকে তাকিয়ে নেই। সামনের দিকে তাকিয়ে দৌড়ুচ্ছেন। ফলে তাঁর মুখভঙ্গিটা বুঝা গেল না।

মুনা বলল, কোন ছেলেটা পাপা ?

বাবা আগের মতোই সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, খানিক আগে যে তোমাকে ফুলের প্যাকেট পাঠিয়েছে!

কি জানি, চিনতে পারলাম না!

বল কী! কী নাম ?

ওমর।

একটু থেমে কী ভাবলেন বাবা। তারপর বললেন, তোমার কোনও বন্ধু হবে।

না পাপা!

এবার মুহূর্তের জন্যে মুনার দিকে মুখ ফেরালেন বাবা। দুই ভুরুর মাঝখানে খাড়াখাড়ি তিনটে ভাঁজ পড়ল তাঁর। চিন্তিত হলে দুই ভুরুর মাঝখানে এ রকম ভাঁজ পড়ে বাবার।

বাবা বললেন, না মানে ?

মুনা নির্বিকার গলায় বলল, এ নামে আমার কোনও বন্ধু নেই।

মুহূর্তে চিন্তার ভাবটা কেটে গেল বাবার। খুবই সরল গলায় তিনি বললেন, তোমার তো অনেক বন্ধু। ওমর নামে যে কোনও বন্ধু আছে এই মুহূর্তে তুমি হয়তো তা মনে করতে পারছ না!

মুনা অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল। তারপর হেসে ফেলল। পাপা তুমি যে কি! যত বন্ধুই থাক, আমার বন্ধু তো। কেউ বুঝি বন্ধুর নাম ভুলে যায়!

বেশি থাকলে ভুলে যেতে পারে।

না। বন্ধু তো দূরের কথা ওমর নামের কাউকে আমি চিনিই না। এ নামে আমার কোনও পরিচিত লোক পর্যন্ত নেই।

বাবা এবার গম্ভীর গলায় বললেন, ছেলেটির আইডিয়া কিন্তু ভালো। আই মাস্ট এপরিশিয়েট।

মুনা আবার অবাক হলো। কী রকম ?

এই যে তোমার বার্থডের সকালবেলা ফুল পাঠিয়েছে।

কথাটা শুনে মুনা সামান্য চিন্তিত হলো। নিচের ঠোঁটের ডানদিকটা মুহূর্তের জন্যে কামড়ে ধরল। তারপর বলল, আজ আমার বার্থ ডে এটা জানল কী করে ?

জেনে নিয়েছে। এ জন্যই তো বলছি...

কী ?

আবার মুনার দিকে মুখ ফেরালেন বাবা। সামান্য হাসলেন। তোমার বন্ধু না হলেও, হয়তো তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় এমন কেউ হবে।

অমন কেউ বার্থডের কথা....।

হয়তো তোমার অন্য কোনও বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছে। ছেলেটি হয়ত তোমার সেই বন্ধুর বন্ধু, নয়তো পরিচিত। মানুষের বেশিরভাগ সম্পর্ক, বিশেষ করে বন্ধুত্ব, এভাবেই হয়।

www.shopnil.com

বাবার কথা শুনে আবার চিন্তিত হয়ে পড়ল মুনা। নিচের ঠোঁটের ডানদিক কামড়ে ধরল। মুহূর্তের জন্য চোখে চলে এল সেই উদাসীন দৃষ্টি।

পার্কের গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে একটি মোটর সাইকেল। হানড্রেড এইটি সিসি। লেটেস্ট সুজুকি। সিলভার কালারের ওপর নীল হরফে লেখা সুজুকি। মোটর সাইকেলটা দেখতে ভারি চমৎকার! সেই মোটর সাইকেলের ওপর চুপচাপ বসে আছে ওমর। আপাত দৃষ্টিতে চুপচাপ বসে আছে মনে হলেও ভেতরে ভেতরে খুবই উতলা হয়ে আছে সে। কারও অপেক্ষায় সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চঞ্চল দৃষ্টি তার। বেশ কিছুক্ষণ আগে ফুলের প্যাকেটটা জায়গামতো পৌঁছে দিয়ে এসেছে সে। এখন চলছে মানুষটির জন্যে অপেক্ষা। দূর থেকে তাকে এক পলক দেখা। ব্যস, আজকের মিশন ফিনিশ।

ওমরের পরনে হারা কোম্পানির ফেড জিনসের স্কিন টাইট প্যান্ট। পায়ে কাছাকাছি রঙের কেডস। একই কোম্পানির। গায়ে টাওয়েলের সাদা ফুল স্লিভ গেঞ্জি। গেঞ্জির বুকে লাল রঙে লেখা 'মার্লবোরো'। গলায় তিনহাত লম্বা কালো উলের মাফলার। মাফলারটা পেঁচিয়ে পরা হয়নি। ঘাড়ের ওপর এমন করে ফেলে রাখা হয়েছে, বুকের দুপাশ দিয়ে ঝুকে পড়েছে সেটা। দেখে মনে হয় না জিনিসটার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন আছে। কেন যে মাফলারটা ওভাবে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে ওমর!

ওমরের চুল বোম্বের নায়ক অনিল কাপুরের মতো। চেহারার ধাঁচটাও প্রায় ওরকম। ফুটফুটে মুখে ছোট্ট খাঁড়া নাক। তীক্ষ্ণ সুন্দর চোখ। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফে বেশ ধারালো, পুরুষালি চেহারা। দেখলে মনে হয় ওমর সহজে কোথাও হার মানে না। কোনও কিছুর পিছু নিলে সেটার শেষ না দেখে ছাড়ে না। এই যেমন এখন। ওমর বসে আছে একজন মানুষের জন্য। মানুষটি সামনের রাস্তা দিয়ে তার বাবার সঙ্গে দৌড়ে আসবে। ওমর দূর থেকে দেখবে। চোখ ভরে শুধু দেখবে। তারপর খুশি হয়ে ফিরে যাবে। কিছুদিন ধরে এই মানুষটিকে না দেখে দিন শুরু করতে পারে না ওমর। আজও দিন শুরু করার অপেক্ষায় আছে। কখন আসবে সে? কখন? তারপর একসময় মানুষটিকে দেখতে পায় ওমর। পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে শ্লো মোশানে দৌড়ে আসছে। পাশে তার বাবা। মানুষটার পরনে নীল রঙের জগিংস্যুট। দৌড়ে তালে তালে তার মাথার চুল নাচছে। দূর থেকেও ছবির মতো সুন্দর দেখায় তাকে। মোটর সাইকেলের ওপর বসে মুগ্ধ হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে ওমর। তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই এক সময় বলে, এই যে তুমি, শুভ জন্মদিন তোমার। ওমরের কথা কেউ শুনতে পায় না। কেবল নিজে শোনে নিজের কথা।

দোতলায়, সিঁড়ির বাঁদিকে মার স্টাডিরুম। সারাক্ষণ দরজা বন্ধ থাকে রুমটার। রুমের ভেতর ঘাস রঙের মোটা কার্পেট। তিন দিকের দেয়াল আড়াল করে রেখেছে বিশাল সব বুক সেলফ। ঠাসা বই একেকটা সেলফে। হঠাৎ করে তাকালে অভিজাত বইয়ের দোকান মনে হয়।

রুমের একপাশে একটা ডিভান। মাথার কাছে অটোবির তৈরি সিলভার কালারের সুন্দর ল্যাম্প। তার পাশে একটা ইজি চেয়ার। চশমা পরে, চোখের সামনে বই খুলে মা কখনও ডিভানে শুয়ে থাকেন, কখনও ইজি চেয়ারে। খাওয়া ঘুম এবং নিজস্ব সামান্য টুকটাক কাজ ছাড়া আর কিছুই করেন না তিনি। সারাক্ষণ স্টাডিরুমে। পড়ার বই শেষ হয়ে গেলে কখনও কখনও গাড়ি নিয়ে বেরোন। শহরের বিভিন্ন বই পাড়া তন্ন তন্ন করে, গাড়ি প্রায় বোঝাই করে নিয়ে আসেন বই। সংসার আগলায় ঝি-চাকররা। মা তাকিয়েও দেখেন না।

মার স্টাডিরুমের দরজাটা আজ হাট করে খোলা। বিকেলবেলা। দরজায় একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন মা। হাতে কোনও বইপত্র নেই। মুখটা খুবই বিষণ্ণ হয়ে আছে তার। তীক্ষ্ণ চোখে মার মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় কোনও একটা কিছুর তীব্র প্রয়োজন থাকার পরও হাতের কাছে জিনিসটা পাচ্ছেন না তিনি। ভেতরে ভেতরে সেই জিনিসটার জন্য উতলা হচ্ছেন। এই অবস্থায় বারান্দার রেলিংয়ের দিকে তাকিয়ে দু এক পলক রিখুকে দেখে নিচ্ছিলেন মা। বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিখু। শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে আছে তার। কনুই দুটো রেলিংয়ের ওপর রেখেছে। আর করতলে রেখেছে তার কদম ফুলের মতো সুন্দর কোমল কিশোরী মুখ।

রিখু তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। এইভাবে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা রিখুর প্রিয় অভ্যেস। পেছন থেকে মা যে তাকে দেখছে, রিখু তা জানে না। টেরও পাচ্ছিল না।

কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে কী দেখে রিখু! নাকি কিছু ভাবে! কার কথা? কার? আকাশের দিক থেকে রিখু একবার মুখ ফেরাল। সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর তাকাল মার স্টাডিরুমের দিকে। দরজা হাট করে খুলে মা আজ বসে আছেন স্টাডিরুমের দরজায়। দৃশ্যটা দেখে কেমন কৌতুক বোধ করল রিখু। মুচকি হাসল এবং মুহূর্তে বুঝে গেল মা কেন এভাবে স্টাডিরুমের দরজায় বসে আছেন। নিশ্চয় পড়ার মতো বই নেই হাতে। যা ছিল, শেষ হয়ে গেছে। হাতে বই না থাকলে মা খুবই অসহায় থাকেন। রিখু কি এখন মার কাছে এগিয়ে যাবে! মাকে খানিকটা সঙ্গ দেবে! কথা বলে, গল্প গুজব করে খানিকটা সময় কাটাবে! রিখু যখন এই কথাটা ভাবছে ঠিক তখনি ওমর বেরিয়ে এল তার রুম থেকে। বরফ রঙের প্যান্ট পরা। গায়ে ঠিক ওই রঙের মোটা সাদা শার্ট। পায়ে সাদা কেডস। ওমরের গলায় লম্বা সাদা একটা মাফলার ছিল। রুম থেকে বেরিয়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। কোনও দিকে তাকাচ্ছিল না। না রেলিংয়ে দাঁড়ানো রিখুর দিকে, না স্টাডিরুমের দরজায় বসে থাকা মার দিকে! ওমর এরকমই। কোনও

www.shopnil.com

ব্যাপারে মগ্ন হয়ে থাকলে পৃথিবীর আর কিছুই খেয়াল করে না সে। এখন নিশ্চয় ওরকম এক মগ্নতার ভেতর আছে ওমর।

ওমরকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে একটু নড়েচড়ে উঠলেন মা। চোখে কোনও কিছু পাওয়ার আশা ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর। মা ডাকলেন, ওমর!

চমকে মার দিকে তাকাল ওমর। তারপর বিরক্ত হলো। একটা পা নামিয়ে দিয়েছিল সিঁড়িতে, পাটা টেনে তুলল। মার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে শার্টের হাতা গোটাতে লাগল। মার দিকে না তাকিয়েই বলল, কী?

মা বললেন, তুই কি নিউমার্কেটের দিকে যাবি?

না।

একটু যা না?

সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে মার দিকে তাকাল ওমর। সামান্য বিরক্ত হলো। কেন?

বই নেই।

তো আমি কী করব!

নিউমার্কেট থেকে কিছু বই নিয়ে আসিস।

ওমরের হাতা গোটানোর ভঙ্গিটা অদ্ভুত। একবারে একটা গুটিয়ে শেষ করে না। প্রথমে বাঁহাতে একটা ভাঁজ দেয়। তারপর ডান হাতে ঠিক ওরকম একটা ভাঁজ। এইভাবে জায়গামতো গুটিয়ে নেয়। এখনো একই পদ্ধতিতে গোটাচ্ছিল। হাতা দুটো প্রায় জায়গামতো এসে গেছে, মার বই নিয়ে আসার কথা শুনে থেমে গেল।

হাত গোটানো রেখে মার চোখের দিকে তাকাল ওমর। তারপর স্ট্রেট বলল, পারব না।

মা কাঁচুমাচু গলায় বললেন, পারবি না কেন! সামান্যই তো কাজ!

কাজ সামান্য কি বিশাল সেটা কোনও কথা নয়। বই-ফইয়ের ব্যাপারে আমার কোনও আইডিয়া নেই। আমি কোনও লেখকের নাম জানি না।

এ কথা শুনে হেসে ফেললেন মা। লেখকের নাম জানার তোর দরকার নেই। বইয়ের দোকানে গিয়ে বললেই হবে নতুন যে সব গল্প উপন্যাসের বই বেরিয়েছে এককপি করে দিতে।

তুমি নিজেই যাও। গিয়ে নিয়ে এস। আমি পারব না।

ওমরের কথা শুনে মা একটু নিভে গেলেন। ম্লান গলায় বললেন, শরীরটা ভাল্লাগছে না। নয়ত আমিই যেতাম।

মার শরীর খারাপের কথা শুনে চিন্তিত না হয়ে বিরক্তই হলো ওমর। গলায় বিরক্ত এবং রাগ দেখা দিল তার। খেকিয়ে বলল, কী অত পড় সারাদিন! ভাব দেখে তো মনে হয় ইউনিভার্সিটির টিচার। প্রতিদিন ক্লাস থাকে, পড়াশুনা না করে ক্লাসে যেতে পারবে না। লেকচার ঝাড়তে পারবে না!

কথাটা পাত্তা দিলেন না মা। বললেন, যাবি?

যেতে তো হবেই। যে হারে রিকোয়েস্ট করছ! দাও, টাকা দাও।

কোলের ওপর পরে থাকা ব্যাগ খুলে বেশ কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করলেন মা। ওমরের দিকে এগিয়ে দিলেন।

সেলসম্যান অনেকগুলো বই নামিয়েছে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে বেছে নামিয়ে, সামনের কাউন্টারের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। ওমর বিরক্ত হয়ে বইগুলোর দিকে তাকাল। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মা যখন নিউমার্কেট থেকে বই এনে দিতে বলল, সেই মেজাজ বিগড়েছে ওমরের, এখনো সেই ভাবটা কাটেনি। ওমর বলল, এগুলো লেটেস্ট?

জি, মাসখানেকের মধ্যেই বেরিয়েছে সবগুলো।

এসব বই বিক্রি হয়? লোকে পড়ে?

সেলসম্যান হেসে বলল, জি, হয় স্যার। কিছু কিছু বিক্রি হয়। আবার কিছু কিছু হয়ও না। লোকে তো পড়েই। না পড়লে আমাদের ব্যবসা চলছে কেমন করে?

ডেইলি কী রকম সেল আপনাদের?

ভালই। সিজনে তো বেশ ভাল। পাঁচ দশ হাজার, কখনও তারও বেশি।

লোকটা আর কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওমর বুঝে গেল খেজুরে আলাপ করতে পছন্দ করে! অনেক দিন এ ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বলা হয় না তার। ওমর কি আর কিছু কথা বলবে তার সঙ্গে! এই যেমন কোন ধরনের লোক বেশি বই কেনে! মহিলা না পুরুষরা। মহিলা এবং যুবতী মেয়েরা কী ধরনের বই কেনে! পুরুষরা কেনে কী ধরনের। বাংলাদেশী কোন লেখকের বই বেশি চলে। ইত্যাদি।

ওমর বলল, বইগুলো প্যাকেট করে দিন।

সেলসম্যান অবাক গলায় বলল, সবগুলো?

হ্যাঁ।

দিচ্ছি স্যার।

লোকটার ভঙ্গি দেখে ওমর বলল, সবগুলো কি না এই প্রশ্নটা করলেন কেন?

লোকটা এসে বলল, এমনিতেই।

এমনিতে তো নয়ই। কারণটা বলুন তো?

আপনার মতো এভাবে কেউ বই কেনে না।

এবার হেসে ফেলল ওমর। পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে সিগ্রেট ধরাল। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আমি কখনও বই কিনি না। অভ্যেস নেই।

এই কথা শুনে সেলসম্যানটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। ফ্যাল ফ্যাল করে ওমরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

www.shopnil.com

ওমর বলল, আমার মা খুব বই পড়েন। সে কিছু লেটেস্ট বই নিতে বলেছে, নিয়ে যাচ্ছি।

সিগ্রেট টানতে টানতে আনমনে দোকানটার ভেতরে তাকাল ওমর। তাকিয়ে চমকে উঠল। সিগ্রেটে টান দিতে ভুলে গেল, চোখ ফেরাতে ভুলে গেল। মুহূর্তে কয়েকগুণ বেড়ে গেল তার হার্ট বিট। ব্যাপারটা ঘটল মুনাকে দেখে। দূরে একটা বুক সেলফের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুনা। মগ্ন হয়ে কী একটা বই দেখছে। ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় এইসব মুহূর্তে চারপাশের কোনও কিছুই চোখে পড়ে না তার। কোনও শব্দই ঢোকে না কানে।

মুনা আজ শাড়ি পরেছে। হালকা আকাশি রঙের শাড়ি। একই রঙের ব্লাউজ। দোকানের পরিচ্ছন্ন আলোয় মুনাকে দেখায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুবতীর মতো। মুগ্ধ হয়ে মুনার দিকে তাকিয়ে রইল ওমর।

সেলসম্যান বলল, স্যার!

ওমর চমকে উঠল। তারপর সেলসম্যানের দিকে মুখ ফেরাল। লোকটা বিগলিত হেসে বইয়ের প্যাকেটটা রাখল কাউন্টারের ওপর। প্যাকেট হয়ে গেছে।

ও আচ্ছা!

ওমর আবার সিগ্রেটে টান দিল। আবার তাকাল মুনার দিকে। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, কবিতার বই আছে আপনার কাছে? প্রেমের কবিতা?

লোকটা হেসে বলল, জি হবে।

যতগুলো হয় প্যাকেট করুন তো।

একসঙ্গে প্যাকেট করব?

না না, আলাদা।

লোকটা বুঝল বেশ এক পাগলের পাল্লায় পড়েছে সে। তবুও এই পাগল হচ্ছে লক্ষ্মী। কাস্টমার। মুগ্ধ হয়ে প্রেমের কবিতা খুঁজতে লেগে গেল সে।

মুনা তখন অন্য একটা বই টেনে নিয়েছে। মুগ্ধ হয়ে সেই বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছে। কোনও দিকে খেয়াল নেই তার। ভুলেও একবার চোখ তুলে তাকায় না।

কবিতার বইয়ের প্যাকেটটা হয়ে যেতেই প্রথমে পকেট থেকে টাকা বের করে সবগুলো বইয়ের দাম মেটাল ওমর। তারপর সেলসম্যানের কাছ থেকে কলম নিয়ে কবিতার বইয়ের প্যাকেটের ওপর লিখল, 'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা'। নিচে লিখল, ওমর।

তারপর কবিতার বইয়ের প্যাকেটটা সেলসম্যানের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, ওই যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, এই প্যাকেটটা ওকে দেবেন। কিছু বলতে হবে না। শুধু দিয়ে দেবেন।

ওমর আর কোনও দিকে তাকাল না। মায়ের জন্য কেনা বইয়ের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে, সিগ্রেট টানতে টানতে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

আপা, আপনার বই।

অবাক হয়ে সেলসম্যানের মুখের দিকে তাকাল মুনা। আমার বই মানে!

জি আপনার বই। এই তো। সবগুলো কবিতার বই।

সেলসম্যান হাসি হাসি মুখে বইয়ের প্যাকেটটা দেখাল।

মুনা বলল, আমি আপনাকে বই দিতে বললাম কখন?

না না, আপনি বলেননি, আপনি বলেননি। ওই যে সাহেব, উনি দিয়ে গেলেন।

সাহেব আবার কে?

ওই যে সাদা পোশাক পরা ছিল। গলায় সাদা মাফলার। ইয়া লম্বা।

কার কথা বলছেন!

আপনি চেনেন না?

নাতো!

লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ল! যা বাবা! আমাকে যে বলল

কী বলল আপনাকে?

আরে আপনাকে দেখিয়ে বলল বইয়ের প্যাকেটটা আপনাকে দিয়ে দিতে। দেখুন না এর মধ্যে আপনার নামও লেখা আছে। প্যাকেটের ওপরকার লেখাটা পড়ল মুনা। পড়ে চমকে উঠল।

তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা। ওমর।

আনমনে নিচের ঠোঁটের ডানদিকটা কামড়ে ধরল মুনা। দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে গেল তার। উদাসীন। মনে মনে মুনা বলল, ও আচ্ছা, তুমি আমার পিছু নিয়েছ, না! ঠিক আছে, দেখা যাবে! তুমি তো আমাকে চেন না। পিছু নাও, নিয়ে দেখ কী জিনিস আমি! বারোটা বেজে যাবে, কাজ হবে না।

মুনার ঠোঁটে আলতো একটা হাসি ফুটে উঠল।

ঘুমাবার আগে, বিছানায় যাবার আগে মুনার সামান্য সাজগোজ করার অভ্যেস। কাজের মেয়ে বিনী এসে বিছানা-টিছানা ঝেড়ে দেয়, বেডকভার পাল্টে দেয়। মাথার নরম বালিশ দুটো, কোল বালিশটা জায়গামতো রেখে চলে যায়। চলে যাওয়ার আগে মুনার দিকে তাকিয়ে অকারণেই একটু হাসে। এটা বিনীর স্বভাব। মুনা তার দিকে তাকাক বা না তাকাক হাসিটা বিনী হাসবেই। মানুষের যে কত রকমের ব্যাপার থাকে!

www.shopnil.com

বিনী বেরিয়ে যেতেই সারা ঘরে চমৎকার একটা রুম স্প্রে ছড়িয়ে দেয় মুনা। গন্ধটা জাসমীন পারফিউমের মতো। স্প্রে করার পর পরই ঘুম-ঘুম পবিত্র একটা গন্ধে ভরে যায় ঘর। মুনার চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে যায়। পাখির মতো হালকা হয়ে যায় শরীর। শূন্য মাথায় তখন কেমন উড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে তার। মুনা তারপর ড্রেসিংটেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বয়কাট করা চুলে অনেকক্ষণ ধরে ব্রাশ চালায়। ঘুমুবার আগে অনেকক্ষণ ধরে চুলে ব্রাশ করলে মাথায় রক্ত চলাচল ঠিক থাকে। ঘুমটা ভাল হয়!

চুল ব্রাশ করার পর মুখে হালকা করে ক্রিম মাখে মুনা। আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজের মুখটা দেখে। ঠোঁট বাঁকায়, দাঁত বের করে, জিভ নাড়ায় অথবা হঠাৎ করে দুটো লাফ দেয়। একা থাকলে কত কী যে করতে ইচ্ছে করে মানুষের!

মুনা তারপর ডাইভ মেরে তার বিছানায় পড়ে। পুরো বিছানাটা একবার গড়িয়ে আসে। মুনার পাতলা নাইটি হয়তো তখন এলোমেলো, কে খেয়াল করে!

এসবের খানিক পর বেডসুইচ টিপে ঘরের উজ্জ্বল আলোটা অফ করে মুনা। জ্বালিয়ে দেয় ডিমলাইট। মুনার ঘরের ডিমলাইটের রঙ নীল। হালকা নীল আলোয় মুনার ঘরটা যখন স্বপ্নের মতো হয়ে ওঠে, তখন একাকী কথা বলতে শুরু করে মুনা। কিন্তু কার সঙ্গে ?

মুনার একজন কাল্পনিক প্রেমিক আছে। পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর পুরুষ সে। সব চাইতে স্মার্ট। প্রেমিক পুরুষের কাছে মেয়েরা যা যা চায় বা চাইতে পারে তার প্রতিটিই আছে সেই প্রেমিকের। কোনও কিছুর কমতি নেই। না ভালবাসার না গুণের না সৌন্দর্যের!

বিছানায় শুয়েই সেই প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে মুনা। সারাদিনে ওই একবারই প্রেমিকের সঙ্গে প্রাণ খুলে, দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলতে পারে মুনা। এছাড়া আর অতক্ষণ ধরে কথা বলার সময় কই মুনার।

দিনেরবেলা হয়তো টুকরো টুকরো দুএকটা কথা ফাঁক ফোঁকরে বলা হয়, কিন্তু সেসব তেমন ইমপরটেন্ট কিছু না। প্রেমিকের সঙ্গে কথা যা হয় মুনার, সে এই রাতেরবেলা।

আজ বিছানায় শুয়েই মুনা বলল, এই জান, একজন আমার পিছু নিয়েছে। নাম ? ওমর। এখনও আমার সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়নি। বার্থডের সকালবেলা কী সুন্দর এক প্যাকেট ফুল পাঠিয়েছে! সেই ফুল দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। পাপা সামনে ছিল বলে উচ্ছ্বাসটা বেশি দেখাতে পারিনি। এমনিতেই পাপা দুএকটা কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ছেলেটা কে, ছেলেটার রুচি খুব ভাল! মাগো, ভেতরে ভেতরে লজ্জায় মরে যাই আমি।

শোন, আজ আরেকটা মজার কাণ্ড হয়েছে। নিউমার্কেট গেছি, টুকটাক কিছু কেনাকাটা ছিল। কী কেনাকাটা ? যাহ্, ওসব বলা যাবে না! মেয়েদের কত গোপন কেনাকাটা থাকে! সব তোমাকে বলা যাবে না! এই দুষ্টু ছেলে, খবরদার আর জানতে

চাইবে না। হ্যাঁ, শোন না, শোন না, কেনাকাটা শেষ করে একটা বইয়ের দোকানে ঢুকেছি। বই দেখছি, সেলসম্যান এক প্যাকেট কবিতার বই এগিয়ে দিল। সবগুলোই প্রেমের কবিতা। বই দেখে আমি তো একদম আকাশ থেকে পড়েছি। আমি বই চাইনি। কিছু না, জানি কিছু চাইনি। শুধু বই দেখছিলাম। সেলসম্যান বলল, এক সাহেব দিয়ে গেছে। বার্থডের সকালবেলা ফুলের প্যাকেটটাও হাতে নিয়ে দেখি, ওপরে লেখা, তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা। বোঝ, কী রোমান্টিক ছেলে! নিজের নামও লিখেছে। ওমর। এই, বুঝতে পারছ ব্যাপারটা ? আমার প্রেমে পড়েছে। মাতোয়ারা হয়ে গেছে। তুমি সাহেব আউট। ভিলেন দাঁড়িয়ে গেছে। আর ভিলেনটি বেশ রুচিবান, স্মার্ট। তুমি তার সঙ্গে পারবে না।

একাকী হি হি করে হাসতে লাগল মুনা। তারপর এক সময় উত্তেজিত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসল। কাল্পনিক প্রেমিকের উদ্দেশে বলল, এই তুমি ওকে একদিন ঠিক অমিতাভ বচ্চন স্টাইলে মারবে। মুখে চারটে ঘুষি মারবে। মুখ একদম থেতলে দেবে। জিউগ্রাফি পাল্টে দেয়া যাকে বলে, বুঝেছ ? পারবে না ? না পারলে কিন্তু আমাকে পাবে না। আমি ফুড়ুৎ হয়ে যাব। তুমি আমাকে কোথাও খুঁজে পাবে না! ওহো, তোমাকে তো বলা হয়নি, ড্রাইভিংটা কিন্তু শিখে ফেলেছি। সত্যি। সোয়্যার। পাপা বলেছে পাবলিকাটা আমাকে দিয়ে দেবে। কী মজা! কাল থেকে আমি একটা গাড়ির মালিক। এই, তুমি আমার সঙ্গে গাড়ি চড়বে ? আগে তো ছেলেরা ড্রাইভ করত। মেয়েরা বসে থাকত পাশে। এখন উল্টো। আমি ড্রাইভ করব তুমি বসে থাকবে আমার পাশে! হা হা, আমাকে বিয়ে করলে আর কিছু না পেলেও দুটো জিনিস কিন্তু পাবেই। কী পাবে বুঝতে পারনি ? দূর বোকা, দুটো গাড়ি পাচ্ছ তো। দুটো গাড়ি কোথায় ? আরে গর্দভচন্দ্র, দুটো গাড়ির একটা হলাম আমি অন্যটা হচ্ছে আমার পাবলিকা।

মুনা খিলখিল করে হেসে উঠল। বেশ জোরে। হাসতে হাসতে শব্দ করে বলল, ওমা হাসতে হাসতে টায়ার্ড হয়ে গেছি! শোন, আমি এখন ঘুমোব। আর পারছি না। গুড নাইট মাই লাভ।

বিকেলবেলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে মুনা। কদিন হলো ড্রাইভিংটা শিখেছে। হাত এখন পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়নি। তবুও বাবা তার পাবলিকাটা মুনাকে দিয়ে দিয়েছেন। ফলে যখন তখন গাড়িটা নিয়ে বেরোয় মুনা। সাঁ সাঁ করে ড্রাইভ করে! কখনও মুনার সঙ্গে থাকে তার বন্ধুবান্ধবরা। কখনও মুনা একা। একাকী সাঁ সাঁ করে গাড়ি চালায় সে। এ-রাস্তা থেকে ওরাস্তা, অকারণে ঘুড়ে বেড়ায় মুনা। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসলেই মন ভালও হয়ে যায় মুনার। কেন যে নিজেকে খুবই স্বাধীন মানুষ মনে হয়! গাড়িতে স্পিড তুলতে তুলতে মুনার মনে হয়, গতির আরেক নাম আসলে স্বাধীনতা। কিন্তু আজ গাড়ি নিয়ে বেরোবার পর থেকেই মুনা খুব আনমনা হয়ে আছে। গাড়িটা সে আস্তে ধীরেই চালাচ্ছিল। কিন্তু খেয়াল করছিল না কোনওদিকে। ফলে একটা খালি রিকশাকে

www.shopnil.com

www.shopnil.com

ধাক্কা দিল মুনা। তেমন জোরে ধাক্কা নয়। তবুও রিকশাটা প্রায় কাগজের বাক্সের কায়দায় উল্টে গেল। ভাগ্যিস রিকশায় কোনও যাত্রী ছিল না। রিকশাঅলাটা ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল খুব বেশি ব্যথা পায়নি সে। এ ধরনের ঘটনা চোখের ওপর কখনও ঘটতে দেখেনি মুনা। মুনা শুনেছে, অনেকেই নাকি ড্রাইভিং করতে গিয়ে রিকশা-টিকশা উল্টে দেয়। কিন্তু সেই উল্টে দেয়া যে এই রকম মুনার ধারণা ছিল না। কাণ্ডটা চোখের ওপর ঘটতে দেখে এতটা ঘাবড়ে গেল মুনা, যে ক্ষেত্রে গাড়ি নিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যাবার কথা তার, সে ক্ষেত্রে মুনা করল কী বোকার মতো গাড়িটা থামিয়ে দিল। মুহূর্তে তার গাড়ির চারপাশে লেগে গেল প্রচণ্ড ভিড়। কত রকমের যে লোক! কত রকমের যে চেহারা তাদের! মুহূর্তে ঘেমে গেল মুনা। ভিড়ের মধ্যে রিকশাঅলাটাও ছিল। অযথা আহা উহু করছিল সে। এক সময় ভিড় ঠেলে মুনার গাড়ির সামনে এগিয়ে এল সে। তারপর গাড়ির জানালায় মুখ রেখে বিটকেরে গলায় বলল, গাড়ির মাইদ্যে বইলে মানুষরে আর মানুষ মনে অয় না, না!

রিকশাঅলার কথা শুনে পর পর দুটো ঢোক গিলল মুনা। তারপর কিছু একটা বলতে যাবে, শুনল ভিড় করা লোকজন সব হো-হো হি-হি খিক-খিক, বিভিন্ন রকমের শব্দ করে হাসছে। সেই হাসির শব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল মুনার।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলল, আদম বেপারির মাইয়া মনে হয়!

আরেকজন বলল, হ। নতুন পয়সাপাতি অইছে। নাইলে এই বয়সী মাইয়ারা গাড়ি চালায় নিহি!

শুনে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল মুনা। একবার মনে হলো এসব কথা কেয়ার না করে, কাউকে পাত্তা না দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে যাবে। পরে যদি গাড়ির নাম্বার টুকে রেখে কেউ কেস করে, তখন দেখা যাবে!

কিন্তু উপায় নেই। গাড়ি নিয়ে এই ভিড় থেকে বেরুনো যাবে না। সামনে অজস্র লোক। গাড়ি চালাতে গেলেই চাপা পড়বে। সেটা আরও ভয়াবহ ব্যাপার হবে। মার্ডারার হয়ে যাবে মুনা।

তখুনি ভিড়ের একজন লোক খুব নির্বিকার গলায় বলল, যা করার হেইডা তো করছেনই মেমসাব।

দেন, রিসকাআলারে কিছু টেকা পয়সা দিয়া দেন, যাউগ গা। গরিব মানুষ।

মুনা সরাসরি লোকটার দিকে তাকাল। খুবই কুৎসিত দেখতে লোকটা। ভাঙাচোড়া মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, কাকের বাসার মতো। পরনে নীল রঙের একটা লুঙ্গি, কতদিন যে ধোয়া হয় না লুঙ্গিটা কে জানে! গায়ে গোলাপি রঙের হাফহাতা একটা শার্ট। সেটার অবস্থাও লুঙ্গিটার মতোই। ধোয়া তো হয়ই না। লোকটার হাতে সস্তা সিগ্রেট। ফুক ফুক করে সিগ্রেট টানছিল সে। ধোয়া ছাড়ছিল মুনার দিকে। সেই ধোঁয়ার কী যে বাজে গন্ধ! মুনার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তবুও কিছু করার নেই তার। করুণ মুখে লোকটার দিকে তাকাল মুনা। বলল, কত দিতে হবে?

খাড়ান, কইতাছি।

রিকশাঅলার কানে কানে ফিসফিস করে কী বলল লোকটা। রিকশাঅলা খুবই বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল। যেন খুবই উপকারী কোনও বন্ধু বিপদে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ভাবখানা এ রকম। প্রায় মিনিট দুয়েক ফিসফিস করে পরামর্শ করল রিকশাঅলা আর সেই লোকটা। তারপর দুজনেই এসে দাঁড়াল মুনার গাড়ির সামনে। সেই লোকটা সিগ্রেট টানতে টানতে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, খুবই নির্বিকার গলায় বলল, রিসকাঅলা চাইর শ টেকা চায়।

শুনে চমকে উঠল মুনা। অ্যাঁ?

হ। চাক্কা মাক্কা বেবাক বইয়া গেছে তো! বডি বি ভাইঙ্গা গেছে। ঠিকঠাক করতে চাইরশ টেকাঐ লাগব। দিয়া দেন, দিয়া দেন। মুনা ফ্যালফ্যাল করে লোকটার মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়েই ঘুরিয়ে নিল। ইস লোকটার চেহারাটা এত খারাপ, কুৎসিত যাকে বলে, দেখলেই বিরক্ত লাগে।

মুনা ফ্যাকাশে গলায় বলল, চারশ টাকা?

সেই লোকটা কথা বলার আগেই ভিড়ের অন্য একজন বলল, আপনেগ কাছে চাইরশ টেকা কোনও টেকা অইলনি!

আরেকজন বলল, হ হ চা চাইরশ টে টে টেক্কা

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। বদ্ধ তোতলা। তোতলামো শুনে লোকজন হো-হো হি-হি খিক-খিক করে হেসে উঠল। মুনাও প্রায় হেসে ফেলেছিল, কায়দা করে নিজেকে সামলাল। না, এ রকম পরিস্থিতিতে হাসা ঠিক হবে না তার।

আরেকজন লোক বলল, যদি টেকা না দিতে চান, তাইলে থানায় লইয়া যামু।

এ কথা শুনে রিকশাঅলা বেশ সাহসী হয়ে উঠল। তেজী গলায় বলল, লন থানায়ই যাই। পুলিশ সাবেরাই বিচার করব। শুনে মুনা খুব ঘাবড়ে গেল। পর পর আবার দুবার ঢোক গিলল সে। তখুনি ভিড়ের মধ্যে এসে ঢুকল একটা মোটর সাইকেল। তাতে টগবগে সুন্দর এক যুবক বসে। জিনসের প্যান্ট আর হাতাকাটা গেঞ্জি পরা। পায়ে কেডস, গলায় মোটা একটা সোনার চেন। ফুটফুটে সুন্দর মুখে দু তিনদিনের দাড়িগোঁফ। মাথায় সিলভার কালারের সুন্দর একটা হেলমেট। ভিড়ের ভেতর ঢুকেই প্রথমে মুনা এবং তার গাড়িটাকে দেখল যুবক। তারপর ভিড়ের লোকজনের দিকে চোখ ফেরাল। শীতল গলায় বলল, কী হয়েছে এখানে? এত ভিড় কেন?

গোলাপি শার্ট পরা লোকটা বলল, মেমসাবে একসিডিন করছে। রিসকা ভাইঙ্গা হালাইছে।

তাই নাকি?

আরেকজন বলল, হ সাব, এই দেহেন রিসকাডা পইড়া রইছে। যুবক উল্টে থাকা রিকশাটার দিকে তাকাল। তাকিয়ে আগের মতোই নির্বিকার শীতল গলায় বলল, ভেঙেছে নাকি! আমার তো মনে হয় শুধু উল্টে গেছে!

একথার সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে উঠল রিকশাঅলা, না না চাক্কা মাক্কা বেবাকই বইয়া গেছে।

কই, দেখছি না তো! আমার চোখ মনে হয় খারাপ। তোমার চোখের মতো ভাল চোখ আমার না। একটা কাজ কর, রিকশাটা তুলে সোজা কর তো, দেখি কী কী ভেঙেছে, কতটা ক্ষতি হয়েছে!

কাজটা করতে রাজি হলো না রিকশাঅলা। কাঁইকুই করছিল। ক্যা এমনে দেহা যায় না!

কথাটা শেষ হলো না তার, যুবক শীতল কঠিন গলায় বলল, যা বললাম এক্ষুনি কর।

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের একজন বলল, হ হ খাড়া করাও রিসকাডা, দেহি, আমরাও দেহি কী অইছে রিসকার।

আরেকজন বলল, তাড়াতাড়ি কর।

যুবক বুঝে গেল পাবলিক যখন যে দিকে জোর দেখে সেই দিকে কথা বলে। হাসি পাচ্ছিল তার। কিন্তু হাসিটা চেপে রাখল সে।

রিকশাঅলা ঘ্যানঘ্যান করতে করতে গিয়ে রিকশাটা সোজা করল। যুবক রিকশাটার দিকে তাকাল। কিছু একটা বলতে যাবে সে, তার আগেই গোলাপি শার্ট পরা সেই লোকটা বলল, ওই দেহেন তিনটা চাক্কাই বইয়া গেছে। বডি বি বিগরাইয়া গেছে।

যুবক কৌতুকের গলায় বলল, আচ্ছা, তাই নাকি!

হ। রিসকাআলায় চাইরশ টেকা চাইছে মেমসাবের কাছে। মেমসাবে দেয় না।

যুবক নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। নরম গলায় বলল, চারশ টাকা! এত কম? হাজার দুয়েক চাওয়া উচিত ছিল না!

পর মুহূর্তেই কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে, মোটর সাইকেলে বসেই থাবা দিয়ে গোলাপি শার্টঅলার কলার চেপে ধরল। ধরে হ্যাঁচকা টানে সামনে নিয়ে এল লোকটাকে। টান দেখে বোঝা গেল হাতে প্রচণ্ড শক্তি রাখে যুবক। যুবক বলল, রিকশাঅলা তোর বাপ হয়? দালালের বাচ্চা, যা ভাগ! তারপর যেন ছুড়ে ফেলে দিল লোকটাকে। ফুটপাতের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ভিড় করা লোকজনও কেটে পড়তে শুরু করেছে তখন। রিকশাঅলা তার রিকশার হ্যান্ডেল ধরেছে। ভঙ্গি দেখে বুঝা যায় যুবক তাকে কিছু বলার আগেই রিকশা নিয়ে পালাবে সে। যুবক কিন্তু রিকশাঅলাকে কিছু বলল না। একবার শুধু গোলাপি শার্ট পরা সেই লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা তখন জামার কুঁচকে যাওয়া কলার খুবই নির্বিকার ভঙ্গিতে ঠিকঠাক করছিল। মুখ দেখে বোঝা যায় এসবে তার কিছু যায় আসে না। এ ধরনের অপমানে সে অভ্যস্ত।

www.shopnil.com

যুবক তারপর মুনার দিকে তাকাল। মুনাও তাকিয়েছিল তার দিকে। যুবককে তাকাতে দেখেই মিষ্টি করে হাসল সে। বলল, থ্যাংকস এ লট। আপনার কথা আমি মনে রাখব।

যুবক কিছু একটা বলতে যাবে, তার আগেই গাড়ি স্টার্ট দিল মুনা। তারপর স্পিডে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটবে বা ঘটে যেতে পারে যুবক অনুমান করেনি। মুনার সঙ্গে কথা বলা হলো না যুবকের। এই প্রথম কথা বলার একটি স্কোপ তৈরি হয়েছিল, মিস হয়ে গেল।

যাকগে, সুযোগ এবং সময় তো আসবেই। পিছনে যখন লেগে আছে, সুযোগ সময় দুটোই আসবে।

মুনার ছুটন্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে তার ডান হাতটা আলতো করে শূন্যে তুলল যুবক। ফিসফিস করে বলল, ওয়েলকাম সুইট হার্ট!

সন্ধেবেলা স্টাডিরুমে বসে বই পড়ছেন ওমরের মা। পড়ার সময় এতটা মগ্ন থাকেন তিনি রুমে ঢুকে কেউ সামনে এসে দাঁড়ালেও টের পান না। আজও তেমন একটা ঘটনা ঘটল। ওমরের বাবা এসে স্টাডিরুমে ঢুকলেন। তার পরনে ক্রিম কালারের শার্ট, গলায় একই রঙের সরু টাই, গায়ে বরফসাদা শার্ট, পায়ে চকচকে কালো জুতা। ক্লিন সেভড মুখটা ঝকমক করছে। তাঁর দুকানের পাশ দিয়ে নেমেছে মোটা জুলপি। মাথার চুল এখনও বেশ কালো তাঁর। কেবল জুলপি দুটো সম্পূর্ণ পাকা। কালো চুল আর একদম সাদা জুলপি বাবার চেহারায় আলাদা একটা সফসটিকেশন এনে দিয়েছে। বেশ লাগে দেখতে। স্টাডিরুমে ঢুকে বাবা খানিক দাঁড়ালেন। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন, না, ভদ্র মহিলার কোনওদিকে খেয়াল নেই। তিনি পড়ছেন, পড়ছেন। এবার পায়ে পায়ে মার ইজি চেয়ারটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বাবা। ছোট্ট করে গলা খাঁকারি দিলেন। সেই শব্দে সামান্য চমকালেন মা। চোখ তুলে তাকালেন। মৃদু হাসলেন। বাবা কোনও ভণিতা না করে সরাসরি বললেন, এই চল আজ কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।

শুনে মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। অবাক হয়ে বললেন, কোথায় বেড়াতে যাব?

চল না। যে কোনও জায়গায়ই যাওয়া যায়। ফেরার সময় বাইরে কোথাও ডিনারটা সেরে আসব।

আজ থাক। চমৎকার একটা বই পড়ছি। এটা ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন। বহুকাল তোমাকে নিয়ে কোথাও বেরুনো হয় না।

মা হেসে বললেন, তুমি তো সময়ই পাও না। তোমার বিজনেস!

বাবা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। মা ইজিচেয়ারে নড়েচড়ে, গুছিয়ে বসলেন। পায়ের দিকে শাড়ি টানলেন। বাবা তখন পকেট থেকে সিগ্রেট বের করেছেন, লাইটার বের করছেন। কিন্তু জিনিস দুটোর কোনওটাই ব্যবহার করলেন না তিনি। বললেন, টাকা জিনিসটা ট্র্যাপের মতো, বুঝলে! একবার টাকার ট্র্যাপে পড়লে বেরুনো খুব মুশকিল।

বইয়ের যে পাতায় চোখ ছিল মার, সে পাতার কোণে ছোট্ট একটা ভাঁজ দিলেন তিনি। তারপর বইটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বললেন, অত টাকা দিয়ে কী হবে। দুটো মাত্র ছেলেমেয়ে আমাদের। তোমার যা আছে এতেই ওদের জীবন খুব স্বচ্ছন্দে, সুখে কেটে যাবে। টাকার পেছনে এখন আর অত ছুটে বেড়াবার কোনও মানে নেই তোমার।

বাবা উদাস, ক্লান্ত গলায় বললেন, আজকাল মাঝে মাঝে খুব টায়ার্ড লাগে, বুঝলে! বয়স যে হচ্ছে, বুঝতে পারি। শরীর মাঝে মাঝে জানান দেয়। বুকের ভেতর হঠাৎই কেমন করে ওঠে। মাথার ভেতর হঠাৎই কেমন করে ওঠে। এই শরীরটাকে তখন আর নিজের শরীর মনে হয় না। যেন বা অচেনা কোনো মানুষের শরীর বহন করছি আমি।

ঠোঁটে সিগ্রেট গুঁজলেন বাবা। লাইটার জ্বেলে সিগ্রেট ধরালেন। মা বললেন, থরো চেকাপ করাও একবার। তারপর কিছু দিন রেস্ট নাও।

হ্যাঁ, করাব। আর ভাবছি সবাইকে নিয়ে একটু চেঞ্জে যাব। বেড়ানোও হবে, রেস্টও হবে। তাছাড়া সবাই মিলে বহুদিন কোথাও যাওয়া হয় না। তোমার মনে আছে, ওমর আর রিখু যখন বেশ ছোট, আমার কোম্পানি তখনও এতটা বড় হয়নি, একটা মরিস গাড়ি ছিল আমার, সেই গাড়ি নিয়ে উইক এন্ডে বাইরে চলে যেতাম আমরা। তুমি আমি, রিখু ওমর। মনুমিয়া ড্রাইভার ছিল। বাড়ি থেকেই রান্না-বান্না করে নিতে তুমি। টিফিন কেরিয়ার, ফ্লাস্ক আরও কত টুকিটাকি জিনিস গাড়ির কেরিয়ারে নিতে। কোথাও কোনও নির্জন জায়গায়, শহরের বাইরে বসে দিনটা কাটিয়ে দিতাম আমরা। রিখু আর ওমর ছুটোছুটি করে সেই নির্জন জায়গা মাতিয়ে তুলত।

মা কী রকম চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বাবা তা খেয়াল করলেন না। কথা বলতে বলতে গলায় এক ধরনের ঘোর লেগে গেছে তার। সেই রকম ঘোরলাগা গলায়ই বললেন, ওমর আর রিখুকে যে কতদিন কাছে পাই না! নিজের ছেলেমেয়ে, তবুও ওদেরকে আজকাল কেমন দূরের মানুষ মনে হয়।

মা বুঝতে পারছিলেন কী যেন কী কারণে ভদ্রলোক আজ আপসেট হয়ে আছেন। ব্যাপারটা তরল করার জন্য বললেন, ছেলেমেয়ে বড় হলে তো এমন হবেই, আমরা যখন বড় হয়েছি আমাদের মা-বাবারও এমন মনে হয়েছে।

বাবা খুব সিরিয়াস গলায় বললেন, তা নয়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে জেনারেশান গ্যাপ। এই জেনারেশানের ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে খুব একটা পাত্তা দিতে শেখেনি। আমাদের সময়টা ছিল অন্যরকম।

সব জেনারেশানের লোকদের কাছেই ব্যাপারটা এরকম ছিল। মা-বাবাদের মনে হতো ছেলেমেয়েরা তাদের পাত্তা দিচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের কাছে মনে হতো মা-বাবার সঙ্গে মানসিক দিক দিয়ে তাদের বেশ দূরত্ব।

একটু থেমে মা বললেন, তবে তুমি যাই ভাব, আমার ছেলেমেয়েরা কিন্তু অমন নয়। ওরা আমাদেরকে ঠিকই পাত্তা দেয়। এই তো সেদিন ওমরকে বললাম বই এনে দিতে, লক্ষ্মী ছেলের মতো নিউমার্কেটে গিয়ে কতগুলো বই এনে দিল।

সিগ্রেটে টান দিয়ে বাবা একটু নড়েচড়ে উঠলেন। প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, চল যাই, কোথাও নিরিবিলিতে বসে কথা বলা যাবে। কতকাল তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা হয় না।

চোখ থেকে চশমাটা খুললেন মা। আঁচলের খুটে চশমা মুছতে মুছতে বললেন, তুমি বিজনেস নিয়ে এত ব্যস্ত থাক!

তুমিও তো বই নিয়ে!

কী করব, সময় তো কাটাতে হবে। সময় কাটাবার জন্য চাই কোনও একটা নেশা। পুরুষদের তো কত নেশা আছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, ড্রিংকস। মেয়েদের তো আর অতটা সুবিধে নেই।

বাবা বললেন, চল যাই।

আজ থাক। তুমি রিখুকে নিয়ে যাও। বাপ-মেয়ের তো কোথাও যাওয়াই হয় না। রিখুর সঙ্গে কথা বললে ওসব দূরত্ব-ফুরত্বের কথা তোমার আর মনে হবে না।

ঠিক আছে।

বাবা সিগ্রেট টানতে টানতে ঘর থেকে বেরুলেন।

উদাস ভঙ্গিতে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিখু। তার চোখ আকাশের দিকে। সন্ধেবেলার আকাশ বরাবরই খুব বিষণ্ন হয়। একেকটি দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে সন্ধেবেলা আকাশ বুঝি সামান্য মন খারাপ করে। বিষণ্ন হয়ে থাকে। সেই বিষণ্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা রিখুর প্রিয় অভ্যেস।

আকাশের দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে কী দেখে রিখু? কী ভাবে? কার কথা?

মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশে লুকিয়ে থাকে কত কী! অন্য মানুষের কখনও তা জানা হয় না।

আজ সন্ধ্যায় রেলিংয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর পেছনে কারও পায়ের শব্দ পেল রিখু। সেই শব্দে উদাস ভঙ্গিটা কেটে গেল তার। পেছনে মুখ ফেরাল রিখু। তারপর বাবাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল। ঠোঁটে ভারি মিষ্টি, আদুরে একটা হাসি দেখা গেল তার। নিজের অজান্তেই যেন রিখু ডাকল, পাপা। সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে সাড়া দিলেন বাবা। মামণি!

www.shopnil.com

এগিয়ে গিয়ে বাবার প্রায় বুক ঘেঁষে দাঁড়াল রিখু। বাবার স্যুটের একটা বোতাম নাড়তে নাড়তে বাচ্চা মেয়ের মতো আদুরে গলায় বলল, পাপা তুমি কোথায় যাচ্ছ?

রিখুর গলা শুনে, কথা বলার ধরনে বাবার মনে হলো রিখু এখনও সেই ছোট্ট মেয়েটি আছে। যেন ইচ্ছে করলে এখুনি তিনি কোলে তুলে নিতে পারেন রিখুকে। রিখু যে বড় হয়েছে, ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে, বিয়ে দিলে রিখুর বয়সী মেয়েও যে মা হয়ে যেতে পারে, কথাগুলো বাবার একদম মনে হলো না!

মৃদু হেসে বাবা বললেন, ক্লাবের দিকে যাব মামণি।

তারপর একটু থেমে বললেন, কেন বল তো?

এমনি।

না এমনি নয়। তুমি কিছু লুকাচ্ছ!

না।

আমি তো রোজই এসময় ক্লাবে যাই। তুমি জান না?

জানি তো!

তাহলে!

তাহলে আবার কী, এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

একটু থেমে বাবা বললেন, যাবে আমার সঙ্গে?

কথাটা শুনে চমকে বাবার মুখের দিকে তাকাল রিখু। তোমার সঙ্গে আমি কোথায় যাব!

তুমি যদি যাও তাহলে আজ আর ক্লাবে যাব না!

কোথায় যাবে তাহলে?

এই ধর কোথাও বেড়ালাম। তারপর বাইরের কোনও একটা ভাল রেস্টুরেন্টে ডিনারটা সেরে ফিরলাম।

সত্যি?

খুশিতে বাচ্চামেয়ের মতো হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল রিখু। দুহাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। পাপা তুমি কী ভাল! পাপা, ও পাপা।

এক হাতে মেয়েকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন বাবা। অন্য হাতে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তোমাকে নিয়ে বহুদিন কোথাও যাওয়া হয় না মামণি।

হ্যাঁ, তুমি আমাকে আর আগের মতো ভালবাস না পাপা।

কী করে বুঝলে?

বাহ্, বুঝা যায় না। আগে আমাকে নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি কোথাও বেড়াতে যেতে। চিড়িয়াখানা জাদুঘর কিংবা পার্কে, কত জায়গায় আমাকে নিয়ে বেড়িয়েছ তুমি।

তা তো বেড়িয়েছি। কিন্তু এখন তো তুমি বড় হয়েছ।

বড় হলে কী হয়?

এখন তোমাকে নিয়ে সব জায়গায় বেড়ানো যায় না। তাছাড়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম কিংবা পার্ক এখন আর তোমার ভাল লাগবে না।

ঠিক বলেছ। কী করে বুঝলে?

বাহ্, আমার মেয়ে কী পছন্দ করবে কী করবে না, সেটা আমি বুঝতে পারব না!

তাহলে আজ কোথায় যাব আমরা?

চল আগে বেরুই, তারপর ডিসাইড করা যাবে।

চল মামণিকেও নিয়ে যাই।

বাবা সামান্য দুঃখ গলায় বললেন, বলেছিলাম। পড়ছেন। বইটা নাকি ভারি মজার। ওই বই ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না তাঁর।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রিখু খুব সরলভাবে হাসল। আমাদের চেয়ে বইয়ের প্রতিই বেশি ভালবাসা তাঁর।

রিখু তারপর নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, পাপা, এক মিনিট। আসছি।

রিখুর ছুটে যাওয়া দেখে বহুদিন পর মনটা হঠাৎই খুব ভাল হয়ে গেল বাবার। মনে হলো মেয়েটার সঙ্গে দূরত্বটা তিনিই তৈরি করে রেখেছেন। আজ থেকে দূরত্বটা তিনি ভাঙবেন। তারপর চেষ্টা করবেন ওমরকে নিয়ে। কাছাকাছি হলেও ওমরও কি রিখুর মতোই আচরণ করবে তাঁর সঙ্গে! উজ্জ্বল হয়ে উঠবে!

গাড়িতে বাবা আর রিখু পাশাপাশি বসে আছে। কেউ কোনও কথা বলছিল না। গাড়িটা যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে গেটের সামনেই তাদের গাড়ির পাশ দিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে স্পিডে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল ওমর। পরনে জিনসের প্যান্ট আর জ্যাকেট। পায়ে কেডস মাথায় হেলমেট। বাবা আর রিখুর গাড়ির দিকে একবারও ফিরে তাকাল না সে।

ওমর এরকমই। যা খেয়াল করে তীক্ষ্ণ চোখে করে। যা করে না, একদমই করে না।

বারান্দার সামনে খোলা লন, সেখানে এসে মোটর সাইকেল থামাল ওমর। তারপর হেলমেটটা খুলে আনমনে ঝুলিয়ে রাখল মোটর সাইকেলের সঙ্গে। তারপর মোটর সাইকেল লক না করেই লাফিয়ে উঠল বারান্দায়। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল দোতলার সিঁড়ির দিকে। তার হাতে একটা ভিডিও ক্যাসেট। একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল ওমর। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে সোজা এসে ঢুকল নিজের রুমে। ওমরের রুমে মোটা কার্পেট বিছানো। কার্পেটের রঙটা ঘাসের মতো। ঘরে কোনও খাট নেই। একপাশে মোটা ফোম বিছিয়ে, তার ওপর বালিশ বেডকভার দিয়ে ওমরের বিছানা। পায়ের কাছে সুন্দর ওয়ার্ডরোব। এক পাশে রাইটিং টেবিল। টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু ইংরেজি বই, দু একটা পত্রিকা। একটা সুন্দর টেবিলল্যাম্প

www.shopnil.com

আছে। টেবিলের অদূরে পাশাপাশি দুটো ট্রলির একটিতে সনির বিশ ইঞ্চি কালারড টেলিভিশন আর ভিসিয়ার। অন্যটিতে সিক্সপিসের ন্যাশনাল মিওজিক সেন্টার। দরজা জানালায় ভারি পর্দা থাকার ফলে ওমরের রুমটা দিনমান ডুবে থাকে মায়াময় অন্ধকারে। আর ওমরের রুমস্প্রে ব্যবহারের অভ্যেস বলে দরজা খুললেই রুমের ভেতর থেকে ভেসে আসে মনোহর সুগন্ধ।

ওমরের রুমের দেয়ালে পাশাপাশি তিনটি পোস্টার লাগানো আছে। প্রথমটা ব্রুক সিলডসের, মাঝেরটা মাইকেল জ্যাকসান পরেরটা ফোবি কেটস। বর্তমান বিশ্বের তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে এই তিনজন ওমরের ফেবারিট স্টার।

রুমে ঢুকেই ভিডিও অন করল ওমর। হাতের ক্যাসেটটা চালিয়ে দিল। ওমরের চেহারায় এখন সামান্য উত্তেজনা। ক্যাসেট রিওয়াইন্ড হচ্ছে, পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল ওমর। ঠোঁটে সিগ্রেট গুঁজল। তারপর লাইটার জ্বেলে সিগ্রেট ধরাল।

ক্যাসেট রিওয়াইন্ড হয়ে গেছে, ওমর গিয়ে বাটন পুশ করল। খানিকপর টিভি পর্দায় ভেসে উঠল মাইকেল জ্যাকসানের থ্রিলার। মুগ্ধ হয়ে খানিক তাকিয়ে রইল ওমর। তারপর মেঝেতে, কার্পেটের ওপর বসে পড়ল। হাতে সিগ্রেট জ্বলছে, ওমরের তা খেয়াল নেই। এক সময় 'বিট ইট' গানটা শুরু হলো। গানটা ওমরের খুব প্রিয়। চোখের সামনে জ্যাকসানকে তার প্রিয় গানটা গাইতে দেখে উত্তেজনায় সব ভুলে গেল ওমর। ভুলে চিৎকার করে উঠল, বাকাপ মাইকেল, বাকাপ।

রাত আটটার দিকে বাবা আর রিখু এসে ঢুকল চমৎকার একটা রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টটা তখন বেশ জমজমাট। সুন্দর টেবিলগুলো দখল করে বসে আছে লোকজন। বিভিন্ন বয়সের। তবে বয়স্কদের তুলনায় যুবক শ্রেণীর লোকজনের সংখ্যাই বেশি।

বাবা আর রিখু জায়গা পেল কর্নারের দিককার একটা টেবিল। সেই টেবিলটার পাশেই জাকিয়ে বসে আছে রিখু কিংবা তারচে' দু এক বছরের বড় এমন ছ সাতটা ছেলে। ছেলেগুলো পাঙ্ক টাইপের। চেহারা-সুরত, পোশাক-আশাকে তাদেরকে এই গ্রহের মানুষ মনে হয় না। একজনের পরনে ছিল নভোচারীদের মতো পোশাক। দেখে মনে হয় ছোটদের নেইল আর্মস্ট্রং। চাঁদ নয় অন্য কোনও গ্রহ থেকে এইমাত্র ল্যান্ড করেছে। দু তিনজনের চুল কার্ল করা। একজনের এককানে লম্বা একটা দুল। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছিল সে। হাতে মোটা একটা বালাও আছে। মুহূর্তের জন্য বালাটা দেখতে পেল রিখু। কিন্তু বাবা সঙ্গে আছে বলে ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল না সে। তবে দূর থেকে পুরো গ্রুপটাকে দেখে রিখুর মনে হয়েছিল বিদেশী ইয়াং কোনও গায়ক দল বসে আছে। যে কোনও মুহূর্তে মাইক্রোফোন কিংবা গিটার হাতে

উঠে দাঁড়াবে। ড্রামে বিট তুলে হৃদয় হিম করে ফেলবে। তারপর নেচে নেচে শুরু করবে ইংরেজি গান, উই আর অন্য দ্য রেস ট্রাক। কেন যে এই লাইনটা মনে এল রিখুর! মানুষের কোন মুহূর্তে যে কী মনে হয়, সে নিজেও তা জানে না। তবে এই ধরনের ছেলেদের খারাপ লাগে না রিখুর। রিখুদের জেনারেশানের একটা ভাগ, যারা রিখুর মতো উচ্চবিত্ত ঘরের তাদের লাইফ স্টাইল তো এরকমই। রিখু তাদের অপছন্দ করবে কেন! কিন্তু বাবার বোধহয় ছেলেগুলোকে ভাল্লাগল না। রেস্টুরেন্টে আর কোনও খালি টেবিল ছিল না বলে, বিরক্ত হয়েই ওই ছেলেগুলোর পাশের টেবিলে রিখুকে নিয়ে বসতে বাধ্য হলেন তিনি।

দু-তিনবার বাঁকাচোখে ছেলেগুলোর দিকে তাকালেন। মুখে একধরনের বিরক্তি দেখা গেল তার। ওরকম মুখেই সিগ্রেট ধরালেন তিনি।

বাবার সিগ্রেট ধরাবার কায়দা দেখে রিখু বুঝতে পারল বিরক্তির ভাবটা কাটাবার জন্য সিগ্রেট ধরালেন বাবা। বাবার হাবভাব দেখে ভেতরে ভেতরে বেশ একটা মজা পেল রিখু। এই জেনারেশানের ছেলেমেয়েদেরকে গার্জিয়ানরা মোটেই পছন্দ করে না। বাবাকে দেখে এই মুহূর্তে রিখু তা টের পেল। আজকালকার ছেলেমেয়েরাও কি তাদের গার্জিয়ানদের খুব একটা পছন্দ করে, খুব একটা পাত্তা দেয়! রিখু যে কিছু একটা ভাবছে, ব্যাপারটা বাবা যাতে বুঝতে না পারেন সেটা কাটাবার জন্য রিখু বলল, পাপা তোমার কি শরীর খারাপ ?

রিখুর কথায় বাবা একটু চমকালেন। না তো!

তোমাকে খুব পেইল লাগছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আনমনে অন্যদিকে তাকালেন। ফাঁকা শূন্য গলায় বললেন, আমি একটু টায়ার্ড।

টায়ার্ড তো হবেই। কিছুদিন ধরে অতিরিক্ত খাটাখাটনি করছ তুমি। বিজনেসটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তোমার! এত কাজ করলে টায়ার্ড তো লাগবেই।

সিগ্রেটে টান দিয়ে বাবা উদাস গলায় বললেন, ভাবছি কিছুদিন রেস্ট নেব।

অবশ্যই তোমার রেস্ট নেয়া উচিত।

হু, বাইরে কোথাও চলে যাব। এক দুমাস রেস্ট নেব। ঢাকায় থাকলে রেস্ট হবে না।

রিখু চিন্তিত গলায় বলল, পাপা তুমি কি একা যাবে ?

না, একা যাব কেন ?

এবার আবদারের গলায় রিখু বলল, আমাকে কিন্তু নিতে হবে পাপা।

সবাইকে নিয়েই যাব। তুমি, তোমার মামণি, ওমর, সবাই যাবে।

রিখু ঠোঁট বাঁকা করে বলল, ভাইয়া বোধহয় যাবে না। ও যা বিজি থাকে!

কী করে সারাদিন ?

কী জানি!

www.shopnil.com

ও তোদের পছন্দ করত না।

শাহনেওয়াজ বলল, কেন, পছন্দ করত না কেন?

ইরাজ বলল, আমাদের চেহারা কি খুব খারাপ?

একথায় বান্টি আবার রেগে গেল। চোখ বড় হয়ে গেল তার। চিবিয়ে বান্টি বলল, হ্যাঁ, তোদের চেহারা খুবই খারাপ। চাকর-বাকরদের মতো।

নাগিব বলল, এভাবে কথা বলবি না বান্টি।

বললে কী হবে?

দেখবি কি হয়!

চল দেখি।

বান্টি আর নাগিব দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। দুজনের চোখেই ক্রোধ। দেখে বুঝা যায় এক্ষুনি ঘটে যাবে কিছু একটা। কিন্তু না, ঘটল না। তখুনি বাথরুম থেকে ফিরে রিখু এসে ওদের টেবিলের সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখে মুহূর্তে নিভে গেল নাগিব। বান্টির মুখে ক্রোধের জায়গায় ফুটে উঠল মিষ্টি মোলায়েম হাসি। বান্টি বলল, হাই রিখু।

রিখু বান্টির দিকে তাকাল। হাই।

সঙ্গে কে রে?

চুপ। পাপা।

মাই গুডনেস। পাপার সঙ্গে বেরিয়েছিস কেন?

তো কার সঙ্গে বেরুব?

তারপর একটু থেমে রিখু বলল, শোন বান্টি, তুই এখানে আমার সঙ্গে একদম কথা বলবি না, যেন আমাকে চিনিসই না। কোনো দিন স্বপ্নেও দেখিসনি।

বান্টির বন্ধুরা হা করে রিখুকে দেখছিল। মুখে কোনও শব্দ নেই তাদের। যেন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে।

রিখুর কথা শুনে বান্টি বলল, ওকে ডিয়ার। কিন্তু তোর সঙ্গে দেখা হবে কবে?

কাল একবার টেলিফোন করিস।

তারপর?

তারপর আবার কী, কবে দেখা হবে বলব।

রিখু আর কোনওদিকে তাকাল না, নিজেদের টেবিলের দিকে চলে গেল।

ঘরের মেঝেতে কার্পেটের ওপর কাত হয়ে শুয়ে বোম্বের ফিলমি পত্রিকা স্টার ডাস্টের পাতা উলটাচ্ছে ওমর। তার হাতে সিগ্রেট জ্বলছে। সামনে, কার্পেটের ওপর এসট্রে, এসট্রের সামনে অবহেলায় পড়ে আছে একটা বেনসান এন্ড হেজেজের প্যাকেট। এইমাত্র সিলোফিন ছেঁড়া হয়েছে। প্যাকেটটার সঙ্গে মিলেমিশে পড়ে আছে একটা

লাইটার। রাত কত হলো? স্টারডাস্টের পাতা উল্টাতে উল্টাতে নিজেকে এই প্রশ্নটা করল ওমর। কারণ তাদের বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। যে যার ঘরে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। তখুনি হঠাৎ কী মনে হলো ওমরের। মনে হতেই তরাক করে লাফিয়ে উঠল সে। তারপর ফোমের বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনটা টেনে নিল। এক মুহূর্ত কী ভাবল! তারপর টেলিফোন ডায়াল করতে লাগল। মুখে মুচকি একটা হাসি ফুটে উঠল তার।

প্রথমবার ওপাশে রিং হলো না। আবার ডায়াল করল ওমর। হ্যাঁ, রিং হচ্ছে। টেলিফোন সেটটা যেখানে পড়েছিল সেখানেই রইল, কেবল ওমর জায়গা বদল করল। ফোমের বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। তখুনি ওপাশে টেলিফোন তুলল কেউ। হ্যালো! গলা শুনে ওমর বুঝে গেল সে যাকে চাইছে টেলিফোনটা সে-ই ধরেছে। তাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একটু টেনে, সুন্দর উচ্চারণে ওমর বলল, শুভরাত্রি, মুনা।

বেশ অনেকক্ষণ হলো শুয়ে পড়েছে মুনা। কিন্তু ঘুম আসছিল না তার। ডিমলাইট জ্বলছে ঘরে। আবছা আলো আঁধারিতে ডুবে আছে ঘরটা। সেই আলো আঁধারির দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল মুনা! কার কথা? তখুনি টেলিফোন বেজে উঠল। ক্রিং ক্রিং। টেলিফোনের শব্দে মুনা খুবই অবাক হলো। এতরাতে কে তাকে টেলিফোন করল! তাকে চাইছে না অন্য কাউকে।

মুনাদের বাড়িতে দুটো টেলিফোন। তবে এক নাম্বারে আবার দুটো সেট আছে। তার একটা মুনার ঘরে আর একটা বারান্দায়। অন্যটা তার মা বাবার বেডরুমে।

টেলিফোন ধরে মুনা বলল, হ্যালো!

ওপাশ থেকে টানা সুন্দর গলায় ভেসে এল, শুভরাত্রি, মুনা।

শুনে থতমত খেয়ে গেল মুনা। সেও প্রায় শুভরাত্রি কথাটা রিপিট করতে যাচ্ছিল, কী ভেবে নিজেকে সামলাল। তারপর ঢোক গিলে বলল, হ্যালো, হ্যালো কে?

ওপাশে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ।

রিসিভারটা তবুও খানিকক্ষণ ধরে রাখল মুনা। চোখ দুটো উদাস হয়ে গেল তার। নিজের অজান্তেই নিচের ঠোঁটের ডানদিক কামড়ে ধরল সে। তারপর রিসিভার ক্রাডেলে নামিয়ে রেখে মুচকি হাসল। কাল্পনিক প্রেমিকের উদ্দেশে বলল, এই, তোমার ভিলেন। ওমর। খুব জ্বালাচ্ছে কিন্তু। কী করে যেন আমার নাম্বারও যোগাড় করে ফেলেছে। তুমি ওকে, ওর ঠিক মুখে এক ঘুষি মারবে। একদম অনীল কাপুরের স্টাইলে। পারবে না? না পারলে তুমি একটা ইয়ে, কাল্পনিক প্রেমিকের উদ্দেশে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল তুলল মুনা। তারপর হাসতে হাসতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

www.shopnil.com

বিকেলবেলা নির্জন একটা রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছিল মুনা। খুবই আস্তে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে। কখনও আবার হঠাৎ করে স্পিড তুলছে। হঠাৎ করে স্পিড আবার কমিয়েও আনছে। রাস্তার মোরে এসে সাঁ করে গাড়ি ঘোরাচ্ছে। আসলে হাত ক্লিয়ার করার জন্য প্রাকটিস করছিল মুনা। ড্রাইভিংটা বেশ রপ্ত হয়েছে তার। এখন আর রিকশা-টিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা নেই। এক সময় রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে গাড়ি ব্যাক করবে মুনা তখুনি সাইটভিউ মিররে দেখতে পেল একটা সিলভার কালারের মোটর সাইকেল বেশ একটা দূরত্ব রেখে তার গাড়ির পিছু পিছু আসছে। মোটর সাইকেলে বসে আছে টগবগে সুন্দর এক যুবক। পরনে বাগজো কোম্পানির নীল রঙের প্যান্ট, গায়ে মোটা সাদা শার্ট, পায়ে কেডস। হাওয়ায় মাথার ঝাঁকড়া চুল উড়ছে যুবকের। যুবককে দেখেই চমকে উঠল মুনা। আরে এই তো সেই যুবক, সেদিন রিকশা একসিডেন্টের সময় যে তাকে সেভ করেছিল।

যুবককে দেখে মুনার ঠোঁটে রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল। গাড়িটা ব্যাক করে যুবকের মটর সাইকেলের পাশ দিয়ে স্পিডে চালিয়ে দিল মুনা। কিন্তু চোখ রইল সাইটভিউ মিররে। তাতে দেখা গেল মুনার গাড়ি ব্যাক করার খানিক পর যুবকও তার মোটর সাইকেল ব্যাক করাল। এবং রাস্তার পাশে মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে একটা পা রাখল মাটিতে। তারপর মুনা গাড়ির দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরাল। দূর থেকে যুবককে রাস্তার পাশে মোটর সাইকেল দাঁড় করাতে দেখে মাথায় একটা চালাকি মুহূর্তের জন্য খেলা করে গেল। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে আবার গাড়ি ঘোরাল মুনা। তারপর সাঁ করে গাড়িটা এনে হঠাৎ ব্রেক কষল যুবকের মোটর সাইকেলের পাশে। মুনাকে ওভাবে গাড়ি ব্রেক কষতে দেখে হকচকিয়ে গেল যুবক। সিগ্রেটে টান দিতে ভুলে গেল।

গাড়ির জানলায় মুখ রেখে মুনা বলল, এই যে, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হয়।

যুবক সিগ্রেটে টান দিয়ে সরাসরি তাকাল মুনার চোখের দিকে। হ্যাঁ, দেখেছেন।

কোথায় বলুন তো?

মুনার চোখ থেকে চোখ সরাল না যুবক। মৃদু হেসে বলল, সেই যে রিকশা একসিডেন্ট।

এবার ভুরু কুঁচকাল মুনা। আপনি আমাকে ফলো করছেন কেন?

কথাটা শুনে যুবকের কোনও ভাবান্তর হলো না। মুনার চোখের দিকে আরও গভীর করে তাকাল সে। ভরাট সুন্দর গলায় বলল, আপনি সুন্দর। খুব সুন্দর।

মুনা বলল, তাতে আপনার কী! রিকশাঅলাকে ধমক দিয়ে বোম্বের ফিলম স্টাইলে হিরো সাজছেন? কথাটা একদম গায়ে মাখল না যুবক। সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে। একথায় মুনা খুব দমে গেল। এই রকমভাবে কেউ তো কখনও তাকে বলেনি! খানিক চুপ করে থেকে কী ভাবল মুনা। এক সময় মুখে

www.shopnil.com

চালাকির একটা হাসি ফুটে উঠল তার। উচ্ছ্বসিত গলায় মুনা বলল, বাহ্, কী রোমান্টিক! কিন্তু পরিচয় তো হয়েছে!

কী নাম?

ওমর।

ও আচ্ছা! তাহলে আপনিই ফুল এবং বই

শুভরাত্রিও।

জানি। আমার কিন্তু বেশ লাগছে।

সত্যি?

তারপর একটু চুপ করে থেকে মুনা বলল, আমি একটু বিজি।

তাই নাকি?

মানে?

না গাড়ি নিয়ে একই রাস্তায় ঘুরছেন তো?

ও! তখন মনে ছিল না। এইমাত্র মনে পড়ল একটা জায়গায় যেতে হবে।

ঠিক আছে।

টেলিফোন...

কথাটা শেষ করতে দিল না ওমর। বলল, রাতে করব।

ওকে।

বাঁ হাত তুলে আঙুল নাড়াল মুনা। বাই।

তারপর স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দিল। সেদিকে তাকিয়ে ওমরের মনে হলো, সাকসেস! আজ থেকে সারাক্ষণ মুনাকে আর ফলো করতে হবে না তার। মুনাকে সে পেয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর উত্তেজনা থমথম করে উঠল ওমরের। সিগ্রেটে টান দিল। কিন্তু সিগ্রেট শেষ। শুধু ফিল্টারটা আছে। টান দিতেই মুখের ভেতর কী রকম লাগল! অন্যসময় হলে খুবই বিরক্ত হতো ওমর। এখন হলো না। ফিল্টারটা ছুড়ে ফেলে পকেট থেকে আবার সিগ্রেট বের করল সে।

রেস্টুরেন্টের শেষ মাথায় টেবিলটা ঘিরে বসেছিল ওরা। জাহিদ চুমকি গোগো আর মুনা। দুপুর শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ, ফলে রেস্টুরেন্টটা এখন প্রায় ফাঁকা। কেবল পশ্চিম দিকের রোর মাঝামাঝি টেবিলটায় বসে আছে একটা পেয়ার। বোধহয় হাজব্যান্ড ওয়াইফ হবে। নব বিবাহিত। মেয়েটির পরনে কাতান শাড়ি। কথায় কথায় হাসছে সে। হেসে কুটিপাটি খাচ্ছে। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীর সঙ্গে গভীর প্রেম হয়ে গেলে মেয়েরা এইভাবে হাসে। স্বামী ভদ্রলোকটি যুবক বয়সী। সাদা শার্টের ওপর লাল ডোরাকাটা টাই পরা। পাথর বসানো টাই পিনটি রেস্টুরেন্টের আবছা আলো আঁধারিতেও ঝকমক করছে। লোকটি খুব সম্ভব কোনও প্রাইভেট ফার্মে ভাল মাইনের চাকরি করে। সদ্য বিয়ে করেছে বলে চান্স পেলেই বউ নিয়ে বাইরে লাঞ্চ

ডিনার সারে। দূর থেকে লোকটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে এসব কথা মনে হচ্ছিল মুনার। এ এক ধরনের স্টাডি। অথবা এক ধরনের খেলা। কোনও লোক নিয়ে স্টাডিটা শুরু করলে, খেলাটা শুরু করলে সময় বেশ দ্রুত কেটে যায়।

মুনা খেয়াল করছিল লোকটাকে আর মুনাকে খেয়াল করছিল জাহিদ। এক সময় জাহিদ বলল, কী দেখছিস?

চমকে জাহিদের দিকে তাকাল মুনা। তারপর মৃদু হেসে বলল কিছু না।

জাহিদের হাতে সিগ্রেট জ্বলছে। সিগ্রেটে টান দিয়ে সে বলল, মুনা, কী নাম বললি?

কার?

যাহ্ বাবা! আমরা এখানে এলাম কী কারণে! খেলাম কী কারণে!

ও! ওমর।

বাজে বিহেভ করেছে?

না তো! তা করেনি। ওয়েল বিহেভড। দেখতে বেশ। টল, হ্যান্ডসাম।

ও! তোর পছন্দ হয়েছে?

বাজে কথা বলিস না। টল হ্যান্ডসাম হলেই একটা ছেলেকে আমার পছন্দ হয়ে যাবে!

গোগো ভারি গলায় বলল, তাহলে কী রকম হতে হবে?

কী রকম হতে হবে মানে!

বলছিলাম তুই যাকে পছন্দ করবি টল হ্যান্ডসাম ইত্যাদি ছাড়া তার আর কী কী থাকতে হবে?

এবার মুনা একটু রেগে গেল। শোন গোগো আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়ার জন্য তোদেরকে এখানে ডেকে আনিনি আমি। আদর করে, এতগুলো টাকা খরচ করে খাওয়াইনি।

জাহিদ বলল, ঠিক আছে। বল আমরা ইয়ার্কি দেব না।

গোগো বলল, হ্যাঁ, এই আমি সিরিয়াস হয়ে গেলাম।

চুমকি একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল। ব্যাপারটা খুবই বিচ্ছিরি। দু একবার বারণ করতে গিয়েও করেনি মুনা। এবার করল। চুমকি কাঠি ফেল।

মুনার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, কাঠিটা সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিল চুমকি। তারপর অকারণে একটু হাসল।

মুনা বলল, বার্থডের সকালবেলা আমাকে প্রচুর ফুল পাঠিয়েছিল। সবগুলো গোলাপ। ইয়া বড় বড়। টুকটুকে লাল। অত সুন্দর ফুল কেউ কখনও পাঠায়নি আমাকে। আরেক দিন, নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানে বই দেখছি, সেলসম্যান আমার হাতে এক প্যাকেট কবিতার বই ধরিয়ে দিল। সবগুলোই প্রেমের কবিতা। বলল এক সাহেব দিয়ে গেছেন। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে দেখি লেখা আছে, তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা। নিচে নাম লেখা। ওমর।

www.shopnil.com

চুমকির স্বভাব হচ্ছে যে কোনও কথায় অবাক হওয়া। সে যথারীতি অবাক হয়ে বলল, তুই নিলি কেন? কথাটা শুনে মুনা খুব রেগে গেল। তুই একটা গাধা।

কেন, গাধা কেন?

জাহিদ বলল, গাধা নও, গাধা নও। গাধী।

শুনে গোগো খিক করে হাসল।

মুনা বলল, সরাসরি আমাকে দেয়নি তো। আমি ওকে দেখিওনি।

চুমকি বলল, তাহলে?

বললাম যে সেলসম্যানের হাতে দিয়ে কেটে পড়েছে।

তখুনি পকেট থেকে কী একটা ট্যাবলেট বের করল গোগো। বের করে টুক করে মুখে দিল। এই নিয়ে তিনটা ট্যাবলেট খেল সে। ঘন্টা দু তিনেকের মধ্যে। ড্রাগ এডিকটেড যুবক। চোখ সারাক্ষণ লাল থাকে তার। এখনও ছিল। সেই লাল চোখে মুনার দিকে তাকাল সে।

গোগোকে এক পলক দেখে মুনা বলল, আরেকদিন ড্রাইভ করতে গিয়ে একটা রিকশাকে ধাক্কা দিয়েছি আমি...

কথাটা শেষ করতে পারল না মুনা, গোগো জড়ানো গলায় বলল, সঙ্গে সঙ্গে ওমর এসে তোকে সেভ করেছে।

শুনে চমকে উঠল মুনা। তুই জানিস গোগো?

না। ওসব বোঝা যায়। সাধারণত এরকমই হয়।

গোগোর পরনে কালো ব্যাগি প্যান্ট, সাদা মোটা ফুল শ্লিভ শার্ট। বুকের কাছে তিনটে বোতাম খোলা। গলায় লম্বা কালো পুঁতির একটা মালা। শ্যামলা কঠোর মুখে মাসখানেকের দাড়ি গোঁফ। অবিরাম সিগ্রেট খাওয়ার ফলে মোটা ঠোঁট দুটো কুচকুচে কালো। আর কিছুকাল ধরে ড্রাগ এডিকটেড হয়েছে বলে চেহারায় সারাক্ষণ একটা টালমাটাল ভাব লেগে আছে গোগোর। শরীরটা দশাসই। গোগোকে এক পলক দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারে এই যুবক। এমনকি মানুষ খুন!

এসট্রেতে সিগ্রেট গুঁজে জাহিদ বলল, ভারি রোমান্টিক তো!

মুনা মাথা নিচু করে বলল, ভাল লাগে না। আমি এসব পছন্দ করি না।

ভাল না লাগলে স্ট্রেট বলে দে।

বাট আই ডিড এ মিসটেক।

জাহিদ তার লম্বা গলাটা একটু টানা দিল। তারপর সালাম ফেরাবার ভঙ্গিতে দ্রুত দুদিকে ঘাড় ফেরাল। ফলে খটখট করে দুটো শব্দ হলো।

এসব ব্যাপার মুনা খুবই অপছন্দ করে। কাউকে করতে দেখলে রেগে যায়।

কিন্তু এখন রেগে যাওয়ার উপায় নেই, এদেরকে মুনাই ডেকে এনেছে নিজের প্রয়োজনে, সুতরাং রাগ করা যাবে না।

জাহিদ ছেলেটা ডেঙ্গা মতন। পাতলা লিকলিকে শরীর। ভাঙাচোরা মুখ। সেই মুখে, থ্যাবরা নাকের তলায় থার্ড ব্রাকেটের মতো পুরু গোঁফ। মাথার চুল ক্রোকাট করা। ফুল শ্লিভ শার্ট পরে, হাতা গুটিয়ে রাখা। চরিত্রের দিক দিয়ে জাহিদ খুবই ফেরোসাস। ভয় কাহাকে বলে, জানা নেই জাহিদের। তবে জাহিদকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। খুবই অর্ডিনারি ছেলে মনে হয়।

মুনার সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব চুমকির মাধ্যমে। জাহিদ গোগো আর দুচারজন আছে ওরা আসলে চুমকির বন্ধু। চুমকির কারণে মুনার সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়েছে। প্রয়োজনে এদেরকে বেশ কাজে লাগানো যায়। ভাল কোনও রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ ডিনার করিয়ে বললেই হয়, আমার অমুক অসুবিধা, তমুককে থ্রেট করতে হবে ইত্যাদি। গোগোটা আবার কিছু ক্যাশ নেয়। তা নিক। কাজ করে দেয়।

জাহিদ বলল, কী মিসটেক করেছিস ?

মুনা বলল, আমি ড্রাইভ করছি, দেখি মোটর সাইকেল নিয়ে আমাকে ফলো করছে।

গোগো জড়ানো গলায় বলল, ভেরি ইন্টারেস্টিং। একদম বোম্বের ফিলম।

জাহিদ বলল, কিন্তু মিসটেকটা কী ?

আমি হেসে কথা বলছি। টেলিফোন করতে বলেছি।

চুমকি সরল গলায় বলল, তাহলে আর কী! হয়েই তো গেছে।

শুনে মুনা বেশ রেগে গেল। জাহিদ হে হে করে অকারণে একটু হাসল।

গোগো বলল, না চুমকি এসবের কিছুই বোঝে না। মাত্র তিনজনের সঙ্গে লাইন ছিল। সবগুলোকে গুডবাই করে দিয়েছে। শেষেরটা তো চুমকিকে ছাড়তেই চাচ্ছিল না। আমরা প্যাদানি মেরে খেদালাম।

জাহিদ বলল, আসল কথাটা বল মুনা।

আসল কথা আবার কী! আমি একটু বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম। ইয়ার্কি মারতে চেয়েছিলাম। ওই করতে গিয়ে ফেঁসে গেছি। হি ইজ ভেরি সিরিয়াস।

লাল চোখ দুটো তুলে মুনার দিকে তাকাল গোগো। তারপর প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল টেবিলে। ওকে। উই উইল সি। তুই এরেঞ্জ কর মুনা।

সেই নব দম্পত্তি কখন উঠে চলে গেছে ওরা কেউ খেয়াল করেনি। টেবিলে গোগোর ঘুষি মারা দেখে চমকে নব দম্পতির টেবিলটার দিকে তাকিয়েছিল মুনা। তাকিয়ে হাঁপ ছাড়ল। যাক, গোগোদের কীর্তিকলাপ কিংবা আলাপ আলোচনা অন্য কেউ শুনছে না।

মুনা বলল, কী করবি ? মারামারি ?

নো। দূর থেকে একটু ফলো করে দেখব তোর ব্যাপারে আসল এটিচুডটা কী! তুই ওর সঙ্গে ভিড়ে যাবি। আর আমরা আড়াল থেকে...

শুনে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল চুমকি। গুড আইডিয়া। হেভি জমবে। বহুদিন এধরনের একসাইটিং কিছু ঘটছে না।

জাহিদ বলল, রাখ তো একসাইটিং।

গোগো একটু চিন্তিত গলায় বলল, মুনা, মন্টুটাকে অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে। মার্শাল আর্টের জিনিস। তুই ওকে টেলিফোনে বলে রাখবি।

জাহিদ বলল, কবে ?

দু একদিনের মধ্যেই। নো লেট।

মুনা কোনও কথা বলল না। হঠাৎই উঠে দাঁড়াল। মুখটা কেন যে বিষণ্ণ হয়ে আছে তার!

মুনাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। তিন নম্বর ট্যাবলেটটা বুঝি ততক্ষণে ধরে ফেলেছে গোগোকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে। টলছে। এরকম অবস্থায়ও মুনার দিকে হাত বাড়াল গোগো। দে মুনা।

মুনা অবাক গলায় বলল, কী!

টাকা।

কেন ?

বাহ্, টাকা দিবি না ?

কিসের টাকা ?

চার্জ।

হাতের ছোট্ট ব্যাগ খুলে দুটো একশো টাকার নোট বের করল মুনা। এই এক অভ্যেস তোর। বন্ধুদের কাজ করেও...

টাকাটা থাবা দিয়ে নিল গোগো! টেনে টেনে বলল, টাকা ছাড়া কারও কোনও কাজ করে না গোগো। এমনকি মা-বাবারও।

মার হাতে সোনালি কাগজে মোড়ানো সুন্দর একটা গিফট প্যাকেট। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে ধীরে ওপরে উঠছিলেন তিনি। মুনাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন। মুনার মা বেশ মোটাসোটা মহিলা। সামান্য হাঁটা-চলায়ই বেশ ক্লান্ত হয়ে যান তিনি। ওইসব মুহূর্তে মাকে দেখলে মনে হয় ভীষণ কষ্টকর কোনও কাজ এইমাত্র শেষ করেছেন তিনি। লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল মুনা। পরনে ফেড জিনসের প্যান্ট আর বাচ্চামেয়ের মতো পাতলা সাদা রঙের টপস। মুখে কোনও মেকাপ নেই। কেবল ঠোঁটে হালকা লাল রঙের লিপস্টিক। মাথার চুল এলোমেলো। মুনার হাতে গাড়ির চাবি। সুন্দর একটা রিঙে বন্দি আঙুলের ডগায় চাবিটা ঘোরাচ্ছিল মুনা।

সিঁড়ির মাঝামাঝি, মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুনা বলল, টাকা দাও মা।

শুনে থতমত খেয়ে গেলেন মা। অবাক গলায় বললেন, তুমি কি কোথাও যাচ্ছ ? কখন ফিরবে ?

www.shopnil.com

ঠিক নেই।

না বেরুলে হয় না ? আমরা একটা পার্টিতে যাব। তুমিও যাবে।

আমি যাব কেন ?

তোমার যাওয়া উচিত। ওরা তোমাকে একসপেকট করে।

আমি যেতে পারব না। কাজ আছে।

কী কাজ ?

এ কথায় মুনা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। অত প্রশ্ন করছ কেন ?

মা ভারি গলায় বললেন, অন্যায় হয়েছে ?

মার কথা বলার ভঙ্গিটা এমন, মুনা আর রাগ করতে পারল না। হেসে ফেলল। না, তা হচ্ছে না। দাও, টাকা দাও।

এতেও খুব একটা খুশি হলেন না মা। আগের মতোই ভারি গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে তো দেখি কথাই বলা যায় না আজকাল। ক্রেজি হয়ে যাচ্ছ। তুমি আমাদের একমাত্র মেয়ে, তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে!

মুনা নরম গলায় বলল, তা পারে।

এবার আর একটু রাগলেন মা। ঠিক আছে, তুমি যাও।

মুনা বুঝে গেল অভিমান হয়েছে মার। বুঝেই একটা কাণ্ড করল সে। দুহাতে মার গলা জড়িয়ে ধরল। একদম আদুরে শিশুর কায়দায়। আধো আধো গলায় বলল, আমি তোমাদের একমাত্র মেয়ে বলেই তো আমার এত স্বাধীনতা, না মামণি!

মা কথা বলেন না। অভিমানে মুখটা ভার হয়ে আছে। অতিরিক্ত সুখে থাকলে এই ধরনের অভিমান জন্মায় মানুষের। আড়চোখে মার মুখটা একবার দেখল মুনা। তরল গলায় বলল, কোথায় পার্টি মামণি ?

থাক, তোমার তা শোনার দরকার নেই!

তুমি রাগ করছ কেন ? মামণি, ও মামণি।

কথা না বলে হাতের ব্যাগ খুললেন মা। নতুন একশো টাকার নোটের একটা বান্ডিল বের করলেন। বান্ডিল থেকে বেশ কিছু টাকা খরচও হয়েছে। তবুও যা আছে, ছ-সাত হাজারের কম হবে না।

মার কাছে সব সময় নতুন টাকা থাকে। পুরনো টাকা মা কখনও খরচ করেন না। রেখে দেন। পাঁচ দশ হাজার হলে ব্যাংকে পাঠিয়ে নতুন নোট আনিয়ে নেন। নতুন নোটের গন্ধ নাকি খুব ভাল লাগে মার। মানুষের যে কত রকমের অভ্যাস থাকে!

গম্ভীর গলায় মা বললেন, তোমার কত টাকা লাগবে ?

দাও না, তোমার যা ইচ্ছে!

বান্ডিল থেকে বেশ কয়েকটা নোট খুলে মুনার হাতে দিলেন মা। টাকাটা প্যান্টের পকেটে রেখে মুনা বলল, মামণি, তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে ? ঠিক আছে, তুমি রাগ করলে আমি না হয় বেরুব না।

এটা মুনার একটা চালাকি। মাকে খুশি করার জন্য কথাটা বলল সে। জানে এভাবে বললে মুহূর্তে রাগ কিংবা অভিমান ভেঙে যাবে মার। হাসিমুখে মা বলবেন, না ঠিক আছে। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও।

হলোও তাই। মুনার কথা শুনে হেসে ফেললেন মা। থাক, আর আহ্লাদ দেখাতে হবে না। তুই যেখানে যাচ্ছিস যা।

তার আগে বল তুমি রাগ করনি!

আমি রাগ করিনি।

শুনে লাফিয়ে উঠল মুনা। টকাস করে মার গালে একটা চুমু খেল। তারপর লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

মুনার দিকে তাকিয়ে বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মার। কেন যে!

জায়গাটার দিকে তাকিয়ে ওমর মনে মনে বলল, ওই, ওইতো বনভূমির মতো জায়গাটার পাশে খোলামেলা যে পার্ক, অদূরে টলটলে জলের চমৎকার লেক, ওখানেই তো মুনা তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। বাহ্!

কালরাতে বেশ অনেকক্ষণ কথা হয়েছে মুনার সঙ্গে। এতদিন লেগে থাকার পর এই প্রথম খোলাখুলি কথা। ওমর খুবই সরল ভঙ্গিতে তার ভাল লাগার কথা জানিয়েছে মুনাকে। মুনা তেমন বিগলিত হয়ে যায়নি তবে বলেছে, তারও খারাপ লাগছে না ব্যাপারটা। এবং আজ বিকেলের দিকে এই জায়গাটায় অপেক্ষা করতে বলেছে ওমরকে। মুনা আসবে। তারপর নিরিবিলিতে আরও অনেক কথা হবে দুজনার। মুনা কি আজ বলবে, ওমর, আমি তোমাকে ভালবাসি!

সারাটা রাত কী রকম একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছে ওমরের। একবারও ভিসিআর অন করেনি সে। একবারও মিউজিক সেন্টার অন করেনি। অবিরাম সিগ্রেট টেনেছে, অবিরাম ভেবেছে মুনার কথা। এরকম ঘোরের মধ্যে মানুষের কি ভাল ঘুম হয়! ওমরের হয়নি। বারবার তন্দ্রার মতো এসেছে, বারবার ভেঙে গেছে। বিছানায় শুয়ে সিগ্রেট টেনেছে ওমর। দুবার উঠে জল খেয়েছে। তারপর সকাল হয়েছে। কিন্তু ঘোরটা কাটেনি ওমরের। সকাল থেকে বিকেলের মুখ অব্দি, এই এতটা সময়, এখনও সেই ঘোরের মধ্যেই আছে ওমর। স্বপ্নের মধ্যে আছে। মুনার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত ঘোরটা কাটবে না তার। স্বপ্নটা ভাঙবে না। কাল রাত থেকে এই এখন পর্যন্ত ওমর যে মনে মনে কতবার বলেছে, মুনা, আমি তোমাকে খুব ভালবাসব। খুব ভালবাসব। এমন ভালবাসা কেউ কাউকে কখনও বাসেনি। কোনও প্রেমিক কোনও প্রেমিকাকে নয়। কোনও প্রেমিকা কোনও প্রেমিককে নয়।

বিকেলের মুখে মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ওমর। তার আগে কাজের ছেলেটাকে দিয়ে নিজেদের বাগান থেকে তুলিয়েছে তিন রঙের ফুটে থাকা সব গোলাপ। লাল সাদা গোলাপি। পাতলা একটা শপিংব্যাগে, যত্ন করে ভরা হয়েছে

www.shopnil.com

গোলাপগুলো। ওমরের প্ল্যান হচ্ছে, দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনাকে সে বলবে, মুনা তুমি একটু চোখ বোজ তো!

মুনা হয়তো অবাক হয়ে বলবে, কেন?

বোজ না!

না, আমাকে আগে বল।

বলব, তুমি চোখ বোজ।

তখন বাধুক মেয়ের মতো চোখ বুজবে মুনা। ওমর বলবে, এবার হাত পাত।

চোখ বুজে মুনা তার খোলা একটা হাত বাড়িয়ে দেবে ওমরের দিকে। ওমর বলবে, দুহাত পাত। প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

মুনা দুহাত পাতবে। সঙ্গে সঙ্গে শপিংব্যাগ থেকে সবগুলো গোলাপ মুনার হাতে ঢেলে দেবে ওমর। বলবে, ফুল হচ্ছে যে কথা তোমাকে বলা হয়ে গেছে।

মোটর সাইকেলে বসে এর পরের দৃশ্যটা কল্পনায় হুবহু দেখতে পেল ওমর। প্রার্থনার ভঙ্গিতে মেলে দেয়া দুহাত উপচে গোলাপ যখন উপচে পড়ছে পার্কের ঘাসে, তখুনি চোখ খুলেছে মুনা। তারপর হাতভর্তি তিন রঙের বিশাল সব গোলাপ দেখে, পায়ের কাছে ঘাসের ওপর ছড়ানো ছিটানো গোলাপ দেখে, এতটা মুগ্ধ হবে সে, অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারবে না। স্টিল ফটোগ্রাফির মতো তাকিয়ে থাকবে ওমরের দিকে। সেই চোখে থাকবে পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য। তারপর পায়ের কাছে ছড়িয়ে থাকা গোলাপ কুড়াতে বসবে মুনা। কুড়িয়ে আঁচলে জড় করবে। আর ওমর তখন মুনার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলবে, মুনা, আমি তোমাকে খুব ভালবাসব। খুব ভালবাসব। এমন ভালবাসা কেউ কাউকে কখনও বাসেনি। কোনও প্রেমিক কোনও প্রেমিকাকে নয়। কোনও প্রেমিকা কোনও প্রেমিককে নয়।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনায় ওমর শুনতে পেল, ফুল কুড়ানো শেষ করে মুনা বলছে, ওমর, আমিও তোমাকে খুব ভালবাসব। এমন ভালবাসা কেউ কাউকে কখনও বাসেনি। কোনও প্রেমিকা কোনও প্রেমিকাকে নয়, কোন প্রেমিক কোনও প্রেমিকাকে নয়।

কল্পনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পিড ব্রেকারে ধাক্কা খেল ওমরের মোটর সাইকেল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল ওমর। ঠোঁটে সুন্দর একটা হাসি ফুটে উঠল তার।

ওমর তারপর মোটর সাইকেল নিয়ে বনভূমির পাশের সেই খোলা মতন পার্কটায়, লেকের কাছাকাছি চলে এল। এসে মোটর সাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করল। তারপর গোলাপ ভর্তি শপিং ব্যাগটা হাতে নিয়ে মোটর সাইকেলের ওপর বসে রইল। অনেকক্ষণ সিগ্রেট খায়নি ওমর। কিন্তু সিগ্রেট খাওয়ার কথা মনে পড়ল না তার।

গাড়ির পেছনের সিট থেকে জাহিদ মন্টু আর গোগো নামল। সামনের সিট থেকে নামল চুমকি। তারপর গাড়ি লক করে ড্রাইভিং সিট থেকে নামল মুনা।

গাড়ি থেকে নেমেই প্যান্টের পকেটে হাত দিয়েছে গোগো। হাত দিয়ে একটা ট্যাবলেট বের করল। কাঁপা কাঁপা হাতে ট্যাবলেটের মোড়ক খুলে টকাস করে মুখে পুড়ল। তারপর সিগ্রেট ধরাল।

মন্টু বলল, কোথায় থাকতে বলেছিস?

আঙুল তুলে বনভূমির পাশের খোলা মতন পার্কটা দেখাল মুনা। ওই দিকে।

মন্টু সরু চোখে পার্কটার দিকে তাকাল। তাকিয়ে রইল।

মন্টু দেখতে অনেকটা জাপানিদের মতো। বেঁটে খাট। টকটকে ফরসা। ইঁদুরের মতো কুতকুতে চোখ, বোঁচা নাক। বয়স গোগো জাহিদের মতো। কিন্তু দাড়িগোঁফ তেমন নেই মন্টুর। যা দুচারটে গজায় তাই প্রতিদিন যত্ন করে কামায়। শরীরটা লিকলিকে। মনে হয় যে কেউ ধাক্কা দিলেই উল্টে পড়ে যাবে মন্টু। আসলে তা নয়। শরীরের প্রচণ্ড শক্তি রাখে মন্টু। জুডু ক্যারাট এসব শিখেছে বহুদিন ধরে। এমনিতে অসম্ভব ধীর স্থির, শান্ত। কিন্তু মারপিটে ওস্তাদ মন্টু। গোগোরা কোথাও ওসব কাজে গেলে অবশ্যই মন্টুকে নিয়ে যাবে। এই যেমন আজ নিয়ে এসেছে।

মন্টুর দিকে একবার তাকিয়ে পার্কটার দিকে তাকাল মুনা। বিকেলের আলোয় কী সুন্দর হয়ে আছে জায়গাটা! মৃদু হাওয়ায় পার্কের গাছপালা নড়ছে। লেকের জলে উঠছে তিরতিরে চমৎকার ঢেউ। এসব দেখে বুকের খুব ভেতরে কী রকম একটা কাঁপন টের পেল মুনা। নিজের অজান্তে নিচের ঠোঁটের ডানদিকটা কামড়ে ধরল সে। চোখে চলে এল ভারি উদাস এক দৃষ্টি।

চুমকি বলল, এই মুনা, কি ভাবছিস?

চমকে চুমকির দিকে তাকাল মুনা। মৃদু হাসল। কিছু না।

আচ্ছা শোন, তুই বললি আর আসতে রাজি হয়ে গেল?

জাহিদ বলল, হবে না! ছেলে তো!

শুনে হেসে উঠল মন্টু। তার ওপর শালা মুনার প্রেমে একদম মজনু হয়ে আছে।

মুনা কোনও কথা বলে না। উদাস হয়ে কী ভাবে!

মুনা এক সময় বলল, তাহলে?

মন্টু বলল, আমরা এদিকেই থাকব।

আরও কিছু বলতে চেয়েছিল মন্টু। তার আগেই জাহিদ বলল, তুই যা। আমরা আড়ালে আছি। চোখ রাখব। তাছাড়া এটা তো প্ল্যান করাই।

চুমকি বলল, আমি কি মুনার সঙ্গে যাব?

কথাটা শুনে এমন চোখে চুমকির দিকে তাকাল গোগো, সেই চোখ দেখে চুমকি খুব ঘাবড়ে গেল। কিছু একটা বলতে যাবে সে, গোগো বলল, না।

www.shopnil.com

না শব্দটার উচ্চারণ বেশ আপত্তিকর। শুনে ঘাবড়ে যাওয়া ভাবটা কেটে গেল চুমকির। সেখানে দেখা দিল রাগ। রাগী গলায় চুমকি বলল, ঠিক আছে, বুঝলাম তো! কিন্তু অমন করে তাকানোর কী হলো! মাগো, চোখ দেখলেই ভয় লাগে!

গোগোর চোখ খুবই লাল হয়েছে। খানিক আগে ট্যাবলেট খেয়েছে। ট্যাবলেটের অ্যাকশান বোধহয় শুরু হয়ে গেছে। চোখ ঢুলুঢুলু করছে গোগোর।

নেশাক্ত চোখ তুলে মুনার দিকে তাকাল গোগো। দরকার হলে চিৎকার করবি মুনা। আমরা এখানেই আছি। যা।

গোগোর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল মুনা। তারপর বনভূমির পাশে পার্কটার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। বুকের খুব ভেতরে সেই কাঁপনটা তখনও ছিল মুনার।

গাছপালার আড়াল থেকে মুনাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই ওমরের বুকের ভেতর এক সঙ্গে বেজে উঠল এক হাজারটা সানাই। চোখের সামনে উড়তে শুরু করল লক্ষ লক্ষ নীল প্রজাপতি। বনভূমির পাশে অবহেলায় পড়ে থাকা গরিব দুঃখী পার্কটা হয়ে উঠল স্বর্গের সুবাসিত উদ্যান। পাশের শীর্ণ দরিদ্র লেকটি হয়ে উঠল স্বর্গের খুব কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া কলশ্রোতা কোনও নদী। গভীর ভালবাসায় জলের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল জল। ওমর সেই কথা বলার শব্দ পেল।

গোলাপভর্তি শপিং ব্যাগটা হাতে নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মোটর সাইকেল থেকে নামল ওমর। নেমে মুনার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওই তো মুনা তার দিকে হেঁটে আসছে। মুনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওমরের মনে হলো, বহু জন্মান্তর পেরিয়ে ওই তো মুনা তার দিকে হেঁটে আসছে। এগিয়ে আসছে। ওমরও কি ছুটে যাবে মুনার দিকে! ছুটে গিয়ে বলবে, প্রিয়তমা, এই তো আমি!

না, ওমর তা করল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে রইল।

ওমরকে দেখে দূর থেকেই মিষ্টি করে হাসল মুনা। সেই হাসিতে ওমর দেখতে পেল নিবিড় বনভূমি ভেঙেচুরে এইমাত্র আকাশে উঠে গেল এক কোটি মার্কারি বালবের মতো একখানা চাঁদ। তীব্র সাদা উজ্জ্বল আলোয় পৃথিবী থেকে মুহূর্তে কেটে গেল শতাব্দীর প্রাচীন অন্ধকার। গাছপালার বন তোলপাড় করে বইতে শুরু করল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম হাওয়া। একশ বছরে এরকম হাওয়া কেবল একবারই বয়। আকাশ ছেয়ে গেল ভালবাসার তীব্র নীলে। মাথার ওপর স্থির হয়ে থাকল মেঘেরা। পায়ের তলায় মুখরিত হলো মৌন মাটি। জল বয়ে গেল হৃদয়ের শব্দে। পাখিরা যে যেখানে ছিল ডাকতে লাগল জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের ডাক। পৃথিবীর যাবতীয় মনোহর রঙ পাখায় মেখে উড়তে লাগল প্রজাপতিরা। এ বড় সুখের সময়। এ বড় আনন্দের সময়।

মুনা তখন আলতো পায়ে পেরিয়ে আসছে হালকা ঘাসের মাঠটা। পা কি খুব শ্লথ মুনার! এতটা সময় লাগছে কেন ওইটুকু মাঠ পেরিয়ে আসতে!

www.shopnil.com

ওমরের মনে হলো ছোট্ট মাঠটাকে যেন এক মুহূর্তে টান দিয়ে মাইল মাইল দীর্ঘ করে দিয়েছে ওমরের কোনও অদৃশ্য ভিলেন। সে চাইছে না দ্রুত ওমরের সঙ্গে মিলিত হোক মুনা, দ্রুত প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হোক প্রেমিকা! কিন্তু একা এতটা দীর্ঘপথ কেমন করে পেরিয়ে আসবে মুনা! কষ্ট হবে না তার! কথাটা ভেবে দ্রুত মুনার দিকে হাঁটতে শুরু করল ওমর।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনভূমির গাছপালা দেখতে পায় অনন্ত কাল অপেক্ষার পর একজোড়া মানব মানবী এইমাত্র এগিয়ে যাচ্ছে পরস্পরের দিকে। দৃশ্যটা দেখে খুবই আহ্লাদিত হলো তারা। মানব মানবীর সম্মানে ডালপালা থেকে মুহূর্তে মুছে দিল তারা হাওয়ার শব্দ।

পাখিরা দেখে তাদের আনন্দ-সঙ্গীত সার্থক হতে যাচ্ছে। সঙ্গীত বন্ধ করল তারা।

প্রজাপতিরা দেখে তারা যা চেয়েছে তা হতে যাচ্ছে। সুতরাং ওড়াউড়ি বন্ধ করে অন্তরীক্ষে স্থির হলো সব প্রজাপতি।

তখন ঘাসবন এবং লেকের জলের ছিল না কোনও শব্দ। চারদিকের প্রকৃতি ছিল ধ্যানমগ্ন হয়ে। আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানকার যাবতীয় শব্দ ডুবে ছিল মৌনতার গভীরে। কারণ এটাই প্রকৃতি চাইছিল, যা স্বাভাবিক তাই হোক। প্রেমিক খুঁজে পাক প্রেমিকাকে। কিংবা প্রেমিকা প্রেমিককে।

তখন, ঠিক তখুনি ঘটল ব্যাপারটা। কী ছিল বিধাতার মনে, কে জানে। পায়ের কাছে, ঘাসবনে কিছু একটা দেখে, চোখ বুজে প্রাণ ফাটানো চিৎকার দিয়ে উঠল মুনা। শিশুর মতো। সেই চিৎকারে মুহূর্তে ভেঙে খানখান হয়ে গেল স্তব্ধ হয়ে থাকা প্রকৃতি। গাছপালার বনে ছটফট করে বইতে শুরু করল পাগল হাওয়া। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাখিরা ডাকতে শুরু করল ভয়ার্ত স্বরে। অন্তরীক্ষে ভাসমান প্রজাপতিরা দ্রুত পাখা চালাল। জায়গাটা পেরিয়ে গেল। ঘাসবনে উঠল মাটির গভীরে শেকড়-বাকড় নামিয়ে দেয়ার চুটপুটে শব্দ। আর কলকল করে বইতে শুরু করল লেকের মোলায়েম জল।

মুনার চিৎকারে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ওমর। তারপর কিছু না বুঝেই পাগলের মতো মুনার দিকে ছুটতে শুরু করল সে। হাতের শপিং ব্যাগ কোথায় ছিটকে পড়ল, কোথায় ছড়িয়ে পড়ল আদর করে তোলা তিনরঙের গোলাপ, ওমর কিছুই খেয়াল করল না, কিছুই দেখতে পেল না। ছুটে গিয়েই দুহাতে মুনাকে জড়িয়ে ধরল ওমর। মুনা, মুনা কী হয়েছে তোমার?

কিছু না বুঝে ওমরের বুকে মুখ লুকাল মুনা। দুহাতে ওমরকে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত পাখির মতো কাঁপতে লাগল। গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরুল না তার।

মুনাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেই গভীর গলায় ওমর বলল, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন মুনা! এই তো আমি আছি তোমার কাছে। আমি কাছে থাকলে তোমার কোনও ভয় নেই তোমার যাবতীয় ভয় আমি ভেঙে দেব। মুনা মুনা মুনা!

আলতো করে নিজের মুখটা মুনার সুন্দর কোমল ঘাড়ের কাছে নামিয়ে আনল ওমর।

মুনার চিৎকার শুনে মুহূর্তে নড়েচড়ে উঠল পুরো দলটা। ওদের মনে হলো নিশ্চয় মুনাকে কোনও অসম্মান করেছে ছেলেটি।

গাছপালার আড়ালে হাত-পা ছড়িয়ে বসে ছিল ওরা। বসে সিগ্রেট টানছিল কেউ, কথা বলছিল কেউ। যদিও কথা ছিল আড়াল থেকে মুনার দিকে চোখ রাখবে সবাই। কিছু হলে ওরা তো তা দেখতেই পাবে। কিন্তু মুনা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনভূমির ভেতরকার ঘাসের ওপর বসেছে ওরা। বসে বুঝি ভুলেই গিয়েছিল মুনার দিকে চোখ রাখার কথা। এখন মুনার চিৎকারে টের পেল কী কাজে ওরা আজ এসময় এখানে এসেছে।

একসঙ্গে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠল তিন যুবক। গোগো, জাহিদ আর মন্টু। উঠে দাঁড়াল এক যুবতী। চুমকি। তারপর মুখে কারও কোনও কথা নেই, পাগলের মতো ছুটতে লাগল।

বনভূমির বাইরে খোলামেলা জায়গাটায় এসে মাথা খারাপ হয়ে গেল ওদের। অজান্তে পা থেমে গেল। পার্কমতো জায়গাটার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে মুনা আর সেই যুবক। যুবক দুহাতে বুকে জড়িয়ে রেখেছে মুনাকে। যুবকের মুখ মুনার ঘাড়ের কাছে। একটুও নড়ছে না কেউ। যেন স্টিল ফটোগ্রাফি।

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল ওরা। এসময় ফিসফিসে গলায় গোগো বলল, নিঃশব্দে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব আমরা। যেন ওরা কিছু টের না পায়। তারপর আমি হঠাৎ করে হাততালি দেব। তখন...

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। মন্টু বলল, পজিশান নিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনদিকে তিনজন। মারব একদম ফিলমি কায়দায়। তিনদিক থেকে তিনজনে।

জাহিদ বলল, চুমকি, তুই গিয়ে মুনাকে জড়িয়ে ধরবি।

চুমকি কোনও কথা বলল না। ঢোক গিলল। চুমকি কি একটু ভয় পেল!

পা টিপে টিপে ওরা তারপর মুনা এবং সেই যুবকের দিকে এগুতে লাগল।

ওমরের মনে হলো গভীর ঘুমে ডুবে আছে সে। এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। নিরিবিলি একটা পার্কমতো জায়গায় মুনাকে সে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখটা ডুবে আছে মুনার ঘাড়ের কাছে, কোমল মাংসে। মুনার শরীর থেকে, চুল থেকে আসছে চন্দন বৃক্ষের গন্ধ। যে গন্ধে স্নায়ু নিস্তেজ হয়ে যায়। ঘুম ছাড়া মানুষের আর কোনও উপায় থাকে না। ওমরেরও ছিল না। জেগে জেগেই ওমর চলে গিয়েছিল ঘুমের রাজ্যে। স্বপ্নের রাজ্যে। কতক্ষণ যে বিচরণ করেছিল সেই সুখের রাজ্যে, কে জানে!

হঠাৎ ওমর শুনতে পেল দূরে, বহুদূরে কোথায় যেন কে একজন হাততালি দিচ্ছে। থেকে থেকে আসছে শব্দটা। ওমরের মনে হলো হয়তো বা স্বপ্নের ভেতর থেকেই আসছে শব্দটা। অথবা ঘুমের ভেতর থেকে। আসুক। এই শব্দে ওমরের কী এসে যায়! কিন্তু না, শব্দটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠল, ওমরের মনে হলো তার কানের খুব কাছে দাঁড়িয়েই হাততালি দিচ্ছে কেউ। এবার চমকে উঠল ওমর। ধরফর করে মুখ তুলল মুনার ঘাড় থেকে। মনে হলো গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল সে। কোনও এক সুখী স্বপ্নের রাজ্য থেকে এইমাত্র ফিরে এল।

তখুনি বুকে জড়িয়ে ধরা মুনাকে দেখতে পেল ওমর। তখনও থরথর করে কাঁপছে মুনা, টের পেল। টের পেয়ে পুরো ঘটনাটা মনে পড়ল তার। ওমরের ইচ্ছে হলো মুনাকে আর গভীর করে জড়িয়ে ধরে সে। গভীর করে বলে, ভয় কী মুনা! এই তো আমি তোমার সামনে। তাকাও, তাকিয়ে দেখ, আমি আমি...

তার আগেই কানের কাছে আবার সেই হাততালির শব্দ। ফ্যালফ্যাল করে সেই শব্দের উৎসের দিকে তাকাল ওমর। তাকিয়ে রইল। অনেকটা আবিষ্টের মতো। তখনও তার বুকে জড়ানো মুনা। তখনও থরথর করে কাঁপছে মুনা।

হাততালি দিতে থাকা যুবকটি টেনে টেনে বলল, বাহ্ বাহ্, বাহ্ বাহ্। কিয়া সিনারি! সাবাস বেটা, সাবাস!

তারপর পকেটে হাত দিল সেই যুবক। একটা ট্যাবলেট বের করল। বের করে, মোড়ক খুলে ট্যাবলেটটা যখন মুখে দিল, ওমর দেখতে পেল আর দুজন যুবক আছে তার সঙ্গে। মুনার বয়সী এক যুবতী আছে। যুবতীটির মুখ মরা মাছের মতো ফ্যাকাসে। আর যুবকদের মুখ প্রচণ্ড ক্রোধে পাথরের মতো ভারি।

সব দেখেও মুনাকে বুক থেকে সরাল না ওমর। মুনা যেমন দাঁড়িয়েছিল, ওমরের বুকে মুখ লাগিয়ে তেমনি রইল। চারপাশে যে এত কিছু ঘটছে এসবের কিছুই যেন টের পাচ্ছে না সে।

মুনাও কি তাহলে ডুবেছিল ওমরের মতো গভীর ঘুমে! বিচরণ করছিল সুখী স্বপ্নের উদ্যানে। তখনও কি ঘুম ভাঙে নি মুনার ফেরা হয়নি স্বপ্ন থেকে!

ট্যাবলেট মুখে দেয়া যুবকটি এবার আগের মতোই টানা স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, বেটা হিরো, চেন আমাকে? চেন?

একটু থামল যুবক। মুহূর্তের জন্য। তারপর প্রচণ্ড শব্দে চেঁচিয়ে উঠল। আরে হাম তো তেরা ভিলেন হ্যায়রে শালে! সেই শব্দে ছটফট করে উঠল মুনা। পুরো ঘটনাটা মনে পড়ল তার। মনে পড়তেই পাগলের মতো ঝটকা মেরে ওমরের জড়িয়ে ধরা হাত সরিয়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে চুমকি ছুটে এল মুনার কাছে। এসেই জড়িয়ে ধরল মুনাকে। মুনা কী হয়েছে?

মুনা কথা বলল না। ভয়ার্ত চোখে গোগোর দিকে তাকাল। গোগো তখন এক পা এক পা করে ওমরের দিকে এগুচ্ছে। মুখটা থমথমে পাথরের মতো। চোখ দুটো

www.shopnil.com

টকটকে লাল। সেই লাল চোখ ফেটে বেরুচ্ছে ক্রোধ। কিন্তু ওমর যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। একটুও নড়ছে না সে। চোখে তার তখনও সেই স্বপ্নের চিহ্ন। মুনাকে স্পর্শ করার আবেশ সারা শরীর জুড়ে। ওমর বুঝতে পারল না আসলে কী হতে যাচ্ছে। তার দিকে এগিয়ে আসা যুবকটির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি এসে পড়ল ওমরের মুখে। এরকম একটা ব্যাপারের জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না ওমর। ঘুসি খেয়ে মাথাটা টলমল করে উঠল তার। শরীরটা অবশ হয়ে এল। মুখের ভেতর উষ্ণ একটা ভাব টের পেল সে। নিজের অজান্তেই একটা হাত মুখের কাছে উঠে গেল তার।

তখন পেছন থেকে অন্য আরেকজনের ভারি সাইজের দুটো রদ্দা পড়ল ওমরের ডান কাঁধে। মার দুটো এমন প্রাকটিস করা হাতের, ওমরের মনে হলো শরীরের ডানদিকটা এইমাত্র শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল তার। মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে লাল নীল হলুদ বেগুনি সাদা বিভিন্ন রঙের ফুলকি দেখল ওমর। দেখতে লাগল। এই অবস্থায় ধামাধাম ঘুসি আবার ওমরের মুখে মারল গোগো। মেরে মুনার দিকে তাকাল। সরল ভঙ্গিতে, অনেকটা ছেলে ভুলানো কায়দায় হাসল। কী রে মুনা, কেমন মারতে পাড়ি?

মুনার মুখ থেকে কখন যে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল রক্ত, কোন ফাঁকে কে জানে! নিউজ প্রিন্টের মতো মুখ তুলে মুনা আমতা-আমতা করে বলল, না না, ও!

কথাটা শেষ করতে পারল না মুনা। ওমরের দিকে তাকাল। ওমর তখন স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে আছে মুনার দিকে। ওপরের ঠোঁটটা মাঝখান থেকে প্রায় দুভাগ হয়ে গেছে। এক দিকের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। কপালের কাছটা ফুলে আলু হয়ে গেছে। তবুও ওমরের মুখের কোথাও কোনও দুঃখের চিহ্ন নেই। বেদনার চিহ্ন নেই। বড় মায়াময় চোখে মুনার দিকে তাকিয়ে আছে সে। মৃত্যুর আগে মানুষ যেমন করে তাকায় প্রিয়জনের মুখের দিকে, চোখে সে রকম দৃষ্টি ওমরের। দেখে বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল মুনার। মুনা বলল, গোগো, শোন শোন...

মুনার কথা একদমই কেয়ার করল না গোগো। মন্টুর দিকে তাকাল সে। মার্শাল আর্টটা একটু প্রাকটিস করত মন্টু, দেখি কেমন শিখলি। বহুদিন দেখার সৌভাগ্য হচ্ছিল না। মন্টু বলল, কেমন করে দেখাই। তুই আর জাহিদই তো!

জাহিদ বলল, এই আমরা হাত গুটালাম। এবার তুই।

সঙ্গে সঙ্গে দু তিনটে লাফ দিল মন্টু। হাত দুটোকে বিভিন্ন কায়দায় বাঁকাল, ঘোরালো আর মুখে শব্দ করতে লাগল প্রায় বাঘের মতো। সেই শব্দে মন্টুর দিকে মুখ ফেরাল ওমর। মুহূর্ত মাত্র, বুনো বৃষ্টির মতো ওমরের ওপর পড়তে লাগল কত রকমের যে ফ্লাইং কিক আর ঘুসি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে পড়ল ওমর। সেই অবস্থায় তাকাল মুনার চোখের দিকে। কাতর গলায় এই প্রথম কথা বলল। মুনা, মুনা তোমার সঙ্গে অনেক কথা ছিল আমার। অনেক কথা। কতকাল যে কথাগুলো ভেবেছি আমি! কতকাল যে বলতে চেয়েছি। তুমি, তুমি...

কথা শেষ হলো না ওমরের। তার আগেই মন্টুর আরেক রাউন্ড ফ্লাইং কিক। আস্তে ধীরে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল ওমরের। ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ল সে। তার আগে একবার শুধু বলল, মা মা!

স্টাডিরুম থেকে প্রায় ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মা। সন্ধেবেলা। মার মুখে এক ধরনের উদভ্রান্তির চিহ্ন। রিখু যথারীতি দাঁড়িয়েছিল রেলিংয়ের সামনে। রিখুর চোখ ছিল আকাশের দিকে। হাতে ছিল চায়ের কাপ। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চা খাচ্ছিল রিখু। মার পায়ের শব্দে আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মার মুখের দিকে তাকাল সে। অকারণে মিষ্টি করে হাসল। হঠাৎ পড়াশুনো ফেলে বেরিয়ে এলে যে!

মা অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ওমর কই রে?

শুনে রিখু আবার সেরকম মিষ্টি করে হাসল। আমি জানি?

জানিস না কেন?

ওমা, কেমন করে জানব! বিকেলবেলা ভাইয়া কখনও বাড়ি থাকে!

মা খুবই বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। মার মুখের দিকে তাকিয়ে রিখু বেশ একটু চমকাল। চিন্তিত গলায় বলল, কী হয়েছে, মামণি? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

এমনি।

না এমনি নয়। নিশ্চয় কিছু হয়েছে। তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ।

এগিয়ে এসে মার একদম গাঘেঁষে দাঁড়াল রিখু। গভীর গলায় বলল, কী হয়েছে মামণি?

আনমনা, উদাস গলায় মা বললেন, মনে হলো ওমর আমাকে খুব কাছ থেকে ডাকছে। অসুখ বিসুখ হলে, শরীরে খুব কষ্ট হলে বাচ্চা ছেলেরা যেমন করে মাকে ডাকে অনেকটা সেরকম কাতর ডাক।

কখন?

এই তো, খানিক আগে। আমি স্টাডিরুমে বসে পড়ছি। বইটার ভেতর খুবই মগ্ন হয়েছিলাম। ঠিক তখুনি শুনতে পেলাম মা মা করে ওমর আমাকে খুব ডাকছে। সেই ডাকে বুকের ভেতরটা এমন করে উঠল আমার। মুহূর্তে ওমরের জন্য পাগল হয়ে গেলাম আমি। ওমরকে দেখার জন্য ছটফট করে বেরিয়ে এলাম। এখন তুই বললি ওমর বাড়ি নেই, কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। তাহলে অত গভীর করে ওমরের গলায় কে আমায় ডাকল!

রিখু বলল, তুমি হয়তো ভুল শুনেছ!

না। আমার কখনও এমন হয় না।

মা একটু চুপ করে রইলেন। মুখের গভীর চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। মার মুখের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা কথা মনে হলো রিখুর। রিখু শুনেছে

www.shopnil.com

অতিরিক্ত পড়াশুনা করলে কখনও কখনও গণ্ডগোল দেখা দেয় মানুষের মাথায়। মার কি সেরকম কিছু হলো! নয়তো ভাইয়া বাড়ি নেই, আর বাড়ি থাকলেও স্টাডিরুমে কখনও ঢোকে না সে, এ অবস্থায় মা কোত্থেকে কেমন করে শুনল ভাইয়ার গলা! ভাইয়া নাকি খুবই কাতর গলায় মা মা করে ডাকছিল তাকে! অতিরিক্ত বই পড়ার ফলে মাথায় কি গণ্ডগোল দেখা দিল মার! মা কি পাগল হয়ে যাচ্ছে! আচ্ছা যদি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যায় মা তাহলে পাপা কী রকম করবে, ভাইয়া আর রিখু কী রকম করবে! পাগল হয়ে গেলে মাকে তো নিশ্চয় পাবনার হেমায়েতপুরে নিয়ে যাওয়া হবে। বাড়ি ছেড়ে মা থাকবে পাগলাগারদে। পাপা, ভাইয়া আর রিখু এই তিনজন মিলে মাঝে মাঝে হেমায়েতপুর যাবে মাকে দেখতে। বেশ মজা হবে তখন। আচ্ছা পাগলাগারদগুলো কেমন হয় দেখতে! পাগলদের তো মাথার ঠিক থাকে না, যখন যা ইচ্ছে হয় করে তারা, যা ইচ্ছে হয় বলে, ফলে তাদের একেক জনকে রাখা হয় আলাদা একেকটা ঘরে। ঘরে কি কোনও আসবাব থাকে! কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে রিখুর চোখে ভেসে উঠল কোনও একটা সিনেমায় দেখা পাগলাগারদের দৃশ্য। নায়িকা পাগল হয়ে সেখানে আছে। ঘরের তিনদিকে নিরেট দেয়াল। একদিকে জেলখানার মতো মোটা মোটা রঙের ভারি দরজা। দুটো রডের মাঝখানকার ফাঁকে মুখ রেখে হি-হি করে হাসছিল সেই সিনেমার নায়িকা। পাগল হয়ে গেলে, পাগলাগারদে চলে গেলে রিখুদের দেখে মাও কি অমন করে হাসবে! কথাটা ভেবে খুবই মজা পেল রিখু, মুখে আমুদের একটা হাসি ফুটে উঠল তার। মা বললেন, হাসছিস কেন?

সঙ্গে সঙ্গে গভীর হয়ে গেল রিখু। মামণি যে এতক্ষণ ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভুলেই গিয়েছিল রিখু। নিজেকে সামলে নিয়ে রিখু বলল, এমনি।

তোর পাপা বেরিয়ে গেছেন?

না।

কোথায়?

কোথায় আবার, তোমাদের বেডরুমে।

আর কোনও কথা বললেন না মা। অস্থির পায়ে বেডরুমের দিকে চলে গেলেন। মার হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে খুবই চিন্তিত হলো রিখু। সত্যি সত্যি গণ্ডগোল দেখা দিল মার মাথায়।

ওমরের মোটর সাইকেলটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। প্রথমে এল গোগো, মন্টু আর জাহিদ। তাদের পেছন পেছন এল চুমকি আর মুনা। মুনার মুখটা খুবই বিষণ্ণ হয়ে আছে। চোখে বহুদূরের দৃষ্টি। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় মনের ভেতর তুলকালাম কোনও কাণ্ড ঘটেছে তার। খানিক আগের ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা নিয়ে মুনা কি তাহলে গভীর করে কিছু ভাবছে! কোনও আত্মদংশন কি পীড়িত করছে তাকে!

ওমরের মোটর সাইকেলটার সামনে দাঁড়িয়ে মুনা মনে মনে বলল, না না, ওর কোনও দোষ ছিল না। ওর কোনও অপরাধ ছিল না। ও আমাকে বিন্দুমাত্র অপমান করেনি, অসম্মান করেনি। ঘাসবনে সাপের মতো কিছু একটা দেখতে পেয়েছিলাম আমি। সুরৎ করে আমার পায়ের সামনে দিয়ে চলে গেছে। ওই দেখে ভয় পেয়েছিলাম আমি। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। সেই চিৎকার শুনে ও এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ভয়ে আমি তখন দিশেহারা। কে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কে জড়িয়ে ধরেছে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। ভয়ে সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে আমার। আমিও মুখ লুকিয়ে ছিলাম ওর বুকে। বড় মায়ায়, বড় ভালবাসায় ও আমায় জড়িয়ে রেখেছিল। ওখানে কোনও পাপ ছিল না। কোনও অন্যায় ছিল না। তাহলে? গোগোরা যে ভাবে মারল ওকে, মেরে ফ্লাট করে ফেলল, তখন কেন এসব কথা বলতে পারলাম না আমি! কেন বাধা দিতে পারলাম না ওদের!

ডানদিকের ঠোঁট কামড়ে ধরে উদাস চোখে পার্কের মাঝামাঝি জায়গাটায় তাকাল মুনা। ওই তো ওখানে ঘাসে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ওমর। জ্ঞান নেই। অতটা মার খেলে কেমন করে জ্ঞান থাকে মানুষের! মরে যাওয়ারই তো কথা। ওমর, ওমর মরে... না না। বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে মুনার। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওমরের সামনে দাঁড়ায়। বুকে হাত দিয়ে, কান লাগিয়ে দেখে, না এখনও বেঁচে আছে ওমর। কিন্তু তারপর কী করবে মুনা!

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনায় মুনা দেখতে পেল ওমরের অচেতন দেহটা পাগলের মতো টেনে হিঁচড়ে নিজের গাড়ির সামনে নিয়ে যাচ্ছে মুনা। গাড়ির দরজা খুলে হাচর পাচর করে, কোনও রকমে ওমরের দেহটা তোলে গাড়ির পেছনের সিটে। কাজটা করতে ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে মুনার। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে হাপরের মতো ওঠানামা করছে তার বুক। শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ উঠছে ফোসফোস করে। এ রকম অবস্থায় পাগলের মতো, প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে সে। বিদেশী থ্রিলার ফিলমের নায়িকাদের মতো। নায়ককে তার বাঁচাতে হবে। ওমরকে তার বাঁচাতে হবে।

মুনাকে ধাক্কা দিয়ে চুমকি বলল, এই মুনা, কী ভাবছিস?

মুনা কিছু বলার আগেই জাহিদ বলল, এখন আর ভাবাভাবির কী আছে! কাজ তো ফিনিশ। ধোলাই যা দেয়া হয়েছে তাতে উঠে দাঁড়াতে একমাস লাগবে। জীবনে মুনার দিকে তো দূরের কথা অন্য কোনও মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও আর সাহস পাবে না।

চুমকি বলল, কিন্তু অমন করে পড়ে আছে কেন? মরে-টরে যায়নি তো!

কথাটা শুনে বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠল মুনার। কিছু একটা বলতে চাইল সে, তার আগেই মন্টু বলল, আরে না। আমার তো টেকনিক্যাল মার। সেন্সলেস হয়ে

www.shopnil.com

গেছে। ঘন্টা দুতিনেক এমন থাকবে। তারপর জ্ঞান ফিরবে। কিন্তু মাসখানেক উঠে বসতে হবে না।

মন্টুর কথায় বুকের হাহাকারটা একটু কমল মুনার। আনমনে ওমরের পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকাল সে!

তখন শেষ বিকেলের পড়ন্ত আলোয় পৃথিবী বড় সুন্দর হয়েছিল। রোদ উঠে গেছে বনভূমির মাথায়। তলায় পড়ে আছে মায়াময় আলোকিত একটা ভাব। ঝিরঝিরে একটা হাওয়া আছে। সেই হাওয়ায় মগ্ন হয়ে আছে গাছপালা, লেকের জল। প্রকৃতির এই সুন্দর পরিবেশে মানুষ মানুষকে মারে কেমন করে!

কথাটা মুহূর্তের জন্য মনে হলো মুনার। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিল সে। এসবের জন্য আমি দায়ী, আমি দায়ী। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল মুনার। তখুনি মুনা দেখতে পেল অদূরে ঘাসের ওপর পড়ে আছে সাদা একটা শপিং ব্যাগ। কিন্তু ব্যাগের ভেতর ওগুলো কী! ফুল!

ব্যাগটা বুঝি চুমকিও দেখতে পেয়েছিল। উচ্ছ্বসিত গলায় সে বলল, দেখ মুনা দেখ, এক ব্যাগ ফুল। মুনা কথা বলার আগে মন্টু বলল, শালা মুনার জন্য ফুল নিয়ে এসেছিল।

মুনার ইচ্ছে হলো, প্রচণ্ড একটা ধমক দেয় মন্টুকে। বলে, খবরদার মন্টু, গাল দিবি না।

কিন্তু না, এখন আর এসব পারে না মুনা। তার জন্যই তো কাজটা করেছে ওরা। ওমরকে নিয়ে এখন বিন্দুমাত্র বাড়াবাড়ি করতে গেলে উল্টো ঘটনা ঘটবে। যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। ওমর তো আর মরে যায়নি। দুতিন ঘন্টা পরে হলেও জ্ঞান তো ফিরবেই। মাসখানেক লাগলেও ভাল তো হবেই।

চুমকি বলল, মুনা ফুলগুলো আনব?

জাহিদ বলল, আন। আমরা সবাই ভাগযোগ করে নিই।

গোগো বলল, নে তোরা ফুলই নে। আমি মোটর সাইকেলটা নেব।

মন্টু বলল, মানে?

হ্যাঁ। দেখছিস না জিনিসটা প্রায় নতুন। হেভি দেখতে। মোটর সাইকেলটার সিটে ঠাস করে একটা চাপড় মারল গোগো। চাবি তো ওর পকেটেই আছে। তোরা চলে যাবি মুনার গাড়িতে। আমি ওর পকেট থেকে চাবি নিয়ে

কথাটা শেষ করতে পারল না গোগো। শীতল ভারি গলায় মুনা বলল, না।

মুনার গলায় কী ছিল কে জানে, সবাই মুনার মুখের দিকে তাকাল। গোগোর চোখ লাল। নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। মুনার কথায় বেশ একটা জার্ক খেল গোগো।

মুনা কিছু কেয়ার করল না। দৃঢ় গলায় বলল, জিনিসপত্র লুটপাট করার জন্য তোদেরকে এখানে আনিনি আমি। যে কাজে এনেছি সেটা হয়ে গেছে। এবার চল।

কী জানি কেন, আর কোনও কথা বলল না কেউ। গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। সবার শেষে ছিল মুনা, উদ্গ্রীব চোখে সে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ওমরের দিকে একবার তাকাল। বুকের ভেতরটা আবার হাহাকার করল তার।

বাইরে বেরুবার পোশাক পরেছে বাবা। বিকেল শেষ হয়ে আসছে! নিশ্চয় ক্লাবে যাবেন। মুখে সিগ্রেট, বিশাল ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট ঠিক করছিলেন তিনি। তখুনি আয়নায় ভেসে উঠল মার মুখ। মুখে উদভ্রান্তির ছাপ। কিন্তু সেই ছাপটি খেয়াল করলেন না বাবা। এ সময় ভদ্র মহিলাকে বেডরুমে ঢুকতে দেখে অবাক হয়েছেন তিনি। এমন ঘটনা তো ঘটে না বহুদিন। বিকেলবেলা স্টাডিরুম রেখে বেডরুমে এসেছেন ভদ্রমহিলা! আশ্চর্য ব্যাপার! হাসি হাসি মুখ করে বাবা বললেন, তুমি?

কথাটা বললেন আয়নার দিকে তাকিয়ে।

মা বললেন, আমাকে দেখে তোমরা সবাই খুব অবাক হও আজকাল, না?

এবার মুখ ঘোরালেন বাবা। কেন, একথা বলছ কেন?

আমার তাই মনে হলো।

তোমার মনে হওয়াটা বোধহয় ভুল নয়। কারণ তুমি তো সবসময় স্টাডিরুমেই থাক। যখন তখন স্টাডিরুমের বাইরে তোমাকে দেখলে অবাক তো আমরা হবই।

আশ্চর্যের ব্যাপার, রিখুটাও আমাকে দেখে ঠিক তোমার মতোই অবাক হলো।

ওর আর দোষ কী!

না, আমি কোনও দোষের কথা বলছি না।

তাহলে!

কথাটা জিজ্ঞেস করে তীক্ষ্ণ চোখে মার মুখের দিকে তাকালেন বাবা। তাকিয়ে চমকে উঠলেন। তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? খুবই অস্থির, উদভ্রান্তের মতো!

খানিক আগে বেশ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো। আমি স্টাডিরুমে বসে পড়ছি, আর আমার পড়া তো জানই, বইয়ের ভেতর এতটা ডুবে থাকি, আশেপাশে কোনও ঘটনা ঘটলেও টের পাই না। কিন্তু আজ হলো কি, এই তো খানিক আগে আমি শুনতে পেলাম ওমর আমাকে খুব কাছ থেকে মা মা করে দুবার ডাকল। ডাকটা এত করুণ। অসুখ বিসুখ হলে, শরীরে প্রচণ্ড কষ্ট হলে শিশুরা কাতরাতে কাতরাতে মাকে যেমন ডাকে অবিকল ওরকম ডাক। ডাকটা শুনে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল আমার। তোলপাড় করে উঠল। ওমরকে দেখার জন্য পাগল হয়ে গেলাম আমি। বইটা ফেলে ছুটে বাইরে এলাম। রেলিংয়ে রিখু দাঁড়িয়েছিল, ওমরের কথা জিজ্ঞেস করায় এতটা অবাক হলো সে, কী বলব! ওমর নাকি এ সময় কখনও বাড়ি থাকে না। আজও অনেক আগে বেরিয়ে গেছে। তাহলে আমাকে কে অমন করে ডাকল বল তো!

www.shopnil.com

মার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিক কী ভাবলেন বাবা। তারপর হেসে ফেললেন। ওসব মনের ভুল, বুঝলে! কোনও কিছু নিয়ে খুব বেশি মগ্ন থাকলে অবচেতন মনের ভেতর কখনও কখনও প্রিয়জনের এরকম ডাক-টাক শোনা যায়। ওসব কিছু না।

তারপর একটু থেমে বাবা বললেন, ভেতরে ভেতরে তুমি আসলে বেশ ক্লান্ত হয়ে আছ। এজন্যও এমন হতে পারে। তাছাড়া ওমরের সঙ্গে বেশ কদিন হয়তো অমন করে দেখা হয়নি তোমার। ছেলেকে খুব কাছে পাও না অনেকদিন। এরকম বেশ কিছু কারণে এমন হয়েছে। রেস্ট নাও, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দাও, নয়ত চল কদিন বাইরে কাটিয়ে আসি সবাই মিলে, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। আমারও একটু রেস্টের প্রয়োজন। ভালই হবে।

শূন্য গলায় মা বললেন, তুমি কি বেরুচ্ছ? আজ না বেরুলে হয় না!

কেন?

এমনি, আমার বড় অস্থির লাগছে। ওমরকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

ওকে এখন কোথায় পাবে! কোথায় যায় না যায় তার কোনও ঠিক ঠিকানা আছে!

চোখ থেকে চশমাটা খুলে শাড়ির আঁচলে ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন মা। সেই ফাঁকে বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ঠিক আছে, তোমার যদি খুব দরকার থাকে তাহলে যাও।

কথাটা শুনে খানিক কী ভাবলেন বাবা। তারপর হেসে ফেললেন। না, ঠিক আছে। আমি টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি, আজ যাচ্ছি না।

বনভূমির পাশের নির্জন রাস্তা দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল যুবরাজ। তার পরনে অ্যাশ কালারের কডের জ্যাকেট, একই রঙের কডের প্যান্ট। পায়ে সাদা কেডস। যুবরাজের পিঠে ছিল মোটা কাপড়ের, সবুজ রঙের খুবই ফ্যাসনেবল একটা ব্যাগ। দুবগলের নিচ দিয়ে এসে দুকাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেছে ব্যাগের বেল্ট। এ ধরনের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দ্রুত হাঁটা-চলা করতে পারে মানুষ। যুবরাজও পারছিল। দূর থেকে তাকে দেখাচ্ছিল বিদেশী ফিলমের ব্যস্ত নায়কদের মতো। দ্রুত কোথাও কি যাওয়ার কথা তার! কোথায়?

যুবরাজের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। মাথার চুল উসকো খুসকো। চোখে খানিকটা চিন্তার দৃষ্টি। তবুও, যুবরাজের চেহারা বেশ ধারালো বলে শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় তাকে দেখাচ্ছিল দুর্দান্ত। এই রকম নির্জন বিকেলে, এই রকম পরিবেশে একাকী কোত্থেকে এল যুবরাজ! কোথায় যাবে?

বনভূমির পাশের খোলামেলা পার্কমতো জায়গাটার সামনে গিয়ে দ্রুত হেঁটে যাওয়ার সময় আনমনে পার্কটার দিকে একবার তাকাল যুবরাজ। তাকিয়ে চমকে উঠল। আরে, পার্কটার মাঝমধ্যিখানে দেখি উপুর হয়ে পড়ে আছে এক যুবক। দূরে

দেখা যাচ্ছে একটা মোটর সাইকেল! দৃশ্যটা দেখে থমকে দাঁড়াল যুবরাজ। কি, ব্যাপারটা কী! এ রকম নির্জন একটা জায়গায়, সন্ধ্যে হয়ে আসছে এ রকম সময়ে একাকী উপুর হয়ে পড়ে আছে এক যুবক। অদূরে দেখা যাচ্ছে একটা মোটর সাইকেল। মোটর সাইকেলটা নিশ্চয় ওই যুবকের। মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে যুবক কি তাহলে একাকী শুয়ে আছে ঘাসের ওপর! ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!

পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ উপুর হয়ে পড়ে থাকা যুবকের দিকে তাকিয়ে রইল যুবরাজ। ভাবল, তার বয়সী আজকালকার পয়সাঅলা ঘরের ছেলেমেয়েদের পাগলামোর তো কোনও সীমা পরিসীমা নেই। যখন যা ইচ্ছে করে তারা। ভিসিআরে বিদেশী ফিলম দেখে দেখে এক ধরনের অত্যাধুনিক জীবনযাপন রপ্ত করছে। এই ব্যাপারটিও সেরকম অত্যাধুনিক জীবনযাপনের অংশ বিশেষ হয়তো। কথাটা ভেবে বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল যুবরাজের। আধুনিকতার সঙ্গে কি পাগলামোর একটা মিল আছে! নাকি পাগলামোর মধ্যেই আছে আধুনিকতা! কিন্তু ছেলেটা উপুর হয়ে পড়ে আছে তো পড়েই আছে! একটুও নড়ছে না। একদম স্থির। তখন খানিক আগে ভাবা কথাগুলোর ঠিক উল্টো কিছু কথা মনে হলো যুবরাজের! ছেলেটা মরে যায়নি তো! এধরনের বড়লোকের ছেলেরা তো আজকাল নেশাভাঙ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ড্রাগ এডিকশান। হেরোইন, পেথেড্রিন কত কি নেশার দ্রব্য আছে তাদের, ও রকম কিছু করেনি তো যুবক! নির্জন জায়গায় এসে, একাকী নেশা করে খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে! বাহ্ বাহ্! একদম ওয়েস্টার্ন ফিলম। মাঠের মাঝমধ্যিখানে উপুর হয়ে পড়ে থাকা যুবকের ব্যাপারে ক্রমশ বেশ আগ্রহী হয়ে উঠল যুবরাজ। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল যুবকের কাছে। তাকে জানতেই হবে আসল ব্যাপারটা কী! কিন্তু যুবরাজ গিয়ে সামনে দাঁড়াল, তার পায়ের শব্দে একটুও নড়ল না যুবক। যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে রইল। জ্ঞান নেই নাকি! নাকি গভীর ঘুম! বেশ জোরে গলা খাঁকারি দিল যুবরাজ। না, সাড়া নেই। চিন্তিত হয়ে যুবকের সামনে বসল যুবরাজ। পিঠে আলতো করে ধাক্কা দিল। এই যে, এই শুনতে পাচ্ছেন? কী হয়েছে আপনার? না, সাড়া নেই।

এবার কাঁধের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে যুবককে চিত করল যুবরাজ। তখন গোঙানির মতো মৃদু একটা শব্দ করল যুবক। সেই শব্দ কানে গেল না যুবরাজের। যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। আরে, আমার দুটো ভাবনার কোনোটাই তো মিলছে না। এ তো দেখি অন্য কেস। ধোলাই দিয়ে ফেলে রেখে গেছে। যাহ্ বাবা। জিউগ্রাফি তো একদম বিগড়ে গেছে। চোখ ফোলা, ঠোঁট কাটা। জায়গায় জায়গায় আলু হয়ে গেছে। যুবকের মুখ দেখে হঠাৎ করে বেশ তৎপর হয়ে উঠল যুবরাজ। যুবকের মুখের ওপর ঝুঁকে বলল, এই যে মিয়া ভাই, কেমন লাগছে এখন? আ?

যুবকের কোনও সাড়া নেই। তখন অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মোটর সাইকেলটার দিকে তাকাল যুবরাজ। তাকিয়ে আবার একটু চিন্তিত হলো। যুবককে কি

www.shopnil.com

হাইজাকাররা ধরেছিল। জিনিসপত্র সব ছিনতাই করে মেরে ফেলে রেখে গেছে! তাহলে মোটর সাইকেলটা নেয়নি কেন ? চাবি তো নিশ্চয় যুবকের পকেটেই আছে! মাথার ভেতর চিন্তাভাবনা সব দ্রুত জট পাকাতে লাগল যুবরাজের। আর ঠিক তখুনি তার চোখে পড়ল যুবকের গলায় মোটা সোনার চেন। গলার সঙ্গে সেঁটে আছে জিনিসটা। চেনটা দেখে শিওর হয়ে গেল যুবরাজ, না, হাইজাক নয়। ব্যাপারটা অন্যরকম কিছু।

কিন্তু যুবকের গলার মোটা চেনটা দেখে ভেতরে ভেতরে খুবই খুশি হয়ে উঠল যুবরাজ। চেনটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, গুড, ভেরি গুড।

তারপর চেনটা খুলে দ্রুত নিজের গলায় পরে নিল। এবার আরেকটা কথা মনে হলো যুবরাজের। গলায় চেন যেহেতু আছে, নিশ্চয় মানিব্যাগটাও আছে হিপ পকেটে! কথাটা ভেবে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল যুবরাজ। তারপর অবলীলায় হাত ঢুকিয়ে দিল যুবকের কোমরের তলায়। হিপ পকেট থেকে কায়দা করে বের করে আনল মোটা তাজা দামি একটা মানিব্যাগ। তারপর ব্যাগটা চোখের সামনে তুলে ধরে খে খে করে একটা হাসি দিল। আমার পকেটে একটা ফুটো পয়সাও ছিল না। আর এখন কেমন করে, প্রায় অলৌকিক উপায়ে একটা মানিব্যাগ!

কিন্তু মালপানি আছে তো মানিব্যাগে! নাকি ফাকসু! দ্রুত মানিব্যাগটা খুলল যুবরাজ। খুলে চোখ প্রায় ছানাবড়া হয়ে গেল তার। ব্যাগের ভেতর থরে থরে সাজানো বেশ কয়েকটা পাঁচশ টাকার নোট, কিছু আছে একশ টাকার, কয়েকটা আছে পঞ্চাশ টাকার। বিশ টাকা দশটাকারও আছে। এমনকি পাঁচ টাকা এক টাকারও। সব দেখে যুবরাজ আবার সেই খে খে হাসিটা হাসল। যদিও তার চেহারা, আচার আচরণ, পোশাক আশাক ইত্যাদির সঙ্গে এই হাসিটা একদম মানায় না। তবুও কখনও কখনও এই হাসিটা হাসে যুবরাজ। অলৌকিক উপায়ে কিছু পেয়ে যাওয়ার পর। যুবকের উদ্দেশে যুবরাজ তারপর মনে মনে বলল, বেশ মালদারের পুত্র মনে হচ্ছে! নাম কী ভাই আপনার ? আ ? না না, ভাই নয়! ভাই নয়! স্যার। ইউর নেম প্লিজ স্যার! আপনার মতো মালদার অনারেবল লোকের সঙ্গে বাংলাভাষায় কী করে কথা বলি! হাতে টাকা পেলে, বুঝলেন স্যার, আন্ডারস্ট্যান্ড, বাংলাটা আমার আবার একদম আসে না।

কোনও ব্যাপারে অতিশয় আনন্দিত হলে যুবরাজ এরকম মনে মনে আবোল তাবোল অনেক কথা বলে। স্বভাব।

যুবরাজ তারপর মানিব্যাগ থেকে খুচরা টাকাগুলো নিয়ে বুক পকেটে রাখল। মনে মনে বলল, গুড বিজনেস। ভাল বাণিজ্য। সাবাস মিয়া মোহাম্মদ যুবরাজ। মাস তিন চারেকের গতি হয়ে গেছে আপনার। পকেটে মাল আছে, আপনি এখন খোদাই ঘাড়ের মতো চড়ে বেড়ান। খান দান, ফুর্তিফার্তি করেন। নো প্রবলেম।

চড়ে বেড়াবার কথা মনে হতেই মোটর সাইকেলটার দিকে তাকাল যুবরাজ। তারপর আবার খুশি হয়ে গেল। নিজের উদ্দেশে খুবই বিনীত গলায় যুবরাজ বলল,

যুবরাজ সাহেব, আজ থেকে আপনাকে আর পায়ে হাঁটতে হবে না। মুড়ির টিন বাসে আর বাদুরঝোলা হতে হবে না। এখন থেকে আপনি স্যার একদম লেটেস্ট একখানা মোটর সাইকেল, সুজুকি চালাবেন। মাথায় হেলমেট, আপনাকে শালা, না না শালা নয়, শালা নয়, স্যার। আপনাকে স্যার আর পায় কে! আজ থেকে আপনার ফিউচার খুবই ব্রাইট। ঝকঝকে উজ্জ্বল। যুবরাজ তারপর পাগলের মতো যুবকের বিভিন্ন পকেট তন্ন তন্ন করে মোটর সাইকেলের চাবি খুঁজতে লাগল। বাঁ দিকের সাইড পকেটে পেয়েও গেল একসময়। পেয়েই লাফিয়ে উঠল। চাবিটা একবার ছুড়ে দিল আকাশের দিকে। তারপর ঠিক সুনীল গাভাসকার স্টাইলে ক্যাচ ধরল।

ঘাসে পড়ে থাকা সেই যুবক তখন একটু নড়েচড়ে উঠল। মৃদু গোঙানি বেরুল তার মুখ থেকে। শব্দটার মধ্যে কী ছিল কে জানে, বুকের ভেতরটা হঠাৎ করে কেমন দুলে উঠল যুবরাজের। হাতে এখনও ধরা মানিব্যাগটা, চাবিটা। মানিব্যাগটা হিপ পকেটে রাখল যুবরাজ। চাবিটা রাখল সাইড পকেটে। তারপর যুবকের সামনে হাঁটু ভেঙে বসল। আস্তে আস্তে থাপ্পর মারতে লাগল যুবকের গালে। এই যে, এই শুনতে পাচ্ছেন ? আ, শুনতে পাচ্ছেন ?

যুবক আবার সেরকম গোঙানির শব্দ করল। শব্দটা এত করুণ, শুনলে যে কারও মায়া লাগবে।

যুবরাজ মনে মনে বলল, কেস তো খুবই খাতারনাক। সাউন্ড ইফেক্ট যা দিচ্ছে, এক্ষুনি ডাক্তার-ফাক্তার না দেখালে ফিনিশ হয়ে যাবে তো! যুবরাজ কি এই যুবককে এখন কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে ? নার্সিংহোম ? কিন্তু ব্যাপারটা সে সামলাবে কেমন করে! তার গলায় যুবকের চেন, পকেটে যুবকের টাকাভর্তি মানিব্যাগ, সঙ্গে যুবকের মোটর সাইকেল। যুবরাজ তো মনে মনে এতক্ষণ এইসব সম্পত্তির মালিক হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। তাহলে ? লোভ সামলে যুবরাজ কি এই যুবককে বাঁচাবে! নাকি নার্সিংহোমে কিংবা হাসপাতালে যুবককে পৌঁছে দিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে চম্পট দেবে! দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি বেশ মনে ধরল যুবরাজের। হ্যাঁ, এটা বেশ চকৎকার পরিকল্পনা। যুবককে বাঁচানোও হলো মালামাল সমেত চম্পট দেওয়াও হলো। সাবাস, সাবাস! নিজের বুদ্ধিমত্তায় খুবই মুগ্ধ হলো যুবরাজ। তারপর কাজে লেগে গেল। যুবককে অনবরত ধাক্কা দিতে লাগল। এই যে শুনছেন, আ! এই যে, এই!

যুবক কাতর গলায় গোঙিয়ে গোঙিয়ে বলল, আহ্, আমাকে আমাকে একটু...

যুবরাজ বুঝে গেল পানি চাইছে। জ্ঞান তাহলে ফিরেছে!

উৎসাহের গলায় যুবরাজ বলল, দাঁড়ান, পানি খাওয়াচ্ছি। তার আগে একটা কাজ করতে দিন।

দৌড়ে মোটর সাইকেলটার কাছে গেল যুবরাজ। তারপর দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে মোটর সাইকেল স্টার্ট দিল। সাঁ করে যুবকের কাছে চলে আসবে, তার আগে ঘাসের ওপর একটা শপিং ব্যাগ দেখতে পেল। ব্যাগভর্তি গোলাপ। অবহেলায় পড়ে আছে

www.shopnil.com

ব্যাগটি! দু একটা গোলাপ ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসে। দেখে সাবধানে জায়গাটা পেরুল যুবরাজ, ফুলগুলো যাতে নষ্ট না হয়। ফুল কি নষ্ট করার জিনিস!

যুবকের কাছে এসে মোটর সাইকেল দাঁড় করাল যুবরাজ। স্টার্ট বন্ধ করল না। তারপর দ্রুত নেমে যুবককে টেনে তুলল। একটু কষ্ট করুন, একটু।

যুবরাজকে জড়িয়ে ধরে কায়ক্লেশে উঠে দাঁড়াল যুবক। তারপর অতিকষ্টে, দুবারের চেষ্টায় মোটর সাইকেলে বসতে পারল। যুবককে একহাতে রেখেই নিজের পিঠ থেকে কায়দা করে ব্যাগটা খুলল যুবরাজ। তারপর সেই ব্যাগ ঝুলিয়ে দিল যুবকের পিঠে। নিজে দ্রুত মাথায় পরল হেলমেট। তারপর মোটর সাইকেলে চড়ল।

যুবককে বলল, শক্ত করে আমাকে ধরে রাখুন। আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

দুহাতে যুবরাজের পেট জড়িয়ে ধরল যুবক। আর যুবরাজ স্পিডে ছুটিয়ে দিল মোটর সাইকেল। একদম ফিলমি কায়দায়।

রাস্তার পাশে হঠাৎ করে গাড়ি থামাল মুনা। তার পাশে ছিল চুমকি। গাড়ি থামতেই মুনার মুখের দিকে তাকাল সে। চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করল না চুমকি। পেছনের সিটে বসেছিল জাহিদ, মন্টু আর গোগো। কারও মুখে কোনও কথা ছিল না। গাড়িতে চড়ে গোগো বোধহয় আবার ড্রাগস নিয়েছে। সে বসেছে ডানদিকে, দরজার সঙ্গে। বসে মাথাটা হেলিয়ে দিয়েছে সিটের পেছন দিকে। গাড়ি থামল, গোগো টের পেল না। কারণ গোগো তখন গভীর ঘুমে। আর গভীর ঘুমে থাকলে যা হয়, গোগো মনোযোগ দিয়ে নাক ডাকছিল সে।

জাহিদ বলল, কী রে মুনা, এখানে থামালি কেন?

প্ল্যানটা একটু পাল্টাব।

মন্টু বলল, কী রকম?

আমি তোদের সঙ্গে যেতে পারব না!

শুনে হা হা করে উঠল চুমকি। কেন? তুই তো সব প্ল্যান করেছিলি। এসাইনম্যান্ট শেষ হলে সোনারগাঁয়ে গিয়ে বসব আমরা। তুই আমাদের বিয়ার খাওয়াবি, ডিনার করাবি।

মুনা গম্ভীর গলায় বলল, খাওয়াব না তা তো বলিনি।

জাহিদ বলল, তাহলে?

ঘাড় ঘুরিয়ে জাহিদের দিকে তাকাল মুনা। তাহলে কী?

তুই যেতে না পারলে কী করে হবে?

আমি যেতে না পারলেও হবে।

কোন ফাঁকে নাক ডাকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গোগোর, কোন ফাঁকে ঘুম ভেঙে গেছে গাড়ির কেউ তা টের পায়নি। এখন গোগোর কথায় সবাই একটু চমকাল।

গোগো বলল, শিট।

তারপর একটু থেমে বলল, গো টু হেল। টাকা দিয়ে যা। আমরা সোনারগাঁ চিনি।

গোগোর কথা বলার ভঙ্গিতে মেজাজটা হঠাৎ করেই খুব খারাপ হয়ে উঠেছিল মুনার। ইচ্ছে হয়েছিল প্রথমে যা-তা বলে গালাগাল দেয় গোগোকে। তারপর নিজে নেমে গিয়ে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে, কলার ধরে টেনে-হেঁচড়ে বের করে গোগোকে, নাকে মুখে ধামাধাম মারে কয়েকটা ব্লো। নাক-মুখ ফাটিয়ে দেয়। যেমন করে গোগোরা খানিক আগে মেরেছে ওমরকে। নিজেকে কন্ট্রোল করল মুনা। তারপর অবাক হয়ে ভাবল, গোগোর ওপর এমন ক্রোধ হলো কেন আমার! গোগো তো সবসময় এমন করেই কথা বলে! ওর ভাষা তো এরকমই। রাফ। তাছাড়া আমিই তো ওদের বলেছি কাজটা হয়ে গেলে আমি তাদের সোনারগাঁয়ে খাওয়াব। তিনটে করে বিয়ার, তারপর ডিনার। ওদের দোষ কী! কাজটা তো ওরা করেছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই ফূর্তিটা করতে চাইবে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে গেল মুনা। নিজের অজান্তে কামড়ে ধরল নিচের ঠোঁট। কেন যে মুনার চোখে তখন ভেসে উঠল বনভূমির পাশের সেই মাঠটি। শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় সেই মাঠে উপুর হয়ে পড়ে আছে ওমর। দূরে দাঁড়ানো একটা মোটর সাইকেল। ওমর এবং মোটর সাইকেলের মাঝখানে সবুজ ঘাসের ওপর অবেহলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো লাল গোলাপ। একটি শপিংব্যাগ।

গোলাপগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ভেতরে ভেতরে ছটফট করে উঠল মুনা। পকেটে হাত দিয়ে একগাদা টাকা বের করল সে। তারপর টাকাগুলো গোগোর হাতে দিয়ে উতলা এবং বিষণ্ণতার মিশেল দেয়া গলায় বলল, আই য়্যাম সরি গোগো। এখুনি বাড়ি যেতে হবে আমাকে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আজ সন্ধ্যায় একটা পার্টিতে যেতে হবে আমাকে। আমার এক কাজিনের ম্যারেজ ডে। পাপা মামণি আমার জন্য ওয়েট করছে। আমি ফিরে গেলে একসঙ্গে বেরুবে। কথাটা তোদের বলতে মনে ছিল না আমার। আই য়্যাম সরি, রিয়েলি সরি।

মন্টু বলল, তার মানে প্রোগ্রামটা আজ...

কথাটা শেষ করতে দিল না মুনা। তবে মন্টুর দিকে তাকালও না। গোগোর দিকে তাকিয়ে বলল, কিছু মনে করিস না গোগো। আমি টাকা দিচ্ছি, তোরা সোনারগাঁয়ে যা।

টাকাটা হাতে নিয়ে গোগো বলল, তাহলে তুই আমাদেরকে সোনারগাঁয়ে নামিয়ে দিয়ে আয়।

কথাটা শুনে চমকে উঠল মুনা। না, আমি পারব না। আমার সময় নেই।

জাহিদ বলল, আরে কতটা আর সময় লাগবে!

চুমকি বলল, তুই না নামিয়ে দিয়ে এলে আমরা এখান থেকে যাব কেমন করে?

www.shopnil.com

চুমকির কথায় এতটা রাগ হলো মুনার, কথা বলতে পারল না। দাঁত কটমট করে, খর চোখে চুমকির দিকে তাকিয়ে রইল সে। মুনার এই চোখকে খুবই ভয় পায় চুমকি। কথাটা বলে যেন গুরুতর কোনও অপরাধ করে ফেলেছে সে সেই অপরাধ কাটাবার জন্য মুহূর্তে স্বর পাল্টাল চুমকি। গোগোদের দিকে তাকিয়ে বলল, মুনা তো বলল কাজ আছে ওর। খামোখা ওকে আটকে রেখে লাভ কী। টাকা তো দিয়েছেই। চল আমরা চলে যাই। এখান থেকে স্কুটারে চলে যাব।

কথাটা শুনে ভেতরে ভেতরে খুশি হলো মুনা। মনে মনে বলল, চুমকি আমার চোখকে তাহলে এখনও ভয় পাস তুই!

কিন্তু চুমকির কথা পছন্দ হয়নি কারও।

জাহিদ বলল, চারজন স্কুটারে যাবে কেমন করে?

চুমকি বলল, একজন ড্রাইভারের সঙ্গে বসলেই হবে।

মন্টু বলল, কে বসবে?

তোরা কেউ বসতে রাজি না হলে আমিই বসব।

চুমকির কথা শুনে এরকম অবস্থায় হাসি পেল মুনার। কিছু একটা বলতে ইচ্ছে হলো তার। তার আগেই দরজা খুলল গোগো।

চল, নাম। ফালতু বাকোয়াজ করে লাভ নেই।

গোগোর কথা অমান্য করার সাহস নেই কারও। গোগোর সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুজনও নেমে গেল গাড়ি থেকে। আড়চোখে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল মুনা।

চুমকি বলল, যাইরে মুনা!

মুনা মাথা নাড়ল। মুখে কোনও কথা বলল না। মনে মনে বলল, যা। এই শেষ যাওয়া। আমার গাড়িতে তোরা আর কখনও উঠতে পারছিস না। তোদের সঙ্গে আমি আর কোনও সম্পর্ক রাখব না। রাস্তাঘাটে দেখা হলেও মুখ ঘুরিয়ে চলে যাব। চিনব না। তোদের মতো মানুষের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। তোদের আমার চেনা হয়ে গেছে।

চুমকি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনা ফিসফিস করে বলল, দাঁড়াও, আসছি আমি। তুমি একদম ভয় পেয়ো না। এই তো আমি এলাম বলে। এসেই তোমার পাশে দাঁড়াব। যেটুকু অন্যায় আমি করেছি তারচে' হাজার হাজার গুণ বেশি ভালবাসা তোমাকে আমি দেব। এত ভালবাসা, তুমি ভাবতেও পারবে না। আমার কাছে তোমার ভালবাসা পাওয়ার আশাও অতদূর পৌঁছুবে না। পৃথিবীর কোনও প্রেমিক কখনও কোনও অবস্থাতেই তার প্রেমিকার কাছে এত ভালবাসা আশা করে না। করতে পারে না। আমি তোমাকে তেমন ভালবাসা দেব। আমার ভালবাসায় তুমি ভুলে যাবে আজকের যাবতীয় অপমানের কথা। এসবের কোনও কিছুই কোনওদিন তোমার আর মনে হবে না।

আমি আসছি। আসছি। তোমার কাছেই আসছি।

তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে পাগলের মতো গাড়ি ছুটিয়ে দিল মুনা।

রাস্তার দুপাশে তখনও জ্বলে ওঠেনি আলো। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। রাস্তাঘাটে তখন আস্তে ধীরে জমছে অন্ধকার। আলো জ্বলতে দেরি নেই। সা সা করে গাড়ি ছুটছে। শহরের দিকে যাচ্ছে কোনও কোনও গাড়ি। কোনও কোনওটা বেরিয়ে আসছে শহর থেকে। দুরন্ত স্পিড একেকটা গাড়ির। এইসব গাড়ির ফাঁক ফোকর দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে যুবরাজ। মোটর সাইকেলে খুব একটা স্পিড তোলেনি সে। কারণ যুবরাজের পেছনে বসে আছে ওমর। দুহাতে যুবরাজের কোমরের দিকটা আঁকড়ে ধরে আছে সে। মাথাটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে রাখা যুবরাজের পিঠে। ওমরের পিঠে আছে যুবরাজের ব্যাগ।

ওমরের জন্যই স্পিডে মোটর সাইকেল চালাতে পারছে না যুবরাজ। যেভাবে আলগোছে তার কোমর আঁকড়ে ধরে আছে ওমর, মাথা রেখেছে পিঠে, আর বেচারার যে অবস্থা, জ্ঞান পুরোপুরি আছে কি নেই কোনও মতেই বোঝা যাচ্ছে না, এই অবস্থায় স্পিডে মোটর সাইকেল চালানো মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। স্পিডে মোটর সাইকেল চালালে পেছন থেকে যখন তখন টুপ করে খসে যেতে পারে ওমর। কিংবা হঠাৎ ব্রেক কষতে হলে ফড়িংয়ের মতো ছিটকে রাস্তায় পড়ে যেতে পারে। এমনিতেই যে অবস্থা, তার ওপর যদি আবার ছিটকে পড়ে রাস্তায়, পটলটা পুরোপুরি তুলতে একদমই টাইম লাগবে না। এসব ভেবেই আস্তে ধীরে মোটর সাইকেল চালাচ্ছিল যুবরাজ। তার মাথায় তখন একই চিন্তা, ওমরকে নিয়ে সে কোথায় যাবে! কোন হাসপাতালে না প্রাইভেট নার্সিং হোমে! হাসপাতালে গেলে চিকিৎসাটা ভাল হবে না। এভারেজ রোগীদের মতো বিহেভ করবে ডাক্তাররা। ওষুধ দেবে কি দেবে না, স্টিচ লাগলে সেই স্টিচ দিতে সময় নেবে ম্যালা। নিচের ঠোঁটে স্টিচ তো ওমরের লাগবেই। ঠোঁটটা কেটে একদম ঝুলে পড়েছে। হাসপাতালে গেলে স্টিচ দেয়ার সময় গরু ছাগলের মতো চেপে ধরে কাজটা করবে ডাক্তাররা। একটুও মায়া-দয়া দেখাবে না। আর দেখাবেই বা কেন, কাজটা করে তো আর ক্যাশ মাল পাচ্ছে না তারা। সরকারি হাসপাতাল, সরকারি মাইনে। কাজ করলেও মাইনেটা পাবে, না করলেও পাবে। সুতরাং কাজটা তারা করবে কেন! বিনা শ্রমে মাইনে এলে শ্রম করে কোনও বাঙালি! না, ওমরকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে না যুবরাজ। প্রাইভেট কোনও নার্সিংহোমেই যাবে। মানিব্যাগে প্রচুর টাকা আছে ওমরের। ব্যাগটা তো যুবরাজের কাছেই। এই টাকায় বাপ বাপ করে হয়ে যাবে চিকিৎসা।

মানিব্যাগটার কথা ভেবে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল যুবরাজের। ইস্, এই টাকাটা আমি খরচা করে ফেলব! তাহলে আর আমার বাণিজ্য হলো কই! ওমরকে নিয়ে যে এই শ্রমটা দিচ্ছি এটার মূল্যটা কোত্থেকে আসবে পকেটে! কে দেবে! ছোটবেলায় রচনা বইতে 'শ্রমের মূল্য' নামে নাতিদীর্ঘ রচনা পড়েছি। তাতে স্বর্গীয়

www.shopnil.com

হরলাল রায় মহাশয় লিখেছিলেন 'যথার্থ শ্রমের মূল্য অবশ্যই দিতে হইবে।' তাহলে আমার এই শ্রমের মূল্যটা দেবে কে!

না, মানিব্যাগ থেকে একটি টাকাও ব্যয় করব না আমি, ওটা আমার শ্রমের মূল্য! নার্সিংহোমে গিয়েই ওমরের কাছ থেকে তাদের বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটা নেব আমি। ওমরের মা-বাবাকে টেলিফোন করব। তারপর আমার আর চিন্তা কী! মানিব্যাগে হাত দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। টাকা পয়সা যা লাগে ব্যয় করবে তো ওমরের মা-বাবা। ওমরের মানিব্যাগ দেখেই তো তার মা-বাবার টাকা পয়সার পরিমাণটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু নার্সিংহোমে গিয়ে টেলিফোন নাম্বার চাইলে দিতে পারবে তো ওমর! কথা বলার ক্ষমতা আছে তো! মোটর সাইকেলের স্পিড আর একটু কমিয়ে পেছনে বসা ওমরের উদ্দেশে যুবরাজ বলল, ভাইজান, শুনতে পাচ্ছেন! অ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন!

যুবরাজের পিছে মুখ রাখা অবস্থায়ই গোঙানির মতো একটু শব্দ করল ওমর। সেই শব্দে খুশি হয়ে গেল যুবরাজ। বলল, এখন আর কোনও চিন্তা নেই। আপনাকে এক্ষুনি নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি আমি। ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়। একটা রাত হয়তো নার্সিংহোমে থাকতে হবে আপনাকে। দু একটা স্টিচ লিচ লাগতে পারে। তবে কাল সকালেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন আপনি। শিওর।

ওমর কোনও কথা বলল না। ওমর কোনও সাড়া দিল না।

মুনা মনে মনে বলল, আমি এখন সোজা চলে যাব বনভূমির পাশের সেই পার্কটায়। সেখানে এখনও নিশ্চয় উপুর হয়ে পড়ে আছে ওমর! মন্টুরা তো বলল ঘণ্টা তিনেকের আগে সেনস আসবে না। তাহলে আমি গিয়ে ওমরকে ঠিক ওই অবস্থায়ই পাব। উপুর হয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পার্কের মাটিতে। মাটিতে যেখানে ওমরের মুখ গোঁজা সেখানে জমাট বেঁধে আছে কিছু রক্ত। ওমরের নাক মুখ থেকে পড়েছে মাটিতে। অনেকক্ষণ আগে পড়েছে বলে এতক্ষণে রক্তটা নিশ্চয় জমাট বেঁধে গেছে। নিশ্চয় রক্তের রঙ গেছে কালো হয়ে। তা যাক। ওমর যে বেঁচে আছে এটাই যথেষ্ট। এখন পার্কে গিয়ে যেমন করে পারি ওমরকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে তুলব আমি। তারপর ঘাসের ওপর থেকে কুড়িয়ে নেব সবগুলো গোলাপ। গোলাপগুলো তো আমার জন্যই এতদূর যত্ন বহন করে এনেছিল ওমর! সেই ফুল কেমন করে অমন খোলামেলা একটা পার্কে অবহেলায় ফেলে রেখে আসব আমি! কার জন্য ফেলে রেখে আসব? ফুলগুলো আমি রেখে দেব। যতদিন সম্ভব আমার বুকের কাছে রেখে দেব। ওই গোলাপের গন্ধে ওমরের কথা যখন-তখন মনে পড়বে আমার। গোলাপের গন্ধে যখন-তখন ওমরের গায়ের গন্ধ পাব আমি। রাতদুপুরেও মনে হবে এই তো ওমর আছে আমার সঙ্গে! আমার বুকের খুব কাছে।

তখুনি ওমরের মোটর সাইকেলটার কথা মনে পড়ল মুনার। ওমরকে নিজের গাড়িতে তুলে নেবে মুনা, ফুলগুলো নেবে, কিন্তু মোটর সাইকেলটা নেবে কেমন করে!

www.shopnil.com

ওরকম খোলামেলা একটা জায়গায় মোটর সাইকেলটা ফেলে রেখে এলে, অত দামি জিনিস, থাকবে না। কিছুতেই থাকবে না। চুরি হয়ে যাবে। তাহলে?

মুনা মনে মনে বলল, মোটর সাইকেল নিয়ে অতটা মাথা না ঘামালেও চলবে এখন। ওমরকে গাড়িতে বসিয়ে কাছে পিঠের কোনও দোকান থেকে ডেকে আনব একজন বা দুজন লোক। বিশ পঞ্চাশটা টাকা ধরিয়ে দেব তাদের হাতে। বলব, ভাই এই জিনিসটা আপনাদের কাছে থাকবে, কাল এসে নিয়ে যাব আমরা। নিয়ে যাওয়ার সময় আরও কিছু টাকা আপনাদেরকে দিয়ে যাব। বুঝতেই পারছেন কত বড় বিপদে আমরা পড়েছি।

হয়ে যাবে, টাকা খরচ করলে নিশ্চয় কোনও না কোনও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু ওমরকে দেখে লোকগুলো যদি প্রশ্ন করে, এমন হলো কেমন করে! কী জবাব দেবে মুনা!

জবাবের কথা ভাবতে ভাবতে বনভূমির পাশে পার্কটার কাছাকাছি চলে এল মুনা। চোখের সামনে জায়গাটা দেখেই মুহূর্তে মুনা ভুলে গেল লোকগুলোর প্রশ্নের কী জবাব ভেবে ছিল সে। চঞ্চল হয়ে গাড়ি থামাল সে। তারপর পাগলের মতো লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। যেন মুহূর্তকাল বিলম্ব করার অবকাশ নেই তার। মুহূর্তের বিলম্বে যেন ঘটে যাবে চরম কোনও বিপর্যয়। কিংবা বড় রকমের কোনও অঘটন!

তখন গাছপালার বনে বেশ গাঢ় হয়েছে অন্ধকার। পার্কের ঝোপঝাড়ে জমেছে থোকা থোকা অন্ধকার। কেবল ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে যে খোলা ঘাসের মাঠ সেসব জায়গায় এখনও ঠিক জমাট বাঁধতে পারেনি অন্ধকার। খোলামেলা জায়গায় অন্ধকার জমাট বাঁধতে দেরি হয়। যে কারণে লেকের জলেও জমাট বাঁধতে পারেনি অন্ধকার। দূর থেকেও পরিষ্কার দেখা যায় লেকের জল। স্বচ্ছ। সান্ধ্যকালীন মনোরম একটা হাওয়া বইছে চারদিকে। সেই হাওয়ায় বিমোহিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে লেকের জল। জল বয়ে যাওয়ার মৃদু একটা শব্দ দূর থেকেও পেল মুনা। কিন্তু খেয়াল করল না। তার যাবতীয় খেয়াল এখন ওমরকে ঘিরে। ওমরকে নিয়ে কেমন করে কী করবে মুনা সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। ওমরকে গাড়িতে তুলেই মুনা সোজা ছুটে যাবে কোনও প্রাইভেট নার্সিংহোমে। যত দ্রুত সম্ভব ওমরকে সারিয়ে তুলতে হবে তার। নইলে, নইলে ওমরের শোকে সেও বুঝি মরে যাবে। একদম মরে যাবে। হায়রে মেয়েমানুষ! কোন মুহূর্তে যে কী মনে হয় তাদের! মুহূর্তে মানুষের চরম শত্রু হতে পারে তারা। দংশাতে পারে কাল নাগিনীর মতো। আবার মুহূর্তেই পারে চরম বন্ধু কিংবা প্রেয়সী হতে। তখন দয়িতের জন্য জানও কবুল তাদের। নির্দ্বিধায় তখন প্রাণ দিয়ে দিতে পারে তারা। মুনার এখন সেই অবস্থা। ওমরের জন্য এই মুহূর্তে প্রাণও দিয়ে দিতে পারে সে। অবলীলায়।

কিন্তু পার্কটার মাঝামাঝি এসে বুকটা ধরাস করে উঠল মুনার। ওমর যেখানে পড়ে ছিল, জায়গাটা শূন্য। সেখানে কেউ নেই এখন। তারপরই ওমরের মোটর সাইকেলটা যেখানে ছিল সেদিকে তাকাল মুনা। মোটর সাইকেলটাও নেই। তাহলে

কি, তাহলে কি মুনারা চলে যাওয়ার পরপরই জ্ঞান ফিরেছিল ওমরের! জ্ঞান ফেরার ফলেই মোটর সাইকেল চালিয়ে ফিরে গেছে সে! কথাটা ভেবে মন ভালও হয়ে যাওয়ার কথা মুনার। কিন্তু হলো না। বরঞ্চ মনটা খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে গেল তার। ওমরকে পেলে, ওমরের শুশ্রূষা করে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্যটা আজই করা যেত। হলো না, সেটা হলো না। ওমরকে এখন কোথায় খুঁজবে মুনা! কেমন করে ওমরকে সে বলবে, আমার বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়তম, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আমি আসলে বুঝতে পারিনি, আমি আসলে বুঝতে পারিনি এমন করেও ভালবাসা হয়। এ একরকম ভালই হলো। তুমি আমার কাছে যা চেয়েছিলে একটা বেশ দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তা হয়ে গেল। এই ছিল আমাদের নিয়তি। নিয়তি কেমন করে এড়াব আমরা!

কিন্তু তারপরও কান্নায় চোখ দুটো ফেটে যেতে চাইল মুনার। কান্নাটা মুনা চেপে রাখল। তারপর পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল যেখানে গোলাপগুলো পড়েছিল সেই জায়গাটায়। গোলাপগুলো এখনও তেমনি পড়ে আছে। অবহেলায়। যেমন পড়েছিল তেমনি। কিছু পড়ে আছে ঘাসের ওপর আর কিছু রয়ে গেছে শপিং ব্যাগটার ভেতর। সান্ধ্যকালীন হাওয়ায় গোলাপের গন্ধে ম-ম করছিল জায়গাটা। সেই গন্ধে মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল মুনার। চোখ ফেটে আবার এল কান্না। কান্না চেপে উপুর হয়ে ফুল কুড়াতে লাগল মুনা। কুড়িয়ে শপিং ব্যাগে নিল না। নিল সাদা টপসের ছোট্ট আঁচলে। শপিং ব্যাগের ভেতর যে ফুলগুলো ছিল সেগুলোও নিল একই জায়গায়।

তারপর মুনা এসে দাঁড়াল সেই জায়গাটায়, যেখানে মার খেয়ে লাশ হয়ে পড়েছিল ওমর। উপুর হয়ে পড়েছিল। যেখানে সবুজ ঘাসের ওপর এখনও জমাট বেঁধে আছে ওমরের নাক মুখ দিয়ে পরা রক্ত। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে জমাট রক্তটা তীব্র কালো দেখায়। কেন যে রক্তটার দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর গভীরতম এক দুঃখে বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল মুনার! চোখ ফেটে যেতে চাইল গভীর গোপন এক কান্নায়!

হাঁটু ভেঙে ওমরের রক্তটার সামনে বসে পড়ল মুনা। বাঁ-হাতে টপসের নিচের দিকটা আঁচলের মতো করে ধরা। সেই আঁচলে ওমরের আনা গোলাপগুলো। ডানহাতটা ঘাসের ওপর জমাট হয়ে থাকা ওমরের রক্তের ওপর রাখল মুনা। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কান্নায় আকুল হয়ে গেল সে। কোত্থেকে যে এল এত কান্না! মুনা কিছুই বুঝতে পারল না। ওমরের রক্ত ছুঁয়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগল মুনা। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে, বনভূমির পাশে নির্জন পার্কে আকুল হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কান্নাটা কেঁদে নিচ্ছে এক যুবতী। যুবতীর সেই কান্না কেউ দেখে না। কেউ শোনে না। কেউ জানেও না, কেন, কী দুঃখে অমন আকুল হয়ে কাঁদছে সে! জানে কেবল বনভূমি, জানে কেবল পার্কের সবুজ ঘাস আর ঝোপঝাড়। আর জানে অদূরের ওই লেক। লেকের স্বচ্ছতোয়া জল। ভালবাসার দুঃখে কাঁদছে মুনা। মুনার এ কান্না বড় সুন্দর। মুনার এ কান্না বড় পবিত্র। কাঁদুক, যতক্ষণ ইচ্ছে কাঁদুক মুনা।

www.shopnil.com

ডাক্তার বললেন, কী হয়েছে?

নার্সিংহোমের অফিস রুমে সোফায় হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে ওমর। চোখ দুটো বোজা। অফিস রুমের তীব্র আলোয় মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে তার। কপাল, চোখের নিচ চোয়াল বিভিন্ন জায়গা ফুলে আলু হয়ে গেছে। নিচের ঠোঁটটা কেটে বেশ অনেকখানি ঝুলে পড়েছে। সেখানে জমাট বেঁধে আছে রক্ত। বাঁ চোখের একটা দিক এমন ফুলেছে, চোখটাই দেখা যাচ্ছে না ওমরের। ফুলে ঢাকা পড়ে গেছে। আর অন্য চোখটা এমনিতেই বন্ধ করে রেখেছে ওমর। সোফায় হাত পা ছড়িয়ে বসে শ্বাস টানছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে। ওমরের জামা-কাপড়ের অবস্থা যাচ্ছেতাই। ধুলোবালি এবং ভেজা মাটিতে লেপটা-লেপটি হয়ে আছে। বুকের কাছে দু তিনটি জায়গায় রক্তের ছোপ।

সব দেখে ডাক্তার আবার বললেন, কী হয়েছে?

সাদা ড্রেস পরা একটি যুবতী নার্স তখুনি এসে ঢুকল অফিস রুমে। ঢুকে আপাদমস্তক দেখল সোফায় বসে থাকা ওমরকে। সেই ফাঁকে চোখের কোনা দিয়ে খুবই চালাকির চোখে দেখল যুবরাজকে। তারপর চাবি ঘুরিয়ে অফিস রুমের এক পাশে রাখা স্টিলের ফাইল কেবিনেটটা খুলল। যুবরাজ লক্ষ করল ফাইল কেবিনেটটা খোলার ফাঁকে চোরা চোখে একবার ডাক্তারের দিকে তাকাল নার্স। ডাক্তারও তাকালেন। মুহূর্তের জন্য দুজনের ঠোঁটেই ফুটে উঠল গোপন একটা হাসি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অন্য লোকের সামনে এ রকম হাসি হাসতে পারে না লোকে। হাসি দেখেই বোঝা যায় মানুষ দুটির মধ্যে আছে গোপন কোনও সম্পর্ক। আছে গোপন কোনও দেয়া নেয়ার ব্যাপার! কী, সেটা কী? যুবরাজ কিন্তু দুজনের হাসিই দেখতে পেয়েছিল এবং যা বোঝার বুঝে গিয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যুবরাজের কিছু ইয়ার্কি মারার স্বভাব আছে। পরস্পরকে ডিস্টার্ব করার স্বভাব আছে। ডাক্তার এবং নার্সের গোপন হাসাহাসির ব্যাপারটা দেখে স্বভাবটা মুহূর্তের জন্য জাগা দিয়ে উঠল যুবরাজের। তরুণ ডাক্তারটিকে একদমই পাত্তা না দিয়ে, নার্সটির দিকে তাকিয়ে যুবরাজ খুবই পরিচিত গলায় বলল, হ্যালো!

সঙ্গে এমন একটা হাসি, সেই হাসি দেখেই ফাইল কেবিনেট খুলে কী একটা দরকারি ফাইল খুঁজতে খুঁজতে হাত থেমে গেল নার্সটির। সামান্য ভড়কেও গেল সে। তারপর থতমত খেয়ে সেও বলল, হ্যালো!

এবার নার্সটির দিকে সামান্য এগিয়ে গেল যুবরাজ, আঙুল তুলে খুবই স্মার্ট ভঙ্গিতে বলল, আপনাকে আমার এত চেনা লাগছে কেন বলুন তো! কোথায় দেখেছি আপনাকে! কোথায় বলুন তো!

নার্সটি পিনপিনে গলায় বলল, কী জানি!

ডাক্তার বললেন, এখানেই হয়তো দেখেছেন।

যুবরাজ চিন্তিত মুখে বলল, না না, এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে আজকের আগে কখনও আসা হয়নি আমার। দেখেছি অন্য কোথাও। বেশ অনেকবারই দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। মুখটা খুবই চেনা আমার!

নার্স বলল, কী জানি, আমি তো আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

এবার কেলানো একটা হাসি হাসল যুবরাজ। আপনার মতো সুন্দরী যুবতী আমার মতো সামান্য একজন যুবককে কোথাও দেখে থাকলেই কি আপনার আর তা মনে থাকবে, না মনে পড়বে!

নার্সটি এমন কোনও সুন্দরী নয়। গায়ের রঙ ফর্সা, মোটামুটি চলনসই চেহারা ফিগার। রাস্তাঘাটে এ রকম মেয়ে অনেক দেখা যায়। আসলে মেয়েটিকে খুশি করার জন্য কথাটা বলেনি যুবরাজ, কিংবা পটাবার জন্যও নয়। উদ্দেশ্য একটাই ছিল তার, ডাক্তার নার্সের গোপন হাসা-হাসিটাকে যতটা পারে ডিস্টার্ব করবে।

যুবরাজ সেটা করতে পেরেছে। এখন ওসব নিয়ে তার আর কোনও মাথাব্যথা নেই। যেটুকু করার তা সে করতে পেরেছে। এবার যুবরাজ তাকাল সোফায় বসে থাকা ওমরের দিকে।

তখন ডাক্তার আবার বললেন, কী হয়েছে?

নার্সটি ঠিক সেই মুহূর্তেই গটগট করে বেরিয়ে গেল, যুবরাজ তাকিয়েও দেখল না। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে তৈরি করল সে বেশ রোমাঞ্চকর একটা গল্প। আর বলবেন না ভাই, হাইজ্যাকাররা ধরেছিল।

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন ডাক্তার। অ্যাঁ, বলেন কী!

হ্যাঁ। দেখছেন অবস্থাটা কি করেছে! সঙ্গে যা ছিল সব তো নিয়েছেই, তার ওপর চার পাঁচজনে মিলে এমন মার মেরেছে, মেরে অজ্ঞান করে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখেছিল। যেন ট্রাক-ফ্রাক এসে পিষে দিয়ে যায়। কী রকম ভয়ঙ্কর এটিচুড বলুন তো! আরে হাইজ্যাক করেছিস কর, মারার দরকার কী! আর মেরেছিসই যখন, তখন আবার রাস্তার মাঝখানে অমন করে ফেলে রাখলি কেন! যদি সত্যি সত্যি কোনও ট্রাক এসে পিষে ফেলত! অবস্থাটা কী হতো তাহলে? ভাগ্যিস তার আগেই মোটর সাইকেল চালিয়ে আসছিলাম আমি। রাস্তার ওপর একটা লোককে অমন করে পড়ে থাকতে দেখে মোটর সাইকেল থামিয়েছি আমি। থামিয়ে হর্ন দিলাম, ডাকাডাকি করলাম, না, সাড়া নেই, উপুর হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে একটা মানুষ। দৃশ্যটা কেমন লাগে বলুন তো! বুঝলেন, তারপর মোটর সাইকেল থেকে নেমেছি আমি। নেমে টেনে তুলেছি। তোলার পর দেখি আরে এ যে আমার, এ যে আমার ইউনিভার্সিটি লাইফের বন্ধু। তখন জ্ঞান নেই, বুঝলেন? রাস্তার পাশে টেনে নিয়ে পাবলিকের সাহায্যে চোখে মুখে পানি টানি দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম, তখুনি ঘটনাটা বলল সে। ঠিকঠাক মতো বলতে কি আর পারে! টেনে টেনে, অতিশয় কায়ক্লেশে বলল আর কি!

ডাক্তার বললেন, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! এর বাসায়...

না না, এখনও খবর দেয়া হয়নি। বিরাট বড়লোকের ছেলে বুঝলেন না, খবর পেলে দেখবেন তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাবে। লোকজনে নার্সিংহোম ভরে যাবে আপনাদের।

ডাক্তার তখন ওমরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওমরের মুখটা। ডাক্তারের মুখে সামান্য চিন্তার ছাপ। যুবরাজ বলল, সিরিয়াস কিছু?

না, তেমন সিরিয়াস নয়। তবে মারটা ব্যাটারা মেরেছে বড় জবর। চোখটা সারতে একটু সময় নেবে। আর নিচের ঠোঁটটায় স্টিচ লাগবে। আমি ব্যবস্থা করছি। কিন্তু প্যাসেন্ট কি এখানেই থাকবে না বাড়ি নিয়ে যাবেন?

যুবরাজ চিন্তিত গলায় বলল, আপনি যা সাজেস্ট করবেন তাই হবে। আমাদের দিক থেকে কোনও অসুবিধা নেই। ইটস আপটু ইউ স্যার।

তাহলে দুতিনটে দিন এখানেই থাক। ট্রিটম্যান্টটা ভালো হবে।

ও কে। তাহলে একটা কেবিন টেবিনের...।

এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি।

ডাক্তার ব্যস্ত ভঙ্গিতে কলিংবেল বাজালেন।

যুবরাজ তখন ওমরের মানিব্যাগ বের করে চিন্তিত মুখে ঘাঁটছে। বাসার টেলিফোন নাম্বারটা তার দরকার। গার্জিয়ানরা কেউ না আসা অব্দি তো ছুটি নেই যুবরাজের। খাতারনাক একখানা অবস্থায় পতিত হয়েছে সে।

কিন্তু নিজের বাসার টেলিফোন নাম্বার কি নিজের মানিব্যাগে রাখে কেউ!

ওমরের মানিব্যাগের ছোট্ট একটা টেলিফোন ইনডেক্স ছিল। ব্যস্ত হয়ে সেটা ঘাঁটতে লাগল যুবরাজ। তখুনি বুদ্ধিটা মাথায় এল তার। ইনডেক্সে লেখা যে কোনও একটা নাম্বারে টেলিফোন করে ওমরদের বাসার নাম্বারটা চাইলেই তো হয়, কেউ না কেউ তো নাম্বারটা দেবেই!

সাবাস যুবরাজ, সাবাস! নিজের বুদ্ধিমত্তায় খুবই খুশি হয়ে নিজেকে দুবার সাবাস দিল যুবরাজ। তারপর ডাক্তারের দিকে তাকাল। টেলিফোন করা যাবে?

ওয়ার্ড বয় ধরনের সাদা পোশাক পরা দুজন লোকের সঙ্গে তখন কথা বলছিলেন ডাক্তার। ষোল নাম্বার রুম! তার মানে ফার্স্ট ফ্লোর। ঠিক আছে নিয়ে যাও। আর সাবিহা সিস্টারকে পাঠাও। বল আমি ডেকেছি। প্যাশেন্টের ব্যাপারে তাকে কিছু কথা বলে দিতে হবে।

কথা শেষ করে যুবরাজের দিকে তাকালেন ডাক্তার। মুখটা সামান্য হাসি হাসি তার। তখন কথাটা আবার রিপিট করল যুবরাজ। টেলিফোন করা যাবে?

শিওর।

টেবিলের ওপরই ছিল টেলিফোনটা। যুবরাজের হাতের কাছে। তবুও টেলিফোনটা খানিক এগিয়ে দিলেন ডাক্তার। ভদ্রতা।

ডাক্তারের টেবিলের দু পাশেই সোফা পাতা। এক পাশের সোফায় আগের মতোই বসে আছে ওমর। চোখ বোজা। ঘাড়টা কাত হয়ে আছে একদিকে। ভঙ্গি দেখে ঘুমন্ত লোক বলে মনে হচ্ছে তাকে।

ওমর কি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল?

www.shopnil.com

বাহার নামের কোনও একজনের নাম্বারে তখন ডায়াল করছিল যুবরাজ। সেই ফাঁকে ডাক্তারকে বলল, স্টিচ লাগবে বললেন!

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ। কেবিনে নিয়েই করব সব। কিছু ইনজেকশান ফিনজেকশানও আছে। এক্ষুনি হয়ে যাবে। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। নার্ভাস হবেন না। ব্যাপারটা মোটেই সিরিয়াস কিছু নয়।

যুবরাজ খুশি হয়ে বলল, ওকে, ওকে।

প্রথমবার রিং হলো না। দ্বিতীয় বার ডায়াল করবে যুবরাজ, তখুনি মনে পড়ল, টেলিফোন করে বাহার নামের লোকটিকে কিংবা যুবকটিকে কী বলবে সে! কার বাসার নাম্বার চাইবে! এতদূর বহন করে আনা আহত যুবকটির নামই তো এখনও জানা হয় নি তার। নিজের ওপর খুবই বিরক্ত হলো সে। হাতে ধরা টেলিফোন ইনডেক্সটা ম্যানিব্যাগে ভরে রাখল যুবরাজ। তারপর চিন্তিত ভঙ্গিতে বসে রইল।

কী করা যায়, কী করা যায়! তারপরই মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল তার। আরে ওই যুবককে গিয়ে বললেই তো সে তার নাম বলবে এবং বাসার টেলিফোন নাম্বার দেবে। এই সামান্য বুদ্ধিটাই এতক্ষণ মাথায় আসেনি তার! ছিঃ ছিঃ। যুবরাজ সাহেব, আপনার শালা এনটেনা দেখি ঠিকঠাক কাজ করছে না আজকাল! কনডম হয়ে যাচ্ছেন। দুয়ো। তাছাড়া মোটর সাইকেল চালিয়ে আসার সময়ই না আপনি ভাবলেন নার্সিংহোমে এসেই ওমরের কাছ থেকে তাদের বাসায় টেলিফোন নাম্বারটা জেনে নেবেন। কথাটা আপনি ভুললেন কী করে! দুয়ো, আপনি শালা বাতিল হয়ে গেছেন।

নিজেকে গালাগাল করে দ্রুত উঠে দাঁড়াল যুবরাজ। তারপর ওমরের পাশে গিয়ে বসল। আস্তে করে ধাক্কা দিল ওমরকে। অফিস রুমের ভেতরটা একবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে বলল, এই ভাই, শুনছেন!

ওমর একটু নড়েচড়ে উঠল। ঘাড়টা সোজা করল। তারপর কেবল ডান চোখটা খুলতে পারল সে।

আরেকবার চারদিক তাকিয়ে যুবরাজ খুবই আস্তে বলল, আপনার নামটা এখনও...

ওমর টেনে টেনে, ক্লান্ত গলায় বলল, ওমর।

বাসার টেলিফোন নাম্বারটা একটু দেবেন। আপনার বাসায় খবরটা দেয়া উচিত না! আমি আর কতক্ষণ থাকব! কাজ আছে না আমার! যেতে হবে না!

যুবরাজের কথা শুনে খোলা চোখটা আবার বন্ধ করল ওমর। ভেঙে ভেঙে টেলিফোন নাম্বারটা বলল। একবার মাত্র। তাতেই নাম্বারটা মুখস্থ হয়ে গেল যুবরাজের।

টেলিফোন নাম্বারের ব্যাপারে এই একটা গুণ আছে যুবরাজের। ইচ্ছে করলে একবার শুনে যে কোনও নাম্বার মুখস্ত করে ফেলতে পারে সে। তবে সবক্ষেত্রে কাজটা করে না সে। খুব প্রয়োজন হলে করে।

ওমরের নাম্বারটা একবার মাত্র শুনে মুখস্থ করে নিল যুবরাজ। তারপর দ্রুত ছুটে গেল টেলিফোনটার দিকে।

টেলিফোন ধরে মা বললেন, কী হয়েছে?

পর মুহূর্তেই চেহারাটা উদভ্রান্তের মতো হয়ে গেল তাঁর। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন তিনি। ওমর অ্যাকসিডেন্ট করেছে? কোথায়, কীভাবে! হায় হায়!

সোফায় বসে সিগ্রেট টানছিলেন বাবা। বাইরে বেরুবার পোশাক পরে আছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। কিন্তু বেরুনো হয়নি তাঁর। বহুকাল বাদে হঠাৎ করেই স্ত্রী খানিকটা আবেগী হয়ে উঠেছিলেন। ওমর সম্পর্কে পাগলের মতো দু একটা কথা বললেন। তারপর অদ্ভুত একটা আবদার করলেন। তোমার আজ বাইরে বেরুবার দরকার নেই।

বাবা আর বেরোননি। পাশাপাশি সোফায় বসে সংসার জীবনের টুকটাক গল্প করছিলেন মার সঙ্গে। সিগ্রেট খাচ্ছিলেন। তখুনি টেলিফোনটা এল।

ওমরের অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন বাবা। ছুটে গিয়ে টেলিফোনটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন মার হাত থেকে। হ্যালো, হ্যালো কোথায় অ্যাকসিডেন্ট করল? অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, মোটর সাইকেল, আচ্ছা আচ্ছা। কোন নার্সিংহোম বললেন? এক্ষুনি আসছি। এক্ষুনি। খুব সিরিয়াস?

রিখু ছিল বারান্দায়। টেলিফোনে মা এবং পরে বাবার সব কথাই শুনতে পেয়েছিল সে। দৌড়ে মা-বাবার রুমে এসে ঢুকল রিখু। কোথায় অ্যাকসিডেন্ট করল?

মার মুখে তখন বিশাল উদভ্রান্তি, বিশাল দুশ্চিন্তার ছায়া। মুখটা নিউজপ্রিন্টের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখে খুবই অসহায় একটা দৃষ্টি।

রিখুর দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় মা বললেন, আমি বললাম না, আমি তোদের বললাম না, আমার মনের ভেতরটা হঠাৎই কেমন করে উঠল। অ্যাঁ! বললাম না, খুবই কাতর গলায় মা মা করে ওমর আমায় ডাকছে। বললাম না! আমার কথা তো তোরা বিশ্বেস করলি না। আরে আমি তো মা। আমি তো সব টের পাই। সন্তানের অমঙ্গল হলে আমি তা টের পাব না!

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ফুক ফুক করে দুবার সিগ্রেট টান দিলেন বাবা। চল, চল। দেরি করো না।

রিখু, তুইও চল।

তারপর চিৎকার করে ড্রাইভারকে ডাকলেন বাবা। ড্রাইভার, ড্রাইভার!

ডাক্তারের সঙ্গে গোপনে হাসাহাসি করা নার্সটির নাম সাবিহা। ওমরকে দেখা-শোনার ভার পড়েছে সাবিহার ওপরই। নার্স হিসেবে মেয়েটি বেশ ভালও। চটপটে স্বভাবের এবং দ্রুত সব কাজ করতে পারে।

www.shopnil.com

ওমরের নিচের ঠোঁটে স্টিচ দেয়ার সময় ডাক্তারের এসিস্টান্ট হিসেবে বেশ ভাল সার্ভিস দিচ্ছিল সাবিহা। ষোল নম্বর রুমে তখন ডাক্তার সাবিহা আর যুবরাজ। ওমর তো আছেই। চিত হয়ে বেডে শুয়ে আছে সে। একটা চোখ তো এমনিতেই বন্ধ হয়ে আছে, বাকি চোখটাও বন্ধ করে রেখেছিল ওমর।

রুমে আসার পর পরই, ওমর বেডে শোয়ার পর পরই মার খাওয়া থেতলে যাওয়া জায়গাগুলো এন্টিসেপটিক ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে, যত্ন করে পরিষ্কার করেছে সাবিহা। দুটি জায়গায় কী একটা টিউব থেকে মলম বের করে লাগিয়ে তারপর মলমের ওপর তুলো বসিয়ে তার ওপর সেঁটে দিয়েছে টেপ। বেশ দ্রুত, চটপটে হাতে কাজগুলো করেছিল সাবিহা। দরজায় দাঁড়িয়ে সাবিহার কর্মতৎপরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছে যুবরাজ। বাহ্, বেশ তো কাজের মেয়ে! আর কাজ করার সময় অন্য কোনও দিকে মনোযোগও দেয় না। কোনওদিকে তাকায়ও না। ভাল, ভাল।

খানিক আগে ডাক্তারের সঙ্গে গোপনে হাসাহাসি করতে দেখে সাবিহার ওপর যেটুকু রাগ হয়েছিল যুবরাজের, মুহূর্তে কেটে গেল সেটা। হাসি হাসি মুখে যুবরাজ একটা সিগ্রেট ধরাল।

যুবরাজের ব্রান্ড ক্যাপস্টান। তাও পুরো প্যাকেট সিগ্রেট কখনও কিনতে পারে না সে। একটা দুটো কেনে। কিনে বুকপকেটে রেখে দেয়। এবং পকেটে রাখার ফলে বেশিরভাগ সময়ই সিগ্রেটটা থাকে চেপ্টে। তখনকার সিগ্রেটটাও চেপ্টে ছিল।

বুকপকেট থেকে সিগ্রেটটা বের করে বেশ খানিকটা সময় ধরে যত্ন করে আঙুল টিপে টিপে চেপ্টে যাওয়া সিগ্রেটটাকে সত্যিকারের সিগ্রেটে রূপান্তরিত করল যুবরাজ। ম্যাচ একটা পকেটে তার থাকেই। সিগ্রেট লোকের কাছে চেয়ে খায় যুবরাজ, কিন্তু ম্যাচ কখনও চায় না। এটা তার স্বভাব। তবে স্বভাবটা সাধারণ লোকের স্বভাবের মতো নয়। লোকের পকেটে সিগ্রেট সাধারণত থাকে কিন্তু ম্যাচ থাকে না। ঠোঁটে সিগ্রেট গুঁজে এর ওর কাছে ম্যাচ চায় বেশিরভাগ সিগ্রেটখোর লোক।

যুবরাজ তার উল্টো। যুবরাজের কাছে সিগ্রেট থাকে না। ম্যাচ থাকে। ঠোঁটে সিগ্রেট গুঁজে লোকে এর ওর কাছে ম্যাচ চায় আর যুবরাজ হাতে ম্যাচ রেখে এর ওর কাছে সিগ্রেট চায়। ভাবটা এরকম, আগুনটা ছিল ভাই, সিগ্রেটটা নেই। সিগ্রেটটা দিন। দুটো জিনিস তো আর একসঙ্গে লোকের কাছে চাওয়া যায় না! এ জন্যে ম্যাচটা যুবরাজ কিনে রাখে। তবে যখন সিগ্রেটের মক্কেল একেবারেই পাওয়া যায় না, তখন একটা দুটো ক্যাপস্টান কিনে বুকপকেটে রাখে যুবরাজ। আজও রেখেছিল। দুটো। একটা রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়েছিল। আর একটা ষোল নম্বর রুমে দাঁড়িয়ে যখন ধরিয়েছে তখুনি ডাক্তার এসে ঢুকলেন রুমে। তার পিছু পিছু ট্রলি ঠেলে ঠেলে ঢুকল আর একজন নার্স। ট্রলিতে স্টিচ ইত্যাদি দেয়ার যন্ত্রপাতি। ট্রলিটা ওমরের বেডের সামনে রেখেই এটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়াল নতুন নার্সটা। সাবিহা ততক্ষণে তার হাতের কাজ সেরে ফেলেছে। ওমরের মার খাওয়া মুখটা মোটামুটি একটা পরিচ্ছন্নতার মধ্যে নিয়ে এসেছে সাবিহা। এবার স্টিচ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো

তিনজন মানুষ। তাদের অদূরে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানতে টানতে কর্মকাণ্ডটা দেখতে লাগল যুবরাজ। তার পিঠে এখন সেই ব্যাগ, একহাতে কোলের কাছে ধরা ওমরের হেলমেটটা। দুটো জিনিস যে বোঝার মতো সঙ্গে রয়েছে যুবরাজের তা একদম মনে নেই।

ওমরের ঠোঁটে স্টিচ লাগল তিনটি। ডাক্তার অতিশয় যত্নে স্টিচ দিলেন। ওমরের মাথাটা তখন ধরে রেখেছিল সাবিহা নার্স। এটেনশানের ভঙ্গিতে খানিক দাঁড়িয়ে থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিল অন্য নার্সটি।

স্টিচ দেয়ার সময় ওমর কিন্তু একটাও কথা বলল না। একটুও শব্দ করল না।

স্টিচ দেয়া তো আর চারটিখানি ব্যাপার নয়, বেশ ব্যথা লাগার কথা। সেই ব্যথার চোটে চিৎকার না করুক সামান্য উ আ হলেও তো করে লোকে!

না, ওমর কিছুই করল না। যেমন চোখ বুজে পড়েছিল তেমনি পড়ে রইল। সামান্য নড়াচড়াও করল না। যদিও নড়াচড়া যাতে না করতে পারে, ডাক্তারের কাজে যাতে ডিস্টার্ব না হয় সেই জন্য সাবিহা সিস্টার মাথাটা ধরে রেখেছিল ওমরের।

ব্যাপারটা দেখে খুবই অবাক হলো যুবরাজ। আশ্চর্য ছেলে তো! গরুর মতো চেপে ধরে ঠোঁটে তিন তিনটে সেলাই দেয়া হলো অথচ একটুও শব্দ করল না! যুবরাজ হলে তো চিৎকার করে, দাপড়িয়ে অস্থির করে ফেলত ডাক্তার এবং নার্সকে। কমপক্ষে চারজন লোক লাগত যুবরাজকে জাপটে ধরে রাখতে!

ওসবের কিছুই লাগল না ওমরের। আশ্চর্য রকমের শক্ত নার্ভের ছেলে তো!

স্টিচ দেয়া শেষ করে খুবই পরিতৃপ্ত মুখে যুবরাজের দিকে তাকালেন ডাক্তার। আপনার বন্ধুটি বেশ শক্ত নার্ভের ছেলে। স্টিচ দেয়ার সময় উ আ করে না, নড়াচড়া করে না এমন লোক আমি আমার ডাক্তারি জীবনে দেখিনি। যদিও আমার ডাক্তারি জীবন খুব একটা বেশি দিনের নয়। বছর চারেকের। তবুও। চার বছর নেহায়েত কম সময় নয়। চার বছরে কমপক্ষে শ চারেক স্টিচ দিয়েছি আমি।

ডাক্তারের কথা শেষ হতেই কথা বলল সাবিহা। আমারও খুব অবাক লাগছে। এরকম কেস আমিও কখনও দেখিনি।

সঙ্গে সঙ্গে সাবিহার দিকে চোখ তুলে তাকাল ডাক্তার। চোখে চোখে কী রকম একটা ব্যাপার যেন হলো তাদের। ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না যুবরাজ। তবে কনফার্ম হয়ে গেল গভীর গোপন একটি সম্পর্ক এই মানুষ দুটির মধ্যে অবশ্যই রয়েছে।

যুবরাজের আরেকবার ইচ্ছে করল ফালতু কিছু চাপা মেরে সাবিহাকে আবার ভড়কে দেয়। যেমন, এই তো মনে পড়ছে আমার, কোথায় দেখেছি আপনাকে! মহিলা সমিতিতে আমার বয়সী এক যুবকের সঙ্গে নাটক দেখতে গিয়েছিলেন আপনি। হল থেকে বেরুবার সময় শক্ত করে যুবকটির হাত ধরে রেখেছিলেন। আচ্ছা সিস্টার, যুবকটি কি আপনার হাজব্যান্ড না ফিয়াসে! ড্যাম স্মার্ট, ড্যাম হ্যান্ডসাম দেখতে। সত্যি আপনার রুচির প্রশংসা না করে পারছি না।

www.shopnil.com

কিন্তু কথাগুলো বলল না যুবরাজ। ভেতরে ভেতরে যুবরাজের তখন অন্য চিন্তা। ওমরের সঙ্গে এখনও তার কোনও কথা হয়নি। সে কে, কেমন করে ওমরকে সে এখানে নিয়ে এল! ওমরের ব্যাপারে বানিয়ে একটা গল্প সে ডাক্তারকে বলেছে। বলেছে ওমরকে হাইজ্যাকাররা ধরেছিল। ধরে সব জিনিসপত্র নিয়ে, মেরে অজ্ঞান করে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখেছিল, যাতে ট্রাক চাপা দেয়। মোটর সাইকেল নিয়ে যুবরাজ আসছিল ওই পথ দিয়ে। ওমরকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে সে ওমরকে তুলে নার্সিংহোমে নিয়ে আসে। তারপর ওমরের কাছ থেকে ওমরের নাম এবং বাড়ির টেলিফোন নাম্বার নিয়ে বাড়িতে টেলিফোন করে জানিয়েছে ওমর অ্যাকসিডেন্ট করেছে। ওমরের মা-বাবা এলেন বলে।

কিন্তু মুশকিল হলো গল্প তো গেছে দুটো হয়ে। ডাক্তারের কাছে একটা আর মা বাবার কাছে আরেকটা! দু দল মুখোমুখি হলেই তো ঘাপলা লেগে যাবে আর মুখোমুখি তো তাঁরা হবেনই। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি! ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে যুবরাজ না আবার ফেঁসে যায়! ফেঁসে যাওয়ার চান্সও তো আছে। যুবরাজের হাতে ওমরের হেলমেট, গলায় ওমরের চেন, পকেটে ওমরের মানিব্যাগ, নার্সিংহোমের লনে ওমরের মোটর সাইকেল!

যুবরাজ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে এখন কী করবে! ওমরের মা-বাবা এসে পৌঁছুবার আগেই কি চুপচাপ মোটর সাইকেলটা নিয়ে কেটে পড়বে! ওমরকে তো সে সেভ করেছে। ওমরের মা-বাবাকেও টেলিফোনে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁরা এলেন বলে। এখন তো আর ওমরের কোনও প্রবলেম নেই। কিন্তু আসলে কী হয়েছিল ওমরের, কারা ওভাবে মেরে পার্কে ফেলে রেখে গেল তাকে, ঘটনাটা কি জানবে না যুবরাজ! যেহেতু একটা ব্যাপারের সঙ্গে আপছে জড়িয়ে পড়েছে সে, আপছে কেটে না পড়ে মূল ঘটনাটা জেনেই যাক। যুবরাজ সিদ্ধান্ত নিল, না, চোরের মতো পালাব না আমি। ওমরের সঙ্গে কথা বলে মূল ঘটনাটা আমাকে জানতে হবে। কারা ওভাবে মেরে ফেলে রেখেছিল ওমরকে! কেন মেরেছিল! আর ওমর তো জানে তাকে সেভ করে নার্সিংহোম অব্দি নিয়ে এসেছি আমি, নিশ্চয় আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে সে। নিশ্চয় আমাকে সব বলবে। এই বয়সী যুবকরা অতিশয় কৃতজ্ঞ হয়। অতিশয় খোলামেলা হয়। আমিও ওমরকে বলল ডাক্তারকে কী বলেছি আমি, ওমরের মা বাবাকে কী বলেছি। কেমন করে দুটো ব্যাপারে ম্যানেজ করব এই পরামর্শও ওমরের কাছেই চাইব আমি। ওমরই হয়তো বলে দেবে কেমন করে ম্যানেজ করতে হবে। কিন্তু ওমরের মোটর সাইকেল চেন মানিব্যাগ এগুলো কী হবে! কেমন করে জিনিসগুলো মারবে যুবরাজ! যুবরাজ মনে মনে বলল, দেখা যাক কী হয়। পরমুহূর্তেই বলল, আচ্ছা, কেন পরের জিনিস মারতে যাব আমি! আমার কিছু নেই, না থাকার জায়গা, না টাকা পয়সা, না চাকরি বাকরি। যখন যেখানে জায়গা পাই কদিন থাকি। যারা আশ্রয় দেয় তাদের ঘাড়ের ওপর বসে খাই। তারপর আবার রাস্তায় নামি। সঙ্গে ব্যাগটা তো আছেই। আমার স্থাবর অস্থাবর যা আছে সব এই ব্যাগে। এক কথায়

www.shopnil.com

আমার পুরো সংসারটাই। কোনও রকমে ব্যাগটা একবার কাঁধে নিতে পারলে আমার আর কোনও পিছুটান থাকে না। তখন যেদিকে ইচ্ছে চলে যেতে পারি আমি। বন্ধু-বান্ধব পরিচিত আধা পরিচিতজন যে-ই বলে ঠিক আছে থাকার জায়গা নেই থাক কদিন আমার এখানে, আমি থেকে যাই। মাস দেড়েক এরকম পরিচিত একটা জায়গায় ছিলাম আমি। লোকটার নাম আবুল খায়ের। একটি বিদেশী ইনসিউরেন্স কোম্পানিতে দালালি করে। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। ঘরে মাঝারি ধরনের সুন্দরী বউ আর আড়াই তিন বছর বয়সের ছবির মতো ফুটফুটে একটা মেয়ে। শহরের বাইরের দিকে, উপশহর মতো একটা জায়গায় দেড় কাঠার ওপর, চারদিকে ইটের দেয়াল, পাকা মেঝে কিন্তু মাথার ওপর ঢেউটিনের চালা দেয়া তিন কামড়ার বেশ একটা বাড়ি করেছে আবুল খায়ের। বউ-বাচ্চা নিয়ে সুখেই থাকে লোকটা। সকালে ব্রিফকেস হাতে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত নটা দশটার দিকে। সারাদিন চেনা আধা চেনা সব জায়গায় ঢু দিয়ে বেড়ায়, যদি কখনও নতুন মক্কেল ফিট করা যায়। নতুন মক্কেল পেলেই তো, মক্কেলদের প্রিমিয়াম পরিশোধের সময়ই তো কিছু টাকা আসবে হাতে। তবে আবুল খায়ের লোকটা ভাগ্যবান। খুবই অমায়িক ধরনের স্বভাব। অতিশয় মিষ্টি করে কথা বলে। এবং খারাপ ভাল প্রতিটি কথার সঙ্গে আছে মক্কেল কাত করে ফেলে দেয়ার মতো মিষ্টি মোলায়েম হাসি। ফলে মক্কেল একবার হাতের কাছে পেলে, যতক্ষণ প্রয়োজন যতদিন প্রয়োজন পেছনে লেগে থেকে ফিট তাকে আবুল খায়ের করবেই। ফলে আয় উন্নতি ভালই লোকটার। মাত্র বছর পাঁচেকের দালালির ফলে ঢাকার উপকণ্ঠে দেড় কাঠার ওপর বাড়ি, মাঝারি ধরনের সুন্দরী স্ত্রী এবং কন্যা নিয়ে বেশ ভালই আছে আবুল খায়ের। এবং পরিশ্রম যা করছে, বোঝায় যা, যতদিন যাবে লোকটা তত উন্নতি করবে। কিছু কিছু লোক আছে না, যারা কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না! নিঃশব্দে নিজের কাজটাই কেবল করে যায়। গলি ঘুপচি থেকে রাজপথ খুঁজে বেড়ায়। তারপর একদিন আশেপাশের লোকেরা অবাক হয়ে দেখে তাদের চেনা চুপচাপ স্বভাবের লোকটা আর তাদের মতো আগের জায়গায় পড়ে নেই, কখন কোন ফাঁকে যেন বহুদূরে চলে গেছে। কিংবা কোন ফাঁকে যেন ওপরে ওঠার সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে ফেলেছে। আবুল খায়ের ওই প্রকৃতির লোক। চুপচাপ নিজের কাজটা করে যাচ্ছে সে। রাজপথটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওপরে ওঠার সিঁড়িটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে সংসারের ব্যাপারে এই ধরনের লোকেরা বুঝি একটু উদাস হয়ে থাকে। স্ত্রী-কন্যার ব্যাপারে উদাস হয়ে থাকে। যে কারণে এই ধরনের লোকের যুবতী স্ত্রী কিংবা ডবকা কন্যারা একটু লটর-পটর ধরনের হয়ে থাকে। চোখ ইশারা কিংবা মুহূর্তের জন্য হাতটা একটু ধরতে পারলে তাদের কাছ থেকে বিমুখ হওয়ার কোনও স্কোপ নেই। আবুল খায়েরের বউও বুঝি বিমুখ করে না কাউকে বরঞ্চ যুবরাজের বয়সী কোনও যুবক যদি মহিলার ত্রিসীমানার মধ্যে থাকে তবে যেমন করেই হোক নিজের দিকে সেই যুবকটিকে টানার প্রাণপণ একটা চেষ্টা মহিলা চালিয়ে যাবেই। এবং কোনও না কোনও সময় ঠিক কবজা করে ফেলবে।

এসব ক্ষেত্রে মেয়েমানুষ হচ্ছে প্রায় ভগবানের মতো ক্ষমতাবান। ইচ্ছে করলে পুরুষমানুষ কবজা তারা করতে পারবেই। লেগে থাকলেই হলো।

লেগে আবুল খায়েরের বউ অবশ্য থাকে। জানপ্রাণ দিয়ে লেগে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তার লেগে থাকাও প্রায় আবুল খায়েরের মতোই। আবুল খায়ের লেগে থেকে ফিট করে ইনসিউরেন্সের মক্কেল আর তার স্ত্রী লেগে থেকে ফিট করে ফষ্টিনষ্টি করার মক্কেল। স্বভাবে দুজনই দালাল। যুবরাজের ভাগ্য কী, শালা এরকম খাতারনাক একটা জায়গায় গিয়ে পতিত হয়েছিল। বেশ কদিন চেষ্টার ফলে আজ বিকেলে ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে, আবুল খায়েরের বউয়ের চোখ এড়িয়ে কেটে পড়তে পেরেছে সে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আরেক ঝামেলা। ওমরের চক্করে পড়ে গেল। শালা চক্কর আর যুবরাজের জীবন থেকে যাবে না।

স্টিচ দিয়ে ডাক্তার চলে যাওয়ার পর সাবিহা সিস্টার পর পর দুটো ইনজেকশান দিল ওমরকে। দূরে দাঁড়িয়ে ইনজেকশান দেয়ার দৃশ্যটাও দেখল যুবরাজ। অবস্থা একই ইনজেকশান দেয়ার সময়ও একটু নড়াচড়া করল না ওমর। একটুও উ আ করল না। ওমরকে যত দেখছে তত অবাক হচ্ছে যুবরাজ এ কী রকম ছেলেরে বাবা! শরীরটা কি লোহা দিয়ে তৈরি নাকি! অবিরাম সূচ ফুটছে শরীরে, কখনও সেলাইয়ের জন্য কখনও ইনজেকশানের জন্য, কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই ওমরের। কেমন করে অতটা সহ্য করতে পারে মানুষ!

ওমরের কথা ভেবে ওমরের ব্যাপারে খুবই ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠল যুবরাজ। দরকার হলে আরও সাতদিন ওমরের সঙ্গে লেগে থাকবে সে। লেগে থেকে দেখবে ওমর জিনিসটা আসলে কী! আর ওর মূল সমস্যাটাই বা কী। কারা, কেন ওভাবে মেরেছিল তাকে! কেন ফেলে রেখেছিল ওরকম নির্জন একটা জায়গায়! আর ওমরের তো এখন পুরোপুরি জ্ঞান আছে। নার্সিংহোমে ঢুকেই তার নাম এবং তাদের বাড়ির টেলিফোন নাম্বার ওমরের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল যুবরাজ। ওমর জানে এই যুবকটিই ওরকম নির্জন একটি জায়গা থেকে অজ্ঞান ওমরকে তুলে এতটা পথ মোটর সাইকেল চালিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে একটা নার্সিংহোমে। এক কথায় লাইফটা সেভ করেছে ওমরের। এসব জেনে খুব স্বাভাবিকভাবেই যুবরাজের ব্যাপারে প্রচণ্ড রকমের কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠার কথা ওমরের। আফটার অল জীবনটা তার বাঁচিয়েছে যুবরাজ। কিন্তু ওসবের কিছুই নেই ওমরের। অন্তত তার প্রতি ওমর বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞ কি না, বোঝার কোনও স্কোপ পাচ্ছে না যুবরাজ। জিজ্ঞেস করার পর নিজের নাম ঠিকই বলেছে ওমর, কিন্তু ভদ্রতা করে তার জীবন যে রক্ষা করেছে তার নামটা জানতে চায়নি। এমনকি বিন্দুমাত্র আগ্রহও দেখাচ্ছে না যুবরাজের ব্যাপারে।

কেন?

খুবই অদ্ভুত চরিত্রের ছেলে মনে হচ্ছে ওমরকে। নার্সিংহোমে আসার পর নিজের নাম আর বাড়ির টেলিফোন নাম্বার দেয়া ছাড়া আর একটি কথাও বলে নি সে। একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি।

কেন?

ওমরের চোখের সামনে তিনজন লোক বেশ অনেকক্ষণ ধরেই ঘোরাঘুরি করছে। যুবরাজ নিজে একজন ডাক্তার আর মোটামুটি দেখতে এরকম একজন যুবতী নার্স। তিনজন মানুষের একজনের ব্যাপারেও ওমরের কোনও আগ্রহ নেই। কথা তো কারও সঙ্গে বলছেই না, এমনকি চোখ তুলে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখছে না। মানুষের ব্যাপারে এত অনিহা কেন ওমরের!

কেন?

এই তিনটি কেনর উত্তর অবশ্যই খুঁজতে হবে যুবরাজকে। যতদিন লাগে উত্তরটা সে খুঁজে বের করবে। করবেই।

হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। নার্সিংহোমে সিগ্রেট খাওয়ার কোনও নিয়ম নেই। তবুও সিগ্রেটটা এতক্ষণ ধরে খেয়েছে যুবরাজ। কিন্তু এখন সিগ্রেটের লেজটা ফেলবে কোথায়! কোথাও তো অমন জায়গা দেখা যাচ্ছে না!

এসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা তো একটা না একটা কিছু হয়ই। ওমরের রুমের ভেতর আছে ছোট্ট একটা বাথরুম। সেই বাথরুমের দরজা খুলে সিগ্রেটের লেজটা বাথরুমের ভেতর ছুড়ে ফেলল যুবরাজ। তারপর হেলমেট এবং কাঁধের ব্যাগটা, রুমের ভেতর রোগীর ওষুধ পথ্য এবং খাবার ইত্যাদি রাখার জন্য যে ছোট্ট টেবিলটা আছে তার ওপর রাখল যুবরাজ। মনে মনে বলল, ব্যাগটা একবার কাঁধ থেকে নামিয়ে কোনও জায়গায় রাখলে বুঝতে হবে আছে, সেখানে যুবরাজ বেশ কিছুদিন আছে। এখানেও, এই নার্সিংহোমে ওমরের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আছি আমি। ওমর খুবই রহস্যময় চরিত্র। এট্রাকটিভ ক্যারেকটার। ওমরের চরিত্রের রহস্যময়তার কারণ আমাকে জানতে হবে। যতদিন লাগে, আছি আমি।

ব্যাগ আর হেলমেট টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ওমরের বেডের দিকে এগিয়ে গেল যুবরাজ। মনে মনে বলল, যেমন করেই হোক ওমরের সঙ্গে এখন কথা বলব আমি। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করব অনেক কিছু। যুবরাজ সাহেব আপনি এখন গোয়েন্দা চরিত্রে নাজেল হচ্ছেন। আপনি এখন নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটি রায়। লাগুন, কাজে লেগে যান স্যার।

কিন্তু যুবরাজ ওমরের বেডের কাছে পৌছার আগেই উদভ্রান্তের মতো হুড়মুড় করে রুমে এসে ঢুকলেন ওমরের মা-বাবা। তাদের পেছনে ঢুকল রিখু। প্রত্যেকের চেহারায় তীব্র উৎকণ্ঠা।

তিনজন অচেনা মানুষের দিকে তাকিয়ে ফ্রিজ হয়ে গেল যুবরাজ।

মুনাদের বাড়ির দোতলাটা একদম খালি, চুপচাপ পড়ে আছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই প্রাণের সাড়া নেই। মা-বাবা গেছেন পার্টিতে। মুনাও ছিল বাইরে। খানিক আগে ফিরেছে। ফিরে গাড়িটা লনের এক পাশে রেখে নিঃশব্দে উঠে গেছে দোতলায়। কিন্তু নিজের রুমে ঢোকেনি। রুমের সামনে, বারান্দায় রেলিংয়ে গা ঘেঁষে একটা সুন্দর

www.shopnil.com

গদিঅলা, খুবই আরামদায়ক চেয়ার পাতা আছে। চুপচাপ সেই চেয়ারটায় গিয়ে বসেছে মুনা। বসে পা দুটো উঁচু করে ঢুকিয়ে দিয়েছে রেলিংয়ের গ্রিলের ফাঁকে। ফলে চেয়ারে মুনার শরীরটা গেছে আধশোয়া হয়ে। হাত দুটো ভাজ করে মাথার পেছনে রেখেছে মুনা। তারপর আনমনে তাকিয়েছে আকাশের দিকে।

দোতলার সিঁড়ির মুখে জ্বলছে শেড দেয়া মৃদু একটা আলো। মুনা যেখানে বসে আছে সেই জায়গা অব্দি পৌঁছয়নি। পাতলা একটা অন্ধকারে ডুবেছিল জায়গাটা। যদিও মুনা যেখানে বসে আছে, মুনার ঠিক মাথার ওপর আছে ওরকম শেড দেয়া আরেকটা আলো। সুইচটা আছে মুনার ঠিক পেছন দিককার দেয়ালে। ইচ্ছে করলেই আলোটা জ্বেলে দিতে পারে মুনা। কিন্তু আলোটা মুনা জ্বালেনি। অন্ধকারে বসে থাকতে বেশ লাগছে তার কারণ বিকেল থেকে মুনার মন খুব খারাপ আজ। আজই মুনার জীবনের বেশ একটা নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে ঘটে গেছে এমন একটি ঘটনা, যে ঘটনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে নারী জন্ম। যে ঘটনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে পুরুষজন্ম। যে ঘটনার কথা অন্ধকারে বসে ভাবতেই ভাল লাগে মানুষের। অন্ধকারে বসেই এইসব ঘটনাকে অনুপুঙ্খ ভাবা যায়। ব্যাপারটা একটা দিক দিয়ে খুবই সুখের। অন্যদিক দিয়ে দুঃখের। দুঃখ এবং সুখের মিশেল দেয়া ব্যাপারই তো আসলে সুখের। এই কারণে মানুষের জীবনে এই ঘটনাটি যখন ঘটে যায় তখন নিজের অজান্তে হলেও মনটা একটু খারাপ তাদের হয়ই।

মুনারও কি এ করম নিজের অজান্তেই খারাপ হয়েছে মনটা!

না, ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর মুনা যা যা চেয়েছিল, যেভাবে চেয়েছিল পরের ঘটনাগুলো তার সেভাবে ঘটেনি, ঘটলে কিছুতেই মনটা খারাপ হতো না মুনার।

জীবনের কিছু কিছু ঘটনা মানুষ যেভাবে চায় হুবহু না হলেও প্রায় ওরকম করেই ঘটে। আবার কিছু কিছু ঘটনা মানুষ যেভাবে ভাবে ঘটে ঠিক তার উল্টো ভঙ্গিতে। আবার কখনও কখনও ঘটেই না। পরিমাণের দিক দিয়ে না-ঘটা ঘটনাই বেশি।

আজ বিকেলে মুনার ব্যাপারটিও হয়েছে ওরকম। প্রথম ঘটনাটি মুনা যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে তো দূরের কথা, ঘটেইনি। মুনার কি আসলে এজন্য মন খারাপ! মুনা কি আসলে এইজন্য একাকী অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে! আকাশের দিকে তাকিয়ে মুনা কি এজন্য সেই না-ঘটা ঘটনাটির কথা ভাববে! এক সময় চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসল মুনা। তারপর জীবনে কখনও যা হয়নি, এই মুহূর্তে তাই হলো মুনার। প্রেম কিংবা নারী-পুরুষের সম্পর্ক বোঝার বয়স থেকেই মুনার ছিল একজন কাল্পনিক প্রেমিক। রূপ গুণ ইত্যাদি মিলিয়ে সেই প্রেমিক ছিল অলৌকিক এক অবয়বে। স্পষ্ট করে সেই প্রেমিকাটির চেহারা কখনও ভাবা হয়নি মুনার। ভাবা হয়নি বলে স্বপ্ন কিংবা কল্পনায় স্পষ্ট করে কখনও দেখাও হয়নি তার চেহারা। তবে অলৌকিক সেই মানুষটির সঙ্গে, একা, একান্ত নিজস্ব মুহূর্তে জীবনের প্রায় সব কথাই বলা হয়েছে মুনার। আজকের সব ঘটনাও তো নিশ্চয় কোনও না কোনও মুহূর্তে খুলে বলবে মুনা। কখন, সেটা কখন।

www.shopnil.com

আসলে এই মুহূর্তে কাল্পনিক প্রেমিককে আজকের সব ঘটনা, আজকের সব কথা খুলে বলার জন্য চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসেছে মুনা। কেমন করে শুরু করবে, কোথা থেকে শুরু করবে ভেতরে ভেতরে সেই প্রস্তুতি যখন নিচ্ছে, তখুনি জীবনে প্রথমবারের মতো ঘটল ঘটনাটি। কাল্পনিক প্রেমিকের চেহারাটি এই প্রথম স্পষ্ট চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখল মুনা। এই প্রথম কল্পনা ভেঙে বাস্তব রূপ পেল একজন মানুষ। একজন পুরুষ। একজন প্রেমিক। সেই একজন পুরুষ, সেই একজন প্রেমিক আর কেউ নয়, ওমর। ওমর ওমর।

চোখের সামনে ওমরের চেহারাটা ভেসে উঠতে দেখে খুশিতে পাগল হয়ে গেল মুনা। ফিসফিস করে বলল, প্রেম, আমার প্রেম।

তারপরই মুখটা করুণ, বিষণ্ন হয়ে গেল মুনার। চিরকালীন দুঃখী মানুষের গলায় মুনা বলতে শুরু করল, শোন, ওমর শোন, প্রিয়তম শোন, ঠিক এভাবে আমি চাইনি। চাইনি। কেন যে, কোন ফাঁকে যে ব্যাপারটা ঘটে গেল তাও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে ওরা যখন তোমাকে মারছিল, বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে মার খেয়ে যাচ্ছ তুমি, মার খেতে খেতে এক সময় যখন হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছিলে তুমি, তখন, তখন কেন অমন করে আমার চোখের দিকে তাকালে তুমি! তোমার সেই চোখে কী ছিল কে জানে! আমি কেন অমন করে কেঁপে উঠলাম। এতটা বয়স হলো, কতজনই তো কতভাবে তাকিয়েছে আমার দিকে, কই, কখনও তো এমন হয়নি আমার! কখনও তো এমন করে কেঁপে উঠিনি আমি! আর সে কেমন কাঁপন, মাগো, লজ্জায় মরে যাই। প্রিয়তম, সে কাঁপনের কোনও ব্যাখ্যা কখনও আমার কাছে চেয়ো না তুমি। আমি পারব না! আমি কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারব না। তবে এটুকু কেবল বলা যায়, তোমার চোখের সামনে, তোমার ওই দৃষ্টির সামনে মুহূর্তেই যেন নিরাবরণ হয়ে যাচ্ছিলাম আমি। এতটা বয়স অব্দি ধরে রাখা আমার যুবতী শরীরের যাবতীয় গোপন সৌন্দর্য মুহূর্তেই যেন দেখে ফেলেছিলে তুমি। তোমার কাছে লুকোবার যেন কিছু আর বাকি ছিল না আমার। শরীর তো আমার কাঁপবেই। তাছাড়া সেই মুহূর্তে আরেকটি ব্যাপারও টের পাচ্ছিলাম আমি, আমার শরীর ভেদ করে তোমার দৃষ্টি যেন অবলীলায় পৌঁছে যাচ্ছিল আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে। আমার সম্পূর্ণ হৃদয় দখল করে নিয়েছিল সেই দৃষ্টি। এক জীবনে এক নারীর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ওরকম দৃষ্টি নিয়ে কেবল একজন পুরুষই পৌঁছুতে পারে। প্রিয়তম ওমর, তুমি সেখানে আজ পৌঁছে গেলে। আমার হৃদয়ের গহনতম প্রকোষ্ঠে তুমি আজ পৌঁছে গেলে। ওখান থেকে কেমন করে তোমাকে আমি সরাব! তুমি কেন অমন করে তাকালে বল তো! তোমার চোখ প্রথমে দখল করে নিয়েছিল আমার শরীর। তারপর দখল করেছে আমার হৃদয়। এবং তারপর, তারপর তুমি বিশ্বেস কর, তুমি বিশ্বেস কর প্রিয়তম, ওইটুকু সময়ের মধ্যে, ওইটুকু সামান্য সময়ের মধ্যে আমি টের পেলাম, টের পেলাম তোমার চোখ, তোমার দৃষ্টি পৌঁছে গেছে আমার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়। আমার রক্তের প্রতিটি কণায় মিশে গেছে তোমার দৃষ্টি। মিশে গেছ তুমি। কেঁপে তো আমি

উঠবই। অথচ খানিক আগেই, খানিক আগেই পায়ের কাছে, ঘাসবনে সাপের মতো কিছু একটা দেখে চিৎকার করে উঠেছিলাম। পাগলের মতো ছুটে এসে দুহাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলে তুমি। এই বয়সী একজোড়া যুবক যুবতী পরস্পরকে চেপে ধরেছে বুকে। শরীরে দুজনেরই অন্যরকমের একটি কাঁপন ধরার কথা। তোমার ধরেছিল কিনা জানি না, আমার কিন্তু ধরেনি। যদিও আমি তখন কাঁপছিলাম, তবে সেটা কিন্তু ভালবাসার কিংবা আবেগের কাঁপন নয়। সেটা ছিল ভয়ের কাঁপন। পায়ের কাছে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছিলাম আমি। সেই ভয়ে কাঁপছিলাম। তুমি না হয়ে যে কেউ জড়িয়ে ধরলেও ঠিক অমন করে কাঁপতাম আমি। বিশ্বাস কর, আশ্চর্য লাগে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে কেমন করে কী হয়ে গেল। সত্যি সত্যি এভাবে চাই নি আমি। এভাবে মানে কি, তোমাকেই তো চাইনি আমি। বরং তোমার ওপর খুব বিরক্ত ছিলাম। রেগে ছিলাম। তোমার আচরণে এক সময় আমার মনে হয়েছিল রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো বড়লোক বাপের বখাটে ছেলে তুমি। মেয়েদের পেছনে লেগে থাকা ছাড়া তোমার আর কোনও কাজ নেই। তোমার ব্যাপারে বিরক্ত হয়েই গোগোদের ডেকেছিলাম আমি। ওদেরকে টাকা খাইয়ে চেয়েছিলাম তোমাকে শায়েস্তা করতে। যাতে আমার পেছনে আর না লেগে থাক তুমি। আমাকে ডিস্টার্ব না কর। আশ্চর্য লাগে, কেমন করে কী হয়ে গেল। সত্যি বলছি, তোমাকে ওরা যখন মারছিল, প্রথম দিকে আমার কিন্তু একটুও খারাপ লাগছিল না। বরঞ্চ যা চাইছিলাম তা হচ্ছে দেখে ভেতরে ভেতরে বেশ খুশিই হচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি যখন পড়ে যেতে যেতে অমন করে তাকালে, তোমার সেই দৃষ্টিতে মুহূর্তে পাল্টে গেলাম আমি। মুহূর্তে পাল্টে গেল আমার জীবন। কেন অমন করে আমার দিকে তাকালে তুমি! কেন ভেঙে তছনছ করে দিলে আমার হৃদয়! আমার যাবতীয় অহঙ্কার! কেন নিঃশব্দে বলে দিলে তুমি ছাড়া আর কাউকে, এই জীবনে আর কাউকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি ডাকাত, ডাকাত। এমন করে কেউ কারও ভালবাসা ছিনিয়ে নেয়! না নিতে পারে! ওমর, ওমর, প্রিয়তম ওমর আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসি। তোমার বুকে মুখ রেখে হাজারবার, লক্ষ কোটিবার আজ থেকে আমি কেবল এই কথাটাই বলব, আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি। আর প্রিয়তম, হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে ওই যে তুমি বললে, আমার সঙ্গে তোমার অনেক কথা ছিল, কী কথা গো? কী কথা? আমি শুনব। আমি তোমার সব কথা শুনব। তুমি বেঁচে থাকতে বললে বেঁচে থাকব। মরে যেতে বললে মরে যাব। তবে তোমাকে না ভালবেসে বেঁচে থাকতে পারব না আমি। তোমাকে বুকের কাছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য না পেলে বেঁচে থাকতে পারব না। তুমি তুমি...

কখন, কোন ফাঁকে যে মা এসে দাঁড়িয়েছেন মুনার পাশে, মুনা একদমই খেয়াল করেনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে, আসলে কল্পনায় ওমরের দিকে তাকিয়ে এতটা মগ্ন হয়ে কথা বলছিল সে, তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই অবস্থায় অন্য কারও দিকে মনোযোগ দেয়া কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মুনার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। কিন্তু

www.shopnil.com

মা বেশ খানিকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন আকাশের দিকে তাকিয়ে একাকী কথা বলে যাচ্ছে মুনা। কোনও দিকে তাকাচ্ছে না। ব্যাপারটা দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন মা। এক সময় নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে মুনার কথার মাঝখানে কথা বলে উঠলেন তিনি। গম্ভীর চিন্তিত গলায় ডাকলেন, মুনা!

মার ডাকে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল মুনার। চমকে উঠল। আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মুনার মাথার পেছনে, দেয়ালে হাত দিয়ে সুইচ টিপলেন মা। মুহূর্তে তাদের মাথার ওপর জ্বলে উঠল শেড দেয়া সুন্দর আলো। সেই আলোয় মা দেখলেন মুনার মুখে অদ্ভুত এক দ্যুতি খেলা করছে। চরম আনন্দের সঙ্গে সামান্য বিষণ্ণতার মিশেল দিয়েই কেবল মানুষের চেহারায় তৈরি হতে পারে এরকম দ্যুতি। এবং এক জীবনে মানুষের চেহারায় এমন দ্যুতি এক আধবারই দেখা যায়। এত বড় হয়েছে মেয়েটা কখনও তো তার চেহারায় এ রকম দ্যুতি দেখেননি মা! কী হয়েছে মুনার!

মা কথা বলার আগেই হাসি হাসি মুখে মুনা বলল, মামণি, কখন ফিরলে তোমরা?

বেশ কিছুক্ষণ।

কোথায় ছিলে! আমি যে তোমাদের দেখতে পেলাম না!

আমি তো অনেকক্ষণ ধরে তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছি।

কথাটা শুনে মুনা অবাক হলো। তাই নাকি!

হ্যাঁ। বাড়ি এসেই তোর কথা জিজ্ঞেস করলাম! বুয়া বলল, তুই ওপরে। তারপর ওপরে এলাম। এসে দেখি বারান্দাটা অন্ধকার। অন্ধকারে বারান্দার শেষ মাথায় তুই বসে আছিস। ভাবলাম নিঃশব্দে তোর সামনে এসে চমকে দেব তোকে। ওমা, কাছে এসে দেখি আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে কথা বলছিস তুই। খানিক দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

মুনা হেসে বলল, কই?

লুকোচ্ছিস কেন! আমি তো অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। তাছাড়া আগেও দুএকবার লক্ষ করেছি, একা থাকলে কার সঙ্গে যেন বিড়বিড় করে কথা বলিস তুই।

মুনা কোনও কথা বলে না। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মা বললেন, মুনা তোর কি শরীর খারাপ?

না তো!

তাহলে অমন লাগছে কেন তোকে?

কেমন?

এ তো বুঝিয়ে বলা মুশকিল। লাইট জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো চেহারায় দারুণ একটা আলো ঝলমল করছে তোর। মুহূর্তে পাল্টে গেল সেটা। এখন তোকে সামান্য পেইল লাগছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুই কি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছিস?

দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে মুনা বলল, সত্যি বলছি মা, আমার কিছু হয়নি। পাপা কই? পাপা ফেরেনি?

ফিরেছে। টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। শোন, তুই কাল আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবি। সকালবেলা ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েনম্যান্ট করে রাখব আমি।

কথাটা শুনে চমকে উঠল মুনা। কেন, ডাক্তারের কাছে কেন?

একা একা কথা বলার লক্ষণটা ভাল নয়। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে তোর। আমার কাছে লুকোচ্ছিস।

মুনা মনে মনে বলল, আমার যে কী হয়েছে, মামণি তুমি কেন, পৃথিবীর কাউকে তা বলা যাবে না। বলা যাবে কেবল একজনকে।

বাবা বললেন, ডক্টর, আমার একটা মাত্র ছেলে!

বাবার চোখ ছলছল করছে। মুখে বিশাল কোনও সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার পর মানুষের চেহারায় যে ধরনের ছাপ পড়ে সে রকম ছাপ। অবিরাম সিগ্রেট খাচ্ছেন তিনি। একটা শেষ হতেই সেটার আগুন থেকে ধরাচ্ছেন আরেকটা।

মা বসে আছেন ওমরের মাথার কাছে। পাগলের মতো হাত বুলাচ্ছেন ওমরের মাথায়। আর বিড়বিড় করে কথা বলছেন। তোকে আমি কতবার বলেছি মোটর সাইকেলটা বাদ দে। মোটর সাইকেল চালাবার দরকার নেই। তোর পাপাকে বলে তোর জন্য আমি আরেকটা গাড়ি কিনে দিই। ওটা আমরা কেউ ইউজ করব না। শুধু তুই করবি। আলাদা ড্রাইভার থাকবে তোর। তুই আমার কথা শুনলি না। তুই আমার কোনও কথাই কখনও শুনিস না। ওমর কথা বল বাবা। কথা বল।

স্টিচ দেয়ার পর থেকে যেভাবে শুয়ে ছিল ওমর এখনও ঠিক সেই ভাবেই শুয়ে আছে। মাথার নিচে দুটো বালিশ দিয়ে সোজা চিত হয়ে। একটা চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে। আরেকটা ওমর নিজেই বন্ধ করে রেখেছে সেই তখন থেকেই। মা-বাবা এলেন। তাদের সঙ্গে এল রিখু। যুবরাজ তো রুমেই ছিল। ওমরকে নিয়ে মা-বাবার এত উদ্বেগ, এত কথা, কান্নাকাটি, কিন্তু ওমর একবারও চোখ খুলল না। একটি কথাও বলল না। ব্যাপারটা দেখে খুবই ঘাবড়ে গেছেন মা-বাবা। সেই ডাক্তারটিকে ডেকে আনা হয়েছে। সাবিহা নার্সটিও আছে সঙ্গে। কিন্তু রুমে ঢোকেনি সাবিহা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রুমের ভেতর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে যুবরাজ। অদূরে বাবা আর ডাক্তার। বেডে ওমরের পাশে বসে আছেন মা। রিখু চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওমরের মাথার সামনে।

বাবা আবার বললেন, ডক্টর আমার একটা মাত্র ছেলে!

ডাক্তার বললেন, আপনাদের এত চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। ব্যাপারটা সিরিয়াস কিছু নয়। আমাদের যা করার করেছি। দিন তিনেক বেড রেস্টে থাকলে সেরে যাবে।

মা বললেন, কিন্তু ছেলেটা আমার কথা বলছে না কেন?

সঙ্গে সঙ্গে মার কথাটা রিপিট করলেন বাবা। হ্যাঁ, কথা বলছে না কেন? আমরা এলাম এতক্ষণ, আপনি বলছেন সিরিয়াস কিছু না, তাহলে কথা বলবে না কেন!

ডাক্তার একটু চিন্তিত হলেন। কথা না বলার মতো কিছু হয়নি তো!

বাবা বললেন, ইন্টারনাল কোনও প্রবলেম হয় নি তো! হয়তো সেই প্রবলেমের জন্যই কথা বলছে না ওমর। কথা বলতে পারছে না।

কথাটা শুনে যুবরাজের মাথাটা ঝিম করে উঠল। তাই তো, এটা তো আমি ভেবে দেখিনি! এমন তো হতেও পারে!

যুবরাজের খুব সিগ্রেট খাওয়ার ইচ্ছে হলো। কিন্তু পকেটে সিগ্রেট নেই। না থেকে অবশ্য ভালোই হয়েছে। যদিও ওমরের মা-বাবার সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি যুবরাজের, তবুও এঁদের সামনে সিগ্রেটটা যুবরাজ ধরাতে পারত না।

বাবার মুখে ইন্টারনাল প্রবলেমের কথা শুনে মুহূর্তের জন্য চিন্তিত হলেন ডাক্তার। হতেও তো পারে। তাহলে কি সেই প্রবেলেমের জন্য কোনও রকমের শব্দ করতে পারছে না ওমর। স্টিচ দেয়ার সময় এই কারণেই কিন্তু বিন্দুমাত্র শব্দ করেনি সে।

তবুও হতাশ হলেন না ডাক্তার। ডাক্তাররা কখনও হতাশ হন না। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার মনে হয় না তেমন কোনও প্রবলেম হয়েছে।

মা বললেন, তাহলে কথা বলবে না কেন?

দরজার বাইরে থেকেও ঘরের ভেতর চোখ রেখেছিল সাবিহা নার্স। মনোযোগ দিয়ে শুনছিল প্রত্যেকের কথা। ওমরের কথা বলা নিয়ে মা-বাবার উতলা হওয়ার মাঝখানে সাবিহা বলল, মনে হয় ইচ্ছে করেই কথা বলছে না।

সাহিবার কথায় চমকে তার দিকে মুখ ফেরাল সবাই। মা, বাবা, রিখু, যুবরাজ এবং ডাক্তার। সাবিহার দিকে তাকাতেই মুখ থেকে চিন্তার ছাপ হাওয়া হয়ে গেল ডাক্তারের। সেখানে ফুটে উঠল হাসি হাসি একটা ভাব।

কেউ কোনও কথা বলল না।

যুবরাজের মনে হলো ঠিক কথাটাই বলেছে সাবিহা। ইচ্ছে করেই কথা বলছে না ওমর। বাবা যে রকম ইন্টারনাল প্রবলেমের কথা বলছেন অমন প্রবলেম হলে তো প্রথম থেকেই বলতে পারত না ওমর। শব্দ করতে পারত না। কিন্তু শব্দ তো ওমর করেছে! কথাও তো বলেছে! ওমরকে ধরে যখন মোটর সাইকেলে চড়াল যুবরাজ তখনই তো উ আ করল। নার্সিংহোমে এসে নিজের নাম এবং বাসার টেলিফোন নাম্বার পর্যন্ত দিল। তাহলে ইন্টারনাল প্রবেলমটা আর হলো কোথায়! ওমর আসলে ইচ্ছে করেই কথা বলছে না।

ডাক্তার বললেন, আমি একটু ট্রাই করে দেখি কথা বলে কিনা।

www.shopnil.com

এগিয়ে গিয়ে ওমরের চোখের সামনে দাঁড়ালেন ডাক্তার, মোলায়েম গলায় ডাকলেন, মিস্টার ওমর, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন! হ্যালো!

ওমর একটুও নড়ল না। চোখ খুলল না।

কারও মুখে কোনও কথা নেই। উদগ্রীব হয়ে ওমরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

ডাক্তার আবার ডাকলেন, মিস্টার ওমর, শুনছেন!

এবার রুমে ঢুকল সাবিহা। দ্রুত ওমরের বেডের সামনে এগিয়ে এল। দেখি, আমি একটু ট্রাই করে দেখি!

তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে ওমরের মুখের ওপর ঝুঁকে সাবিহা বলল, ওমর সাহেব আপনাকে একটু হা করতে হবে। আপনার জিভটা বোধহয় কেটে গেছে। এইজন্য কথা বলতে পারছেন না আপনি। হা করুন তো, দেখি!

কথাটায় জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হলো। ডান চোখটা খুলল ওমর। খুলে সরাসরি তাকাল সাবিহার দিকে। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, জিভে কিছু হয়নি আমার। আমার কথা বলতে ভাল্লাগছে না।

আবার চোখ বুজল ওমর।

ততক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে রুমের প্রতিটি লোক। মা-বাবার মুখ থেকে কেটে গেছে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। যুবরাজের বুক থেকে নেমে গেছে ভারী একটা পাথর! রিখুর সুন্দর মুখটা মেঘের মতো ফ্যাকাশে হয়েছিল এতক্ষণ। এইমাত্র ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে গেল। ভোরবেলার মিষ্টি মোলায়েম আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখটা। চোরা চোখে একবার যুবরাজের দিকে তাকাল রিখু। তাকিয়ে দেখতে পেল লোকটা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মাগো, চোখ দুটো কী! তাকালে শরীরের ভেতর কেমন করে! এসব ক্ষেত্রে রিখুর একটি মজার স্বভাব আছে। মুহূর্তে চোখে-মুখে কপট একটা রাগ ফুটিয়ে তুলতে পারে। যুবরাজের অমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কপট রাগটা ঠিক ঠিক ফুটিয়ে তুলল সে। ভাবটা এই রকম, অমন করে তাকাবে না। তাকালে চোখ উপরে ফেলব।

রিখুর চোখ দেখে কি ভয় পেল যুবরাজ!

এদিকে সাবিহা যখন কথা বলিয়ে ফেলেছে ওমরকে তখন সাবিহার কৃতিত্বে সাবিহার চেয়েও বেশি খুশি হয়ে উঠলেন ডাক্তার। এমন চোখে সাবিহার দিকে তাকালেন তিনি, মনে হলো এখুনি সাবিহাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করবেন। নেহায়েত এত লোকজন সামনে আছে বলে কাজটা করতে পারলেন না তিনি।

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে সাবিহা বলল, ওমর সাহেবের রেস্টের দরকার। আমার মনে হয় রুমটা খালি হলে রেস্টটা হবে তার।

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না সাবিহা। বেরিয়ে গেল। ভাবটা এই রকম যেন সেইই ডাক্তার। আর ডাক্তারটি হচ্ছে নার্স। নার্সকে কিছু একটা আদেশ করে চলে গেলেন ডাক্তার।

আর ডাক্তারটিও, সাবিহার কথা শোনার পর অধস্তন কর্মচারীর মতো, বসের আদেশে যেমন চঞ্চল হয় ছোটখাট কর্মচারী, ঠিক তেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। উতলা গলায় বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, রুমটা খালি হওয়া দরকার। পেসেন্টের তাহলে রেস্ট হবে। এখন একটানা সকাল অব্দি রেস্ট নিলে, মানে ঘুমুলে সকালবেলা একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে।

ওমরের বেড থেকে নামতে নামতে মা বললেন, রাতে কিছু খাবে না? না খেলে উইক হয়ে যাবে না!

ডাক্তার বললেন, খাওয়ানো তো দরকারই।

বাবা বললেন, কী খাবে?

যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াবেন! দুধ রুটি ফ্রুটস। তবে এখন নয়। সেটা পরে। আপাতত...

কথাটা শেষ না করে যুবরাজের দিকে তাকালেন ডাক্তার। যুবরাজ সাহেব, এঁদের নিয়ে আপনি যদি একটু বাইরে...

কথাটা খেয়াল করল না যুবরাজ। সে তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছে রিখুর দিকে। চোখে পলক পড়ছে না তার।

কেউ যদি তার দিকে তাকিয়ে থাকে, লোকটার দিকে না তাকিয়েও তার চোখটা স্পষ্ট দেখতে পায় মেয়েরা। তাকিয়ে থাকাটা দেখতে পায়। রিখুও পাচ্ছিল। যদিও চোরা চোখে প্রায়ই যুবরাজের দিকে তাকাচ্ছিল সে। তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছিল লোকটা তাকিয়ে আছে। মাগো, চোখে কি মুগ্ধতা লোকটার! ওরকম মুগ্ধ চোখের এই বয়সী কোনও যুবক যদি রিখুর বয়সী কোনও মেয়ের দিকে অবিরাম তাকায় কিংবা তাকিয়ে থাকে, চোখে যদি পলক না পড়ে যুবকটির, মেয়েটির বুক তো তাহলে তোলপাড় করবেই! শরীর তো শিরশির করবেই! রিখুরও করছিল। এই কারণেই কি কপট রাগটা চোখেমুখে ধরে রেখেছিল রিখু! কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছিল না রিখু। ছেলেটি কে! সে এখানে কী করছে! কিংবা কেন সে এখানে এসেছে! ছেলেটি কি তাহলে ভাইয়ার বন্ধু! কিন্তু ভাইয়ার সব বন্ধুকেই তো চেনে রিখু। এতে তো ভাইয়ার সঙ্গে কখনও দেখেনি! তাহলে?

রিখু মনে মনে বলল, যুবক তুমি কে?

ঠিক তখুনি ডাক্তার বললেন, যুবরাজ সাহেব শুনতে পাচ্ছেন?

থতমত খেয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল যুবরাজ। জি, আমাকে কিছু বলছেন?

তার ভঙ্গি দেখে এত কিছুর মধ্যেও ফিক করে হেসে ফেলল রিখু। হেসে মাথা নিচু করল। আর মুহূর্তেই মুখে চোখে ফুটিয়ে তুলল সেই কপট রাগী ভাব। কিন্তু মনে মনে রিখু তখন যুবকটির সঙ্গে কথা বলছে। তোমার নাম বুঝি যুবরাজ! বাহ্, ভারি সুন্দর নাম তো তোমার! কিন্তু তুমি কে! এতদিন কোথায় ছিলে! তুমি কি ভাইয়ার বন্ধু! তাহলে তোমাকে এতদিন দেখিনি কেন আমি! যুবরাজ, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?

www.shopnil.com

যুবরাজকে চমকে উঠতে দেখে ডাক্তার মৃদু হাসলেন। হ্যাঁ, আপনাকেই বলছিলাম। আপনি এঁদের সবাইকে নিয়ে একটু বাইরে গেলে পেসেন্টের রেস্টটা হয়। তার এখন রেস্ট দরকার।

যুবরাজ বলল, রাতে এখানে কারও থাকা উচিত নয়?

মা বললেন, আমি থাকব। আমি।

ডাক্তার বললেন, তা থাকুন।

বাবা বললেন, কিন্তু এটা তো সিঙ্গেল রুম। বেডও তো একটা। তুমি থাকবে কী করে?

ডাক্তার বললেন, আপনারা বললে আমরা ডাবল বেডের রুম এরেঞ্জ করতে পারি।

প্লিজ তাই করুন! ওমরের কাছে সারাক্ষণই কেউ না কেউ থাকবে আমাদের।

ঠিক আছে। এখুনি ডাবল বেডের রুম এরেঞ্জ করছি আমি।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই ওমরের মা-বাবার দিকে তাকাল যুবরাজ। বিনীত গলায় বলল, ডাক্তার সাহেব বলছিলেন...

কথাটা শেষ করতে পারল না যুবরাজ। বাবা বললেন, কিন্তু তোমাকে আমি ঠিক, তুমি...

যুবরাজ একবার বেডে চোখ বুজে পড়ে থাকা ওমরের দিকে তাকাল। তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য ভাবল ওমরের বাবার কথার কী জবাব দেবে সে। ওমরের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী! যুবরাজ কি বলবে ওমর তার বন্ধু! তারপর সেই বানোয়াট গল্প, ডাক্তারকে যা বলেছে!

কিন্তু ওমর তো সামনেই আছে! কথা শুনে যদি প্রতিবাদ করে ওঠে! যদি বলে, এই লোকটাকে আমি চিনি না। আমাকে কোনও হাইজ্যাকারও ধরেনি, লোকটা যা বলছে সব মিথ্যে, বানোয়াট। তখন কী করবে যুবরাজ! ফেঁসে যাবে না! কী করবে, যুবরাজ এখন কী করবে! ওমরের বাবাকে কী বলবে! তখন ওমরের বাবা-মা এবং অদূরে দাঁড়ানো রিখু তিনজনই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে যুবরাজের দিকে। কিন্তু যুবরাজ কারও দিকে তাকাল না। মাথা নিচু করে বলল, চলুন, বাইরে চলুন বলছি।

বাবা-মার সঙ্গে নার্সিংহোমের টানা বারান্দার শেষ মাথায় চলে গেল যুবরাজ। রিখু একবার মাত্র তাকিয়ে তাদের দেখল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এল। কী জানি কী কারণে খানিক আগ থেকে মনের ভেতর অদ্ভুত এক আনন্দ টের পাচ্ছে রিখু। যখন থেকে টের পেয়েছে তখন থেকে দেখতে পেয়েছে যুবরাজ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। এত ধারালো চোখ যুবরাজের, কয়েকবার অমন চোখে তার দিকে

www.shopnil.com

যুবরাজকে তাকাতে দেখার পর থেকেই মনের ভেতরটা এমন করছে রিখুর। কেন, মনের ভেতরটা এমন করছে কেন রিখুর। রিখুর দিকে এমন করে তো কতজনই তাকায়। যেমন বান্টি। সে তো চান্স পেলে নাগারে পাঁচ-দশ মিনিটি তাকিয়ে থাকে রিখুর দিকে। চোখে তখন পলক পড়ে না বান্টির। কই, বান্টির অমন করে তাকিয়ে থাকা দেখে তো মনে হয়নি কোনো মানুষের মনের ভেতর ছড়িয়ে যেতে পারে এরকম অভূতপূর্ব এক শিহরণ! অনির্বচনীয় এক আনন্দ! যে শিহরণ, যে আনন্দ জীবনে আর কখনও পায়নি রিখু। এই প্রথম। এই প্রথম। আনন্দে ছটফট করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রিখু। তার পরনে সাদা, ধবধবে সাদা ফ্রক আর পাজামা। কিশোরী মুখে গোলাপ পাপড়ির মতো মোলায়েম এক ঔজ্জ্বল্য। চঞ্চল চোখে আনন্দ বেদনার মিশেল দেয়া অদ্ভুত এক দৃষ্টি। রিখুর চোখের দিকে তাকালে যে কেউ এই মুহূর্তে দেখতে পাবে, চারপাশের যাবতীয় দৃশ্যের ওপর রিখুর চোখ পড়ছে ঠিকই কিন্তু কোনও দৃশ্যই দেখতে পাচ্ছে না সে। রিখুর চোখ দেখছে অদৃশ্য কোনও দৃশ্য। সুদূরের কোনো দৃশ্য। রিখুর খুব কাছে থেকে অন্য কেউ সেই দৃশ্য দেখতে পাবে না। কী দেখছে রিখু! কাকে দেখছে অমন করে! রিখুর চোখ জুড়ে কোন সে দৃশ্য খেলা করছে এখন! কেউ জানে না।

নিচে নেমে, চোখ অদৃশ্য দৃশ্যের দিকে, আনমনে খুবই আস্তে ধীরে নার্সিংহোমের লনে পায়চারী করতে লাগল রিখু। লনে বেশ অনেকগুলো গাড়ি, একটা মোটর সাইকেল আর দুটো এম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িগুলোর ফাঁক ফোকর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার যুবরাজের কথা মনে পড়ল রিখুর। কে, যুবরাজ আসলে কে! রিখু মনে মনে বলল, যে-ই হও, যুবরাজ তুমি খুব সুন্দর। তোমার চোখ খুব সুন্দর। তোমার ফিগার খুব সুন্দর। তুমি দেখতে ওয়েস্টার্ন ফিলমের নায়কদের মতো। তোমার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকলে আমার বয়সী যে কোনও মেয়ে মনে মনে তোমাকে নিয়ে অনেক কিছু ভাববে। অনেক কিছু স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে। তারপর তুমি যদি আবার তোমার ও রকম চোখ তুলে কারও দিকে তাকাও, অনেকক্ষণ পলক না ফেলে তাকিয়ে থাক, তাহলে সেই মেয়েটির অবস্থা হবে ঠিক আমার এই মুহূর্তের অবস্থার মতো। অদ্ভুত এক শিহরণে শরীর ভরে যাবে, অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে যাবে মন। যে শিহরণ, যে আনন্দের কোনও ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। যে শিহরণ, যে আনন্দ এই প্রথম আমার জীবনে। এর আগে কখনও এরকম কোনও অনুভূতি হয়নি আমার।

মানে কী! এসবের মানে কী!

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে লনে দাঁড়ানো মোটর সাইকেলটার সামনে চলে এল রিখু। তারপর কিছু না ভেবে মোটর সাইকেলটার ওপর বসতে চাইল। বসতে গিয়ে এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম বাস্তব একটি দৃশ্য চোখে পড়ল রিখুর। এবং দৃশ্যটা দেখে বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেল সে। আরে এটা তো ভাইয়ার মোটর সাইকেল! যেমন ছিল অবিকল তেমনই আছে মোটর সাইকেলটা। তাহলে অ্যাকসিডেন্ট করল কোথায়! অ্যাকসিডেন্ট করলে মোটর সাইকেলটার তো অল্প বিস্তর যতটুকুই হোক

www.shopnil.com

ক্ষতি হওয়ার কথা! তেমন কিছুই তো হয়নি! মোটর সাইলেকটার গায়ে তো একবিন্দু আঁচড়ের চিহ্নও নেই! তাহলে ? ভাইয়া কি মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করেনি! কিন্তু টেলিফোনে বাবা-মা যে শুনল! বিষয়টা হঠাৎ খুব চঞ্চল করে তুলল রিখুকে। নিশ্চয় ভাইয়ার অ্যাকসিডেন্টের অন্তরালে আছে রহস্যময় কোনও ঘটনা! এবং ঘটনাটির সঙ্গে যুবরাজ জড়িত। কী, ঘটনাটি কী! রিখু মনে মনে বলল, আমাকে জানতে হবে। জানতে হবে।

চড়ুই পাখির মতো চঞ্চল পায়ে লাফাতে লাফাতে নার্সিংহোমের দোতলায় উঠে গেল রিখু।

যুবরাজ বলল, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়।

কথাটা শুনে মা-বাবা দুজনেই খুব অবাক হলেন। বাবার কপালে তিনটে ভাঁজ পড়ল। আর মার ভ্রু দুটো এমন করে চেপে এল যেন একত্র হয়ে যাবে, মিশে যাবে।

কিছু একটা বলতে চাইলেন মা। তার আগে গম্ভীর গলায় বাবা বললেন, মানে ?

ওমর মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করেনি।

যুবরাজের কথায় মা-বাবা দুজনেই খুব চমকে উঠলেন। মা বললেন, তাহলে ?

যুবরাজ গম্ভীর গলায় বলল, ওমরকে হাইজ্যাকাররা ধরেছিল।

কোথায় ?

গুলশানের ওদিককার একটা জায়গায়, জায়গাটা বেশ নির্জন।

ওমর ওখানে গিয়েছিল কেন ?

সে তো আমি জানি না।

বাবা বললেন, তাহলে ?

যুবরাজ চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাল। তাহলে কী ?

তুমি কি ওমরের সঙ্গে ছিলে না ?

না।

তোমার সঙ্গে তাহলে ওমরের দেখা হলো কেমন করে ?

এবার যুবরাজ একটা ঢোক গিলল। নার্সিংহোমের বারান্দা থেকে বেশ দূরে উঁচু একটা বিল্ডিং এর ওপর লাল নীল আলোয় জ্বলছে একটা নিয়ন সাইন। সেই নিয়ন সাইনটার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকাল যুবরাজ। ভাবল, আমি কি এখন সেই গল্পটি বলব, ডাক্তার নার্সদের কাছে যেটি বলেছি!

হ্যাঁ, সেটিই বলা উচিত। গল্প দুরকম হলে বড় রকমের কোনও ঘাপলায় পড়ে যেতে পারি আমি। আর ওমরের যা অবস্থা, কথা না বলে বেশ একটা উপকার আমার করে যাচ্ছে সে। ওমরের আসল গল্প তো আমিও জানি না! সুতরাং গল্প একবার যেটা বানিয়েছি সেটা চালিয়ে যাওয়াই ভাল। কোনও মিথ্যেকে নাকি অবিরাম প্রচার করলে

সেই মিথ্যেটাই এক সময় সত্য হয়ে ওঠে! ওমরকে হ্যাইজ্যাকাররা ধরেছিল গল্পটি তো একবার প্রচার করা হয়েছে। এখন আরেকবার করব আমি। এভাবে এই গল্পটিকে সত্য বানিয়ে ছাড়ব।

সাবাস, সাবাস!

মনে মনে নিজেকে দুটো সাবাস দিয়ে ওমরের মা-বাবার মুখের দিকে তাকাল যুবরাজ। বলল, আমার সঙ্গে ওমরের দেখা হয়েছে রাস্তায়। ওদিক দিয়েই মোটর সাইকেল চালিয়ে আসছিলাম আমি। হঠাৎ দেখি নির্জন রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে আছে একটা লোক। এমন জায়গায় পড়ে আছে, যখন তখন বাস ট্রাক চাপা দিতে পারে তাকে। দেখে আঁতকে উঠেছি আমি। মোটর সাইকেল থামিয়েছি রাস্তার পাশে। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে ছুটে গিয়ে লোকটাকে পাগলের মতো টেনে হেঁচড়ে এনেছি রাস্তার পাশে। মুখও দেখিনি লোকটার। সে কে, কেমন দেখতে, কী বৃত্তান্ত তার। তবে লোকটার তখন জ্ঞান ছিল না। পুরোপুরি অজ্ঞান সে। কেন ওরকম অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে সে! আর তার পরনে যেসব পোশাক, ওরকম একটি যুবক ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তোলে। বুঝলেন, তারপর যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়েছি আমি। তাকিয়ে চমকে উঠেছি। আরে এ যে ওমর! আমার বন্ধু। ও এখানে এল কেমন করে! কেমন করে অজ্ঞান হয়ে রাস্তার মাঝখানে পড়ে গেল! তখন দেখি ওমরের ঠোঁট কাটা। চোখে মুখে প্রচণ্ড মারের চিহ্ন। বুঝতে পারলাম কে বা কারা প্রচণ্ড মার মেরেছে ওমরকে। মেরে অজ্ঞান করে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখেছে। মুহূর্তে তাদের উদ্দেশ্যটাও বুঝতে পারলাম আমি।

এই অব্দি বলে যুবরাজ একটু থামল। তীক্ষ্ণ চোখে মা-বাবার মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে বুঝতে চাইল গল্পটা তার কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।

হয়েছে। খুবই বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে যুবরাজের গল্প। ওমরের মা-বাবার মুখের তীব্র উৎকণ্ঠা দেখে কনফার্ম হয়ে গেল যুবরাজ। এবং খুবই উৎসাহিত হয়ে আবার শুরু করল। যারাই করেছে কাজটা, উদ্দেশ্য খুবই খারাপ, খুবই ভয়াবহ ছিল তাদের। ওমরকে একেবারেই শেষ করে ফেলতে চেয়েছিল। এইজন্য রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখেছিল। যাতে কোনও বাস কিংবা ট্রাক...

যুবরাজের কথা শেষ হওয়ার আগেই হায় হায় করে উঠলেন মা। কী বলে! আমার ছেলের কে অমন শত্রু! কে ?

বাবা বললেন, তুমি অত উতলা হয়ো না। কথা শুনতে দাও। তারপর কী হলো ?

যুবরাজ কথা শুরু করার আগেই বাবা বললেন, আচ্ছা তোমার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি আমার।

এ কথায় যুবরাজ খুব মিষ্টি করে হাসল। আমার নাম যুবরাজ।

মা বললেন, তুমি ওমরের বন্ধু ? কিন্তু তোমাকে তো আমি কখনও দেখিনি!

আমি আপনাদের বাসায় কখনও যাইনি।

তারপর আন্দাজে আন্দাজে আরেকটা কথা বলল যুবরাজ। ওমরের তো প্রচুর বন্ধু বান্ধব! ওর মুখে আমার নাম নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন। তবে মনে রাখতে পারেননি। ভুলে গেছেন।

তাই হবে।

বাবা বললেন, তারপর কী হলো বলো তো!

যুবরাজ বলল, ওমরকে দেখে আমার তো একদম বুক শুকিয়ে গেল। হায় হায়, ওমরের এ রকম অবস্থা হলো কেমন করে! আশপাশে কোনও লোকজনও দেখছি না। কেমন করে যে কী করব! প্রথমে জ্ঞান ফেরানো দরকার ওমরের। তারপর কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু এই অবস্থায় একা কেমন করে আমি তা করব!

এখানে এসে গল্পটাকে আরেকটু ফিলমি করে ফেলল যুবরাজ। বলল, রাস্তার পাশেই বড়সড় একটা পুকুর ছিল। ছুটে গিয়ে সেই পুকুর থেকে রুমাল ভিজিয়ে আনলাম আমি। ওমর তখনও অজ্ঞান। আমার মোটর সাইকেলটার সামনেই ঘাসের ওপর শুইয়ে রেখেছি তাকে। তারপর ভেজা রুমাল চিপড়ে পানি বের করে ওমরের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলাম। তিনবারের বার গোঙিয়ে উঠল সে। চোখ মেলল। তখনও আমি কিন্তু জানি না কী হয়েছে ওমরের। বললাম, ওমর কষ্ট করে ওঠ। উঠে মোটর সাইকেলে আমার পেছনে বস। বসে শক্ত করে জড়িয়ে ধর আমাকে, আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব, দুবারের চেষ্টায়, অতি কষ্টে উঠল ওমর। তারপর আমার মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে ওমরকে আমি এখানে নিয়ে আসি, এখানে আসার পর ঘটনাটা জানতে পারি। ওমরই বলছে। সঙ্গে যা ছিল সব নিয়ে মেরে তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে হাইজ্যাকাররা।

মা বললেন, হাইজ্যাকাররা ধরে সব ছিনিয়ে টিনিয়ে নেয় শুনেছি। কিন্তু অমন করে মেরে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখে যায় এমন তো শুনিনি! ওমরের সব কিছুই তো ছিনিয়ে নিয়েছে ওরা, নাকি!

হ্যাঁ, সব নিয়েছে। গলার চেন মানিব্যাগ মোটর সাইকেল সব।

ঠিক তখুনি রিখু এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। চোখ তুলে, সেরকম মুগ্ধ দৃষ্টিতে রিখুর দিকে তাকাল যুবরাজ। তাকিয়ে রইল। রিখু কিন্তু যুবরাজের দিকে তাকাল না। সে তাকাল মা-বাবার মুখের দিকে। তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, মা, ভাইয়া তো মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করেনি।

বাবা বললেন, তুমি তা জানলে কেমন করে?

নিচে ভাইয়ার মোটর সাইকেলটা দেখে এলাম। মোটর সাইকেলের গায়ে তো কোনও আঁচড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অতবড় একটা অ্যাকসিডেন্ট করল ভাইয়া, নিজে অমন মারাত্মকভাবে আহত হলো আর মোটর সাইকেলের কিছুই হবে না, এটা কেমন কথা!

www.shopnil.com

রিখুর কথা শুনে যুবরাজ খুবই ভড়কে গেল। মুহূর্তে শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল তার। যা ধরা বুঝি যুবরাজ পড়েই গেল! এতক্ষণ যে হাইজ্যাকার নিয়ে বানোয়াট গল্পটা চালিয়ে গেল সেটা বুঝি মাঠে মারা গেল। হায় হায়, এখন কী হবে যুবরাজের!

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল যুবরাজ। মুহূর্তে বানাল আরেকটা গল্প। রিখুর চোখের খুব ভেতরে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে মিষ্টি মোলায়েম এবং আকর্ষণীয় পুরুষালি কণ্ঠে বলল, ওটা আমার মোটর সাইকেল। ওমর আর আমার মোটর সাইকেল একই রঙের, একই কোম্পানির। আমাদের হেলমেটের রঙও এক। আপনার ভাইয়ার মোটর সাইকেলটি হাইজ্যাকাররা নিয়ে গেছে। আপনার ভাইয়াকে হাইজ্যাকাররা ধরেছিল।

রিখু কোনও কথা বলতে পারল না। চোখ তুলে যুবরাজের দিকে তাকাল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অভ্যন্তরে শিরশিরে একটা কাঁপন টের পেল।

বাবা বললেন, আমাদের বাসায় কি তুমি টেলিফোন করেছিলে?

যুবরাজ কিছু না বুঝে বলল, জি।

কিন্তু টেলিফোনে যে তুমি বললে ওমর মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করেছে?

কথাটা শুনে যুবরাজ একদম হকচকিয়ে গেল। আরে তাই তো! ওমরের কাছ থেকে ওদের বাড়ির টেলিফোন নাম্বার নিয়ে আমিই তো ওদের বাড়িতে টেলিফোন করলাম। মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট।

একটু থেমে, আকাশের দিকে তাকিয়ে যুবরাজ আবার ভাবল, ঠিক আছে সেটা না হয় বলেছিই, তাহলে এখন আবার ডাক্তার নার্সদের কাছে বলা গল্পটা বলতে গেলাম কেন! আগের গল্পটা, মানে মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্টের গল্পটা চালিয়ে গেলেই তো পারতাম! আজ সব কিছু এমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে কেন আমার! কখনো তো এমন হয় না! কারণটা কী? কারণটা কি তাহলে ওমরের বোন রিখু! রিখুর দিকে তাকিয়ে থাকার ফলেই কি সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে আমার! আর রিখুর দিকে না তাকিয়েই বা কী করব আমি! রিখু যে কী সুন্দর! ফুলের মতো। চোখের সামনে অত সুন্দর একটি ফুল ফুটে থাকতে দেখলে কে না তাকাবে! কে না তাকিয়ে পারবে! আমি তো সামান্য এক মানুষ। রিখুর দিকে না তাকিয়ে আমি কেমন করে পারি!

বাবা বললেন, কিন্তু যুবরাজ টেলিফোনে তুমি তাহলে মিথ্যে বললে কেন আমাকে!

এবার আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকাল যুবরাজ। তাকিয়ে মুহূর্তে আরেকটি চালাকি করল। নিজের ভুলভ্রান্তি ম্যানেজ করল। সরল সাধারণ গলায় বলল, ওমরের তখন এরকম অবস্থা, দেখে আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, আমার মাথা একদম ঠিক ছিল না। টেলিফোনে অত ডিটেইল বলার মন মানসিকতা ছিল না। এইজন্য তাড়াতাড়ি বলে দিয়েছিলাম ওমর মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করেছে। মিথ্যে বলার জন্য আমি খুব দুঃখিত।

কথাগুলো বলেই মাথা নিচু করল যুবরাজ। যেন মিথ্যে বলার জন্য সত্যি সত্যি খুব লজ্জিত সে।

আর যুবরাজের মাথা নিচু করার ভঙ্গিটা এত সুন্দর, সেই ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল রিখু। মনে মনে বলল, যুবরাজ, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে! কোথায়! কেন আরও আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি! তাহলে তো, তাহলে তো...

ভাবনাটা শেষ হলো না রিখুর। তার আগেই মায়ামমতার কিংবা অসম্ভব কৃতজ্ঞতার একটা হাত যুবরাজের কাঁধে রাখলেন বাবা। না, তুমি কোনও অন্যায় করনি যুবরাজ। বন্ধুর ওরকম অবস্থা দেখে তুমি যা করেছ আমিও তাই করতাম। তোমার কাছে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। ওমরের লাইফ তুমি সেভ করেছ। তোমার কাছে কৃতজ্ঞতার কোনও সীমা পরিসীমা নেই আমাদের।

যুবরাজ লাজুক গলায় বলল, অমন করে বলবেন না। ওমর আমার বন্ধু। বন্ধুর জন্য আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আর কিছু না। আপনারা ওমরের মা-বাবা। আমারও মা-বাবার মতো। ছেলের কাছে মা-বাবার অমন কৃতজ্ঞ হওয়া খুবই বেমানান। ছেলেকে লজ্জা দেয়া হয়। আপনারা আমাকে লজ্জা দেবেন না।

যুবরাজের কথা শুনে রিখু তো বটেই মা-বাবাও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলতে পারলেন না। এইসব মুহূর্তে মানুষের মুখে কোনও ভাষা থাকে না। ভাষা বোধহয় শোভাও পায় না।

ঘুমের ভেতর থেকে মুনার মনে হলো মৃদু শব্দে তার দরজায় যেন নক করছে কেউ। একবার, দুবার। তারপর ঘুমটা ভেঙে গেল মুনার। চোখ মেলে সরাসরি তার রুমের ডান দিককার দেয়ালটা দেখতে পেল মুনা। কফি কালারের দেয়ালে মাইকেল জ্যাকসানের বিশাল একটা পোস্টার। হাতে মাইক্রোফোন, নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল জ্যাকসান। এই পোস্টারটা মুনার খুব প্রিয়। দিনে যতবার চান্স পায় পোস্টারটার দিকে তাকিয়ে দেখে সে। দেখে মুগ্ধ হয়। আজ সকালে বিছানায় শুয়ে পোস্টারটার দিকে খানিক তাকিয়ে মাইকেল জ্যাকসানকে এই প্রথমবারের মতো ভাল লাগল না মুনার। হঠাৎ করে কেন যে তার মনে হলো মাইকেল জ্যাকসানের চেহারায় কোনও পৌরুষ নেই। একদম মেয়েলি ধরনের চেহারা। এরকম চেহারার পুরুষ কোনও মেয়েই পছন্দ করতে পারে না। দেয়ালের দিক থেকে, মাইকেল জ্যাকসানের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল মুনা। ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যি সত্যি দরজায় কেউ নক করল মুনার। শব্দটা শুনে মুনা খুব চমকে উঠল। মুহূর্তে তার মনে পড়ল খানিক আগে ঘুমের অনেক ভেতর থেকে দরজায় নক করার এরকম একটা শব্দ মুনা পেয়েছে। পরপর দুবার। এবং সেই শব্দেই ঘুমটা তার ভেঙেছে। কিন্তু ঘুম ভাঙার পর, দরজায় দাঁড়িয়ে কেউ নক করছে এই কথাটা কেমন করে ভুলে গেল মুনা! কেন ভুলে গেল! আর মাইকেল জ্যাকসানের পোস্টারটাই বা আজ সকালে কেন ভাল লাগল না মুনার!

www.shopnil.com

টুকটুক করে আবার নক হলো দরজায়। এবার লাফিয়ে উঠল মুনা। তারপর ছুটে গিয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজা না খুলে ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে?

বাইরে থেকে মেয়েলি গলায় শব্দ এল। আমি।

গলাটা খুবই চেনা চেনা লাগল মুনার। যেন বহুবার শুনেছে এই গলা, এই স্বর।

গলাটা কার! স্বরটা কার! কয়েক মুহূর্ত ভেবেও গলাটা চিনতে পারল না মুনা। রুমের ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, আমি কে?

মুনার এই প্রশ্ন শুনে দরজার বাইরে দাঁড়ানো মানুষটি খুবই অবাক হলো। তার গলায় আওয়াজে তা বুঝা গেল। বেশ একটা বিস্ময়ের সঙ্গে সে বলল, আপা, আমি রোকেয়া। আপনে আমাকে চিনতাছেন না! এবার ভেতরে ভেতরে খুবই শীতল হয়ে গেল মুনা। আশ্চর্য ব্যাপার! বছর চারেক ধরে রোকেয়া নামের মেয়েটি তাদের বাসায় আছে। বলতে গেলে মেয়েটিকে রাখাই হয়েছে মুনার জন্য। সারাক্ষণ মুনার তদারকে ব্যস্ত থাকে সে। দিনে কমপক্ষে এক দুশোবার রোকেয়ার গলা শোনে মুনা। আর সেই রোকেয়ার গলা আজ চিনতে পারছে না মুনা! ব্যাপার কী! মুনার আজ কী হয়েছে! ঘুম ভাঙার পর থেকে সব কিছু আজ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন তার! তখন আর একটা ভুল করল মুনা। দরজা না খুলে ভেতর থেকেই জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে রোকেয়া? ডাকছিস কেন?

মুনার একথায় বেশ অবাক হলো রোকেয়া। মৃদু হেসে বলল, আপনেরে তো রোজ বিয়ানেই ডাকি আমি। কেন ডাকি আপনে আইজ ভুইলা গেলেন নাকি!

সঙ্গে সঙ্গে মুনার মনে পড়ল প্রতিদিন ভোরে রোকেয়া এসে ঘুম ভাঙায় তার। জগিংস্যুট পরে পাপা তখন নিচের লনে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুনার জন্য অপেক্ষা করেন। রোকেয়া ডেকে জাগিয়ে দেয়ার পরপরই দ্রুত জগিংস্যুটটা পরে, কেডসটা পরে লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে যায় মুনা। তারপর পাপার সঙ্গে জগিংয়ে বেরোয়। এটা তো প্রতিদিনকার ঘটনা। তাহলে আজ এসব কেমন করে ভুলে বসে আছে মুনা!

নিজের ভুলো মন দেখে, আবোল-তাবোল কাজ কারবার দেখে, বন্ধ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ভাবল মুনা। কেন, আজ এমন হচ্ছে কেন আমার! প্রতিদিন ভোরবেলায় ঘটা ঘটনাগুলো আজ সকালে কেমন করে ভুলে গেলাম আমি! রোকেয়ার নক শুনেও কেন বুঝতে পারলাম না নকটা কে করছে, কেন করছে! বোকার মতো কেন প্রশ্ন করতে গেলাম! আর প্রশ্ন করেও রোকেয়ার গলা শুনেও রোকেয়াকে কেন চিনতে পারলাম না আমি! রোকেয়া কেন আমাকে ডাকছে, কেন বুঝতে পারলাম না! আমার তো এত ভুলো মন নয়! আজ কেন সব কিছু এমন ওলট পালট হচ্ছে আমার। কেন মনে হচ্ছে অচেনা একটা ঘোরের মধ্যেই আজ সকালে ঘুম ভেঙেছে আমার। ঘুম ভাঙার পরও, অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পরও সেই ঘোরটা কেন ভাঙছে না আমার। কেন এমন হচ্ছে! এতটা বয়স হলো, কই, কখনও তো এমন হয়নি আমার!

দরজার বাইরে থেকে রোকেয়া বলল, আপা কী হইল আপনের ? সাহেব তো অনেকক্ষণ ধইরা খাড়াইয়া রইছে।

তুই গিয়ে পাপাকে বল, আমি আজ যাব না!

যদি জিগায় কেন যাইবেন না, তাইলে কী কমু!

মুনার প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল, গিয়ে বল আমার শরীর খারাপ। কিন্তু কথাটা সে বলল না। শরীর খারাপের কথা শুনলে জগিংয়ে না গিয়ে সোজা দোতলায় এসে উঠবেন পাপা। মোটা শরীরে হাঁসফাঁস করতে করতে তার রুম থেকে বেরুবেন মা। তারপর হাজারও প্রশ্ন। শরীর খারাপ মানে! কী, হয়েছে কী! প্রবলেমটা খুলে বল। ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েনম্যান্ট করি। উহ্ সে আরেক ঝামেলা। এমনিতেই মামণি কাল দেখেছেন অন্ধকার বারান্দায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে একা একা কথা বলছে মুনা। সেই নিয়ে পরে হাজারও প্রশ্ন করেছেন। এবং বলছেন রাতেই ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েনম্যান্ট করে রাখবেন সকালে মুনাকে নিয়ে যাবেন ডাক্তারের কাছে। একা একা কথা বলার লক্ষণটা নাকি ভাল নয়। এই মুহূর্তে মামণির কথাটা ভেবে হেসে ফেলল মুনা। মনে মনে বলল, কথা তো আমি আসলে একা একা বলি না মামণি। এতকাল বলতাম আমার কল্পনার প্রেমিকের সঙ্গে। কাল সন্ধ্যায় প্রথম সেই কল্পনার প্রেমিকটি বাস্তবরূপে দেখা দিল। সুতরাং কী রকম একটা ঘোরের মধ্যে কাল সন্ধ্যায় আমি ছিলাম তুমি একবার ভেবে দেখ তো! কথা আমি তার সঙ্গেই বলছিলাম কাল। আমার প্রেমিকের সঙ্গে! ওমরের সঙ্গে। ওমরের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতরটা হঠাৎ কী রকম একটা মোচড় দিয়ে উঠল মুনার। ওমর এখন কোথায় আছে! কেমন আছে! কাল কি সে বাড়ি ফিরতে পারছিল, না কোনও হাসপাতালে! ওখান থেকে তুলে নিয়ে কেউ কি তাকে পৌঁছে দিয়েছিল হাসপাতালে! নাকি অন্য কিছু!

রোকেয়া বলল, কী অইল আপা ? কইলেন না কী কমু ?

এক মুহূর্তে কী ভেবে মুনা তারপর বলল, পাপাকে গিয়ে বল রাতে আমার একদম ঘুম হয়নি। আমি এখন ঘুমুব। উঠতে দেরি হবে আমার।

রোকেয়া চলে যাওয়ার পর আবার ওমরের কথা মনে পড়ল মুনার। ওমর এখন কোথায় আছে! কেমন আছে! ওমরের কথা ভাবতে ভাবতে আনমনে তারপর দরজাটা খুলে ফেলল মুনা। খুলে বারান্দার রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল। তখন ঝট করে মুনার মনে পড়ল, আরে এ আমি কী করছি! এইমাত্র রোকেয়াকে বললাম পাপাকে গিয়ে বল, রাতে আমার ঘুম হয়নি। আমি এখন ঘুমুব। উঠতে দেরি হবে। রোকেয়া তো মনে হয় এখনও নিচে গিয়ে পৌঁছয়নি। এখনও হয়তো পাপাকে কথাটা বলতে পারেনি। এই মুহূর্তে পাপা তো নিশ্চয় আমার অপেক্ষায় লনে পায়চারী করছে। নিশ্চয় ঘন ঘন তাকাচ্ছে দোতলার রেলিংয়ের দিকে। এই মুহূর্তে আমি যদি রেলিংয়ের দিকে দাঁড়াই আর ওদিকে রোকেয়া গিয়ে যদি আমার বলে দেয়া কথাগুলো পাপাকে বলে, ছি, খুবই জঘন্য একটা ব্যাপার হবে তাহলে। পাপা কী ভাববে আমাকে!

মুনা আর বারান্দার রেলিংয়ে গিয়ে দাঁড়াল না। নিজের রুমের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তখনও রোদ উঠতে বেশ দেরি। কাচের মতো স্বচ্ছ নীল আকাশ গোল হয়ে নেমেছে পৃথিবীর ওপর। মন খারাপ করা একটা আলো ফুটে আছে আমার চারদিকে। আর আছে ঝিরঝিরে একটি হাওয়া। অবিরাম বয়ে যাচ্ছে।

মুনাদের বাগানে তখন ফুটেছিল অজস্র ফুল। ভোরবেলার মৃদু মনোরম হাওয়ায় ফুলেরা সব আমুদে বিলিয়ে দিচ্ছিল তাদের হৃদয় আকুল করা সৌরভ। সারাটা বাড়ি ম ম করছিল ফুলের সৌরভে। বাগানের দিকে গলা ছেড়ে ডাকছিল একটি দোয়েল। ফুলের সৌরভের সঙ্গে মিলেমিশে দোয়েলের ডাকটাও ভেসে আসছিল হাওয়ায়। এ রকম পরিবেশে মন ভাল হয়ে যাওয়ার কথা মানুষের। পৃথিবীতে বহুকাল বেঁচে থাকবার সাধ হওয়ার কথা। কিন্তু মুনার মন ভাল হলো না। মুনার মনে পড়ল ওমরের কথা। আর ওমরের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনা দেখতে পেল তার চোখের সামনে, বারান্দার রেলিংয়ের ওপর দিয়ে তাকালেই যে আকাশটা দেখা যায়, সেই স্বচ্ছ নীল এক টুকরো আকাশ মুহূর্তে ছেয়ে গেল কালো মেঘে। মন খারাপ করা যে বিষণ্ন আলোটা ফুটেছিল চারদিকে সেই আলোটা গেল আরও বিষণ্ন হয়ে। আরও মন খারাপ করে ফুটে উঠল আলোটা। অবিরাম বয়ে যাওয়া ঝিরঝিরে হাওয়াটা গেল বন্ধ হয়ে। মুনাদের বাগানে ফুটে থাকা যাবতীয় ফুল মুহূর্তেই ম্লান হয়ে গেল। শুকিয়ে গেল। কোথায় যে মিলিয়ে গেল তাদের মিষ্টি মনোহর সৌরভ। হৃদয় আকুল করা সুবাস। ফুলের গন্ধে ম ম করতে থাকা বাড়িটা কী রকম ভ্যাপসা এক গন্ধে ভরে গেল। বাগানের দিকে গলা খুলে আমুদ আহ্লাদে ডাকতে থাকা দোয়েল পাখিটা ডাক থামিয়ে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করল। তারপর নষ্ট আলোটা ডানায় ভেঙে মন খারাপ করে উড়ে গেল অন্য কোনও দিকে। এসবই ঘটল মুনার মনের কারণে। ওমরের কথা ভেবে তার মন খারাপ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের পৃথিবীতে ঘটতে থাকা প্রতিটি সুন্দর কর্মকাণ্ড থেমে গেল। অসুন্দরে ভরে গেল চারদিক। কেন এমন হলো মুনার। এ রকম সুন্দর একটা ভোরবেলা কেন ওমরের কথা ভেবে নষ্ট হয়ে যাবে! মন তো আসলে ভাল হয়ে যাওয়ার কথা মুনার! কারণ কাল সন্ধ্যায় জীবনে প্রথমবারের মতো কল্পনার দেয়াল ভেঙে মুনার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার প্রেমিক। এই প্রথমে প্রেমিককে চিনতে পারল মুনা। সে ওমর। ওমর। সুতরাং কাল সন্ধ্যের পর থেকে মুনার মন ছিল খুব ভাল। ফুরফুরে, আমুদে। যেন মনের ভেতর মুনার একসঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছিল আঠারো হাজার প্রজাপতি। চোখ জুড়ে ছিল ওমর। শরীর জুড়ে ছিল অনির্বচনীয় সুখের এক কাঁপন। এই সব কিছুই প্রেমিকের জন্য। ওমরের জন্য।

রাতেরবেলা কাল অনেকক্ষণ জেগে ছিল মুনা। ডিম লাইটের মৃদু আলো-আঁধারিতে নিজের বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে পড়েছিল। কিন্তু ঘুমায়নি। অনেকক্ষণ ঘুমায়নি। যদিও অন্য কেউ মুনাকে তখন দেখলে ভাবত গভীর ঘুমে ডুবে আছে যুবতী। এবং ঘুমিয়ে হয়তো দেখছে মিষ্টি মজাদার কোনও স্বপ্ন। আর ওরকম কোনও

www.shopnil.com

স্বপ্ন দেখছে বলেই মুখটা অমন হাসি হাসি হয়ে আছে তার। অবিস্মরণীয় এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য ফেটে পড়ছে চেহারায়। কিন্তু মুনা তখনও ঘুমায়নি। চোখ বুজে পড়ে আছে। তবে মিষ্টি মজাদার একটি স্বপ্ন কিন্তু ঠিকঠিকই দেখছিল মুনা। সে স্বপ্ন মুনার প্রেমিকের স্বপ্ন। ওমরের স্বপ্ন। জেগে জেগেও তো স্বপ্ন দেখতে পারে মানুষ! চোখ বুজে, দীর্ঘক্ষণ জেগে জেগে ওমরের স্বপ্ন কাল রাতে দেখেছিল মুনা। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে চোখ জুড়ে ওমরকে দেখতে দেখতে মুনা এক সময় বলেছিল, ওমর, প্রিয়তম ওমর, আজ সারারাত আমার চোখ জুড়ে থাকবে তুমি। কেবল তুমি। আমার যাবতীয় স্বপ্ন জুড়ে থাকবে তুমি। আজ রাতে মুহূর্তের জন্যও আমাকে তুমি ছেড়ে যেয়ো না। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বার পর মুহূর্তের জন্যও মুনার চোখ জুড়ে আসেনি ওমর। স্বপ্ন জুড়ে আসেনি। কেন যে ঘুমের ভেতর সারাক্ষণ ওমরের স্বপ্নের জন্য অপেক্ষা করেছে মুনা! অপেক্ষা করতে করতে সকাল হয়ে গেছে। দরজায় এসে নক করেছে রোকেয়া।

তাহলে ওমরকে কালরাতে স্বপ্নে দেখেনি বলে কি ভোরবেলা সব কিছু এরকম ওলট পালট হয়ে গেল মুনার! অচেনা হয়ে গেল! আর এজন্যই কি মুনার এখন মন খারাপ! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুনা মনে মনে বলল, ওমর, প্রিয়তম ওমর, কালরাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে এত করে তোমাকে আমি বললাম সারারাত তুমি আমার চোখ জুড়ে থাকবে, স্বপ্ন জুড়ে থাকবে, থাকলে না কেন? আমার ওপর রাগ? অভিমান? প্রিয়তম, দেখো, দেখা হলে মুহূর্তেই তোমার যাবতীয় রাগ আমি ভাঙিয়ে দেব। অভিমান ভাঙিয়ে দেব। এমন ব্যবস্থা করব জীবনের কখনও তুমি আমার ওপর আর রাগ করতে পারবে না।

মনে মনে ওমরের সঙ্গে এসব কথা বলতে বলতে, সিঁড়ি ভেঙে কখন যে নিচে নেমে এসেছে মুনা, খেয়াল করেনি। কখন যে আনমনে এসে ঢুকেছে বাগানে, খেয়াল করেনি। এই পোশাকে বাগানে আসা তো দূরের কথা, নিজের রুম থেকে বেরুলেও দোতলা থেকে কখনও নামত না মুনা। মুনার পরনে ছিল গোলাপি রঙের না-পাতলা না-মোটা এরকম কাপড়ের ঢিলেঢালা একটা নাইটি। নাইটির তলায় কোথাও কিছু নেই। এমন কি মুনার পা-ও খালি। এরকম অবস্থায় জীবনে কখনও দোতলা থেকে নামেনি মুনা। আজ নামল। কেন যে! কিন্তু মুনা যে বাগানে এল কেউ তাকে দেখতে পেল না। ঝি চাকর, দারোয়ান মালি কেউ না। লোকগুলোর কোনটা যে কোথায় আছে কে জানে! বুঝি এই কারণেই বাগানে এসে নিজের পোশাক এবং খালি পা নিয়ে ভাবল না মুনা। ভাবল ওমরের কথা। ওমর এখন কোথায় আছে? বাড়িতে না হাসপাতালে! ওমর এখন কেমন আছে? ভাল না খারাপ!

ওমরের কথা ভাবতে ভাবতে আস্তে ধীরে বাগানের ভেতরদিকে চলে এল মুনা। যেখানে এল সেখানে মুনার চারদিকে কেবল গোলাপ, গোলাপ। থরে বিথরে ফুটে আছে সব গোলাপ। লাল সাদা গোলাপি হলুদ। আর সেই গোলাপের পাগল করা গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে আছে জায়গাটা। জায়গাটার বাতাস। গোলাপের দিকে তাকিয়ে,

www.shopnil.com

গোলাপের গন্ধে মুহূর্তেই মনটা ভাল হয়ে গেল মুনার। লাল গোলাপের বিশাল একটা ঝাড়ের সামনে কিশোরীর মতো চপল পায়ে ছুটে গেল সে। সেই ঝাড়ে শরীরে শরীর লাগিয়ে ফুটেছিল অনেকগুলো গোলাপ। প্রেমিকের মতো দুহাতে ফুলগুলো বুকে জড়িয়ে ধরল মুনা। ধরে ফিসফিস করে বলল, ওমর, প্রিয়তম ওমর, তোমার সঙ্গে আমার যেদিন দেখা হবে সেদিন এরকম অনেকগুলো ফুল তোমার পায়ে নিবেদনের ভঙ্গিতে রাখব আমি। রেখে বলব, প্রিয়তম এই তো আমি! আমাকে তুমি নাও।

ভোরবেলা প্রথম কথা বলল ওমর। মামণি, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

পাশের বেডে কাত হয়ে শুয়ে আছেন মা। রুমে তখনও জ্বলছে হালকা সবুজ একটা ডিম লাইট। বাইরে দ্রুত ফুটে উঠেছিল ভোরবেলার আলো। নার্সিংহোমের প্রতিটি রুমের জানালায় আছে মোটা কাপড়ের ভারি সুন্দর পর্দা। বড়লোক বাড়ির দরজা জানালায় যে ধরনের দামি পর্দা ব্যবহার করা হয়, পর্দাগুলো সেরকম। পর্দা দেখে, ডিসটেম্পার করা রুম দেখে, বেড এবং বেডের কাভার দেখে বোঝায় যায় এই নার্সিংহোমটি নতুন হয়েছে। এখনও তেমন একটা জমে ওঠেনি। গুড উইল তৈরির চেষ্টা নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। এই কারণে এখনও রুমগুলো, রুমের পর্দা বেড বাথরুম ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর আছে। একবার গুড উইল তৈরি হয়ে গেলে, নার্সিংহোম জমে গেল এইসব জিনিসের দিকে একদমই মনোযোগ দেবে না কর্তৃপক্ষ। তখন মনোযোগ দেবে কেবল টাকা পয়সার দিকে। বাঙালি ব্যবসায়ীরা তো! ব্যবসা একবার জমে গেলে টাকা ছাড়া ব্যবসা ধরে রাখার অন্যান্য যাবতীয় অনুসঙ্গই তুচ্ছ হয়ে যায় তাদের কাছে। চরিত্র!

প্রথমবার ওমরের কথাটা শুনতে পেলেন না মা। সারারাত ঠায় জেগে ছিলেন তিনি। ওমরের মাথার কাছে বসে ছিলেন। বাবা আর রিখু বাড়ি চলে গেল সাড়ে এগারোটার দিকে। প্রায় ওদের সঙ্গেই গেল যুবরাজ নামের ছেলেটি। তারপর থেকে রুমে কেবল মা আর ওমর।

বাড়ি চলে যাওয়ার আগে ওমরের খাবার আনার জন্য নিচে নামতে চেয়েছিলেন বাবা। যুবরাজ ছেলেটি সামনে ছিল, সে বলল, আপনি যাবেন কেন! কী কী আনতে হবে বলুন, আমি যাচ্ছি।

বাবা একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে দিলেন। মা বললেন, কয়েক রকমের ফল আনবে, হরলিকস পাউরুটি আনবে, বিসকিট আনবে।

যুবরাজ কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তারপরও বেরুতে হয়েছিল বাবাকে। মার হঠাৎ মনে পড়েছিল রাতে ওমরকে যদি হরলিকস খাওয়াতে হয়, পানি গরম রাখার জন্য কোনও ব্যবস্থা তো রুমে নেই। কী করা যাবে!

বাবা বেরিয়ে গিয়ে বেশ দামি একটা ফ্লাস্ক কিনে আনলেন। ছোট একটা হিটার কিনে আনলেন। আর আনলেন এলুমিনিয়ামের একটা সসপেন। দেখে মা খুব খুশি হয়ে গেলেন।

বাবা আসার খানিকক্ষণ পরেই এসেছিল যুবরাজ। তার হাতে নীল রঙের দুটো শপিংব্যাগ। একটায় আছে অনেকগুলো পোঁটলা। আরেকটায় ডজনখানেক মোটা তাজা শবরি কলার একটা কাঁদি, একটা হরলিকসের বয়াম, দুটো বিসকিটের প্যাকেট আর পাউন্ডখানেক হবে একটা পাউরুটি।

যুবরাজকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল বেশ খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে তাকে। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় আসতে আসতে ঘেমে গিয়েছিল যুবরাজ। রুমে তখন বিনবিন করে চলছে এয়ার কুলার। বেশ ঠাণ্ডা, বেশ মোলায়েম এবং আরামদায়ক একটা ভাব রুমে। যুবরাজের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল রুমে ঢুকে ভারি একটা স্বস্তি বোধ করছে সে।

মা আর রিখু মিলে তখন শপিংব্যাগ থেকে জিনিসপত্রগুলো বের করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখছিল। আঙুর আপেল নাসপাতি বেদানা কলা হরলিকস রুটি বিসকিট। দেখতে দেখতে টেবিলটা প্রায় ভরে গেল। একবার টেবিলটার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে যুবরাজের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন মা। হ্যাঁ, যা যা চেয়েছি তার সবই এনেছ।

মার কথা শুনে যুবরাজ খুবই খুশি হয়ে গিয়েছিল। মৃদু হেসে মাথা নিচু করেছিল সে। তারপর বাবার দেয়া পাঁচশো টাকার বাকিটা পকেট থেকে বের করে দিয়েছিল বাবার হাতে। খুবই বিনীত গলায় বলেছিল, আপনারা বাড়ি যান। আমিই না হয় ওমরের কাছে থাকি।

যুবরাজের কথা শুনে মা-বাবা দুজনই খুব মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গভীর মায়া মমতায় কিংবা প্রচণ্ড কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দুজনই তাঁরা তাকিয়ে ছিলেন যুবরাজের দিকে। এবং প্রায় একসঙ্গেই কথা বলতে চাইলেন দুজনে পরে মা থেমে গেলেন।

কথা বললেন বাবা। না, তার আর দরকার হবে না। তোমার খালাম্মাই তো থাকছেন। তুমি এমনিতেই যা করেছ তার কোনও তুলনা হয় না। যাও, এখন বাড়ি যাও। নিশ্চয় তুমি খুব টায়ার্ড হয়ে আছ। বিকেল থেকে তো আর কম ধকল গেল না তোমার ওপর দিয়ে। কাল দিনেরবেলা আবার এস। তখন দেখা হবে।

কিন্তু তারপরও যায়নি যুবরাজ। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে কী যেন ভাবল। মুখে ভারি একটা চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছিল তার।

যুবরাজ গেল বাবা এবং রিখু চলে যাওয়ার পর। যাওয়ার আগে খুবই বিনীত গলায় মাকে বলল, আপনার কি আর কিছু প্রয়োজন আছে?

মা হাসি হাসি মুখে বললেন, না।

তাহলে যাই আমি।

এস।

তারপর টেবিলের ওপর থেকে নিজের ব্যাগটা নিল যুবরাজ। হেলমেটটা নিল। এবং খুবই বিনীত ভঙ্গিতে মাকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে গেল। যুবরাজ বেরিয়ে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন কেন যে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল তার। মানুষের যে কখন কী কারণে দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কেউ জানে না।

তারপর ওমরের মাথার কাছে এসে বসেছেন মা। আগের মতোই চোখ বুজে পড়েছিল ওমর। ওমরের মাথায় হাত রেখে আস্তে করে ডেকেছিলেন মা। ওমর, ওমর!

ওমরের কোনও সাড়া নেই।

ছেলের মাথায় হাত বুলাতে মা বললেন, কিছু খাবি না বাবা? দুপুরের পর থেকে তো নিশ্চয় কিছু খাসনি। এত রাত হলো, না খেলে তো শরীর আরো দুর্বল হয়ে যাবে!

কিন্তু ওমরের কোনও সাড়া নেই।

মা ভাবলেন, ওমর বুঝি ঘুমিয়ে গেছে। তারপর উঠে প্রথম ডিমলাইটটা জ্বাললেন তিনি। তারপর বিকেল থেকে জ্বলা উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে আবার এসে বসলেন ওমরের মাথার কাছে। আস্তে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ওমরের মাথায়।

এইভাবে কতক্ষণ যে কেটে গেছে, খেয়াল ছিল না মার। ওমর তখন সত্যি সত্যি গভীর ঘুমে, তারপর এক সময় রুমের অন্য বেডটায় এসে কাত হয়েছেন মা। কিন্তু ঘুম আসেনি তাঁর। একটু তন্দ্রামতো এসেছিল, তখুনি ওমরের ডাক। মামণি, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

ধড়ফড় করে উঠছেন মা। ছুটে গেছেন ওমরের বেডের সামনে। মাথায় হাত রেখে বলেছেন, কী খাবি বাবা?

চা দাও।

এখানে চা পাব কোথায়? চায়ের ব্যবস্থা তো করা হয়নি। তাছাড়া তুই এখন চা খাবি কেন? কাল দুপুরের পর থেকে তো কিছু খাসনি! রাতে এত করে বললাম কোনও সাড়াই তো দিলি না! এখন অন্য কিছু খা। ফল-টল আছে, রুটি বিসকিট কলা আছে। হরলিকস আছে। কী খাবি বল?

ওমর কোনও কথা বলল না।

মা বললেন, আগে রুটি আর কলা খা। তারপর হরলিকস খা। দিই?

ওমর খুবই নিচু গলায় বলল, দাও।

তারপর আস্তে ধীরে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো বিছানায় উঠে বসল ওমর।

মা বললেন, কী হলো, উঠছিস কেন?

বাথরুমে যাব।

দাঁড়া দাঁড়া আমি ধরছি। একা উঠতে পারবি নাকি!

পারব।

না না। পড়ে টড়ে গেলে!

www.shopnil.com

ওমর গম্ভীর গলায় বলল, পড়ব না।

তারপর বিছানা থেকে নেমে সুস্থ মানুষের মতো বাথরুমে গিয়ে ঢুকল ওমর।

ততক্ষণে ওমরের জন্য কলা রুটি একটা কোয়ার্টার প্লেটে সাজিয়ে সসপেনে পানি নিয়ে হিটারের প্লাক লাগিয়ে সেই পানি গরম করতে শুরু করেছেন মা। কাজটা করতে বেশ লাগছে তাঁর। মনে হচ্ছে বহুকাল পর আবার সংসার কর্ম শুরু করেছেন তিনি। যেন অনেককাল এসব থেকে দূরে সরে ছিলেন। আবার নতুন করে শুরু করলেন জীবন।

আসলেই তো বহুকাল, বহুকাল নিজের সংসারের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেননি তিনি। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর গিয়ে ঢুকেছেন স্টাডিরুমে। একটানা দীর্ঘক্ষণ পড়ার পর কেউ এসে ডেকে নিয়েছে নাশতার টেবিলে। নাশতা খেয়ে আবার এসে ঢুকেছেন সেই রুমে তারপর আবার পড়া। দুপুরের মুখে মুখে উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছেন। গোসল ইত্যাদি সেরে গেছেন খাবার টেবিলে। সেখানে তখন হয়তো খাবার নিয়ে বসে আছেন বাবা। রিখু আছে, ওমর আছে। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার গিয়ে ঢুকেছেন স্টাডিরুমে। গা এলিয়ে দিয়েছেন ইজি চেয়ারে। চোখের সামনে খুলে ধরেছেন কোনও বই। পড়তে পড়তে হয়তো ঘুমিয়েই গেছেন। ঘুম থেকে উঠেছেন বিকেলে। তারপর সেখানে বসেই বিকেলের চা খেয়েছেন। চা খেতে খেতেও পড়েছেন। এইভাবে রাত এগারোটা, বারোটা। অত সুন্দর, অত বড় একটা পরিবারের মধ্যে থেকেও, স্বামী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থেকেও জীবনটাকে একটি রুম এবং বইয়ের ভেতর সীমাবদ্ধ করে তুলেছিলেন তিনি। সেই সীমাবদ্ধ জীবনে বহুকাল বাদে এল আলাদা একটু স্বাদ। আলাদা একটা ভাললাগা।

ওমরের জন্য হরলিকস বানাতে বানাতে এসব ভাবছিলেন মা। এইসব টুকটাক কাজ করতে খুবই ভাল লাগছিল তার। মনে হচ্ছিল আবার প্রথম জীবনে ফিরে গেছেন তিনি। যেন সদ্য বিয়ে হয়েছে তার। সদ্য এসেছেন স্বামীর সংসার করতে। সংসারে আর কোনও মানুষ নেই তাদের। তিনি আর স্বামী দুজন মাত্র মানুষ। দুরুমের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট। তখন মাত্র বিজনেসটা শুরু করেছেন স্বামী। কিন্তু তেমন জমে ওঠেনি বিজনেস। সকাল থেকে রাত নটা দশটা অব্দি একটানা ছুটোছুটি করেন ভদ্রলোক। খাটতে খাটতে মুখ দিয়ে অবিরাম লাঙল টানা বলদের মতো ফেনা উঠে যায়। টাইমলি খেতে আসতে পারেন না, পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে যেতে পারেন না। ব্যবসা দাঁড় করাবার জন্য ছোটেন। কেবল ছোটেন। আর অন্যদিকে ভদ্রমহিলা একাকী দুরুমের ফ্ল্যাট আগলে বেড়ান। সংসারের যাবতীয় কাজ করেন একা। কাজের লোক রাখার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু তবুও একাকী সংসারের যাবতীয় কাজ করার পরও হাতে থেকে যেত অঢেল সময়। সেই সময়টা আর কাটতে চাইত না। কিছুতেই কাটতে চাইত না। এই সময় কাটাবার জন্যই বই পড়া শুরু করেছিলেন তিনি। প্রথম প্রথম ভদ্রলোক নিজেই পত্রপত্রিকা এবং বই-টই এনে দিতেন। ফেরার সময় প্রায় প্রতিরাতেই তাঁর হাতে থাকত দু একটা বই কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকা।

www.shopnil.com

তারপর ভদ্রলোকের ব্যস্ততা বাড়ল, বিজনেস জমে গেল, বড় হয়ে গেল, তিনি ওসব সামান্য বইপত্রের দিকে আর মনোযোগ দিতে পারছিলেন না।

তখন থেকে নিজেই নিজের পছন্দমতো বইপত্র কিনতে শুরু করেছিলেন ভদ্রমহিলা। প্রায় প্রতিদিনই বাইরে বেরোন। প্রতিদিনই কেনেন বই। দিন যত গেল অস্থি মজ্জায় ভয়াবহ রোগের মতো ঢুকে পড়ল বই পড়ার নেশা। সংসারে ছেলেমেয়ে এল। তারা বড় হলো। ভদ্রলোক ব্যবসা করে টাকার কুমির হয়ে উঠলেন। গাড়ি বাড়ি চাকর বাকর মালি ড্রাইভার সব মিলে মিশে বিশাল এক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল সংসারটা। কিন্তু ভদ্রমহিলা এসবের দিকে আর মনোযোগ দিতে পারলেন না। ফিরে তাকাতে পারলেন না। একটি মাত্র ঘরে, অজস্র বইয়ের সঙ্গে নিজের প্রায় চব্বিশ ঘন্টার সময়, মাস বছর এবং নিয়তিকে জড়িয়ে নিলেন তিনি। দিন যাচ্ছিল এভাবেই। গতকাল ঘটে যাওয়া ছেলের অ্যাকসিডেন্ট এবং হাসপাতালে ছেলের সঙ্গে রাত্রিবাস এবং ছেলের জন্য টুকটাক কাজকর্মের ফাঁকে কখন যেন তিনি ফিরে পেলেন তাঁর একদা হারিয়ে যাওয়া সুন্দর একটি জীবনকে। স্ত্রী কিংবা মায়ের কাছে, সর্বোপরি যে কোনও নারীর কাছে যে জীবন সব চাইতে আকাঙ্ক্ষার, সেরকম জীবন এক জীবনেই দুবার যেন পেলেন তিনি। একবার হারিয়ে ফেলেছিলেন জীবনটি কিন্তু এবার আর হারাবেন না। কিছুতেই না।

বাথরুম থেকে ফিরে ওমর দেখে মায়ের চেহারায় অদ্ভুত এক দ্যুতি খেলা করছে। বালিকার মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাঁকে। চটপটে দেখাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে খুশিতে যেন ফেটে পড়ছেন মা। দেখে ওমর খুবই অবাক হলো। মার এরকম উজ্জ্বল চেহারা সে কখনও দেখেনি। বরাবরই মাকে দেখেছে গম্ভীর, কম কথা বলেন। বই ছাড়া অন্য কোনও দিকে খুব একটা তাকিয়ে দেখেন না। সংসারের কোথায় কী হলো না হলো ভুলেও ওসবের কোনও খোঁজ খবর রাখেন না। আত্মীয় স্বজনে বাড়ি যান না, কোনও অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে এটেন করেন না। সেই মায়ের এমন পরিবর্তন হলো কেমন করে! ওমরের হলো অ্যাকসিডেন্ট আর তার ফলে মার চেহারা গেল অন্য রকম হয়ে, চরিত্র গেল অন্যরকম হয়ে! অদ্ভুত ব্যাপার তো!

ততক্ষণে ওমরের জন্য খাবার রেডি করে ফেলেছেন মা। কোয়ার্টার প্লেটে রুটি কলা এসব দেখেছেন। পানি ফুটিয়ে চটপটে হাতে গ্লাসে বানিয়েছেন হরলিকস।

মাকে এসব কাজ করতে দেখে খুবই অবাক হলো ওমর। মাকে তো এসব কাজ করতে জীবনেও দেখেনি সে। ফলে তার অবাক হওয়ার মাত্রাটা এতই যে ও বিষয়ে কোনও কথাই তুলতে পারল না সে। কোনও প্রশ্ন করতে পারল না মাকে।

ওমর বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই কোয়ার্টার প্লেটটা ওমরের হাতে ধরিয়ে দিলেন মা। নে, খা বাবা।

প্লেটটা হাতে নিয়ে বেডের ওপর আসন পিঁড়ি করে বসল ওমর। স্বাভাবিক মানুষের মতো কামড় দিতে গেল স্লাইস করা পাউরুটিতে সঙ্গে সঙ্গে সেলাই করা

ঠোঁটটা চরচর করে উঠল ওমরের। ব্যথায় মুখটা কুঁকরে গেল তার। দেখে হা হা করে উঠলেন মা। আস্তে হা কর বাবা।

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে ওমর। আস্তে করে, ঠোঁটের সেলাই এড়িয়ে যতটা সম্ভব হা করে ছোট ছোট কামড়ে খেতে শুরু করল। মা এসে বসলেন ওমরের পাশে। আস্তে আস্তে খা। আজকের দিনটা গেলেই তো অনেকখানি সেরে উঠবি তুই। তোর পাপা এলে আরও খাবার-টাবার আনিয়ে নেব আমি।

ওমর বলল, এখানে আনবার দরকার কী?

তো কোথায় আনব?

বাসায়।

বাসায় কেন?

বাহ্, বাসায় যাব না!

যাবি। কিন্তু সেটা তো আর আজকে নয়!

কেন, আজকে নয় কেন?

এই শরীরে আজকে তুই বাসায় যাবি কেমন করে?

আমার শরীরে তেমন কিছু হয়নি মা। যেটুকু হয়েছিল ঠিক হয়ে গেছে। এখন বাসায় গিয়ে দুচারদিন রেস্ট নিলেই হবে।

রেস্টটা এখানেই নে। ডাক্তারদের চোখের সামনে থাকা গেল। কোনও প্রবলেম হলে যখন তখন ডাক্তার পাচ্ছি হাতের কাছে। নার্স পাচ্ছি। ওষুধ বিষুধের প্রবলেম নেই। বাসায় কি এই সুবিধাটা হবে?

আসলে আমার তেমন কোনও সিরিয়াস প্রবলেম নেই মামণি। সবচে বড় কথা হলো আমার এখানে থাকতে একদম ভাল লাগছে না।

কথাটা শুনে মা একদম নিভে গেলেন। এতক্ষণের কিশোরী সুলভ উজ্জ্বল মুখটা মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল তাঁর। আড়চোখে মাকে একবার দেখল ওমর। দেখে হাতের কোয়ার্টার প্লেটটা নামিয়ে রেখে হরলিকসের গ্লাসটার জন্য হাত বাড়াল। হরলিকসটা দাও তো মামণি!

মৃতের মতো হরলিকসের গ্লাসটা ওমরের হাতে দিলেন মা।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে ওমর বলল, আমি এখানে থাকতে চাচ্ছি না এটা মনে হয় তুমি পছন্দ করছ না!

মা উদাস বিষণ্ণ গলায় বললেন, না, ঠিক তা নয়।

তাহলে কথাটা শুনে তুমি অমন মনমরা হয়ে গেলে কেন?

ওমরের কথা শুনে অযথা একটু হাসার চেষ্টা করলেন মা। কিন্তু হাসিটা তেমন উজ্জ্বল হলো না তার।

তরল গলায় বললেন, কই, না তো!

আমার কাছে লুকিয়ো না। মামণি, বল তো আসল ব্যাপারটা কী?

কই, কী ব্যাপার?

নিশ্চয় কোনও একটা ব্যাপার আছে। আমাকে খুলে বল তো। তুমি চাইলে আমি না হয় এখানেই থাকব।

ওমরের কথা শুনে মা বুঝি আবার খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, না বলছিলাম কি, তোকে তো অনেকদিন এতটা কাছে পাই না। এখানে থাকলে কাছে কাছেই পেতাম তোকে। বাড়ি গেলে তো আর সেটা হবে না। একদিন কি দুদিন তার পরই তো যেই কে সেই। সারাদিনে টিকিটিও দেখা যাবে না তোর।

ওমর বলল, মামণি আমিও তো তোমাকে কখনও এতটা কাছাকাছি পাইনি। তুমি তো সারাদিন আছ তোমার বই নিয়ে।

এখন থেকে আর বই নিয়ে থাকব না।

কী নিয়ে থাকবে তাহলে?

কেন, তোকে নিয়ে থাকব। রিখুকে নিয়ে থাকব।

এ কথায় কী হলো ওমরের, শিশুর মতো দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরল সে। জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, তাহলে আমিও এখন থেকে তোমাকে নিয়ে থাকব। পাপাকে নিয়ে থাকব। চেষ্টা করব তোমাদের চোখে চোখে থাকতে। তোমরা যা বলবে তাই করতে। প্রমিস!

চল তোর পাপা এলে আমরা তাহলে বাড়ি ফিরে যাই।

কিন্তু ওই ছেলেটির সঙ্গে একটু দেখা করে যাওয়া দরকার না? আমার জন্য এতটা করল। ও না আসা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতে হবে।

ওমরের কথা শুনে মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। খুবই অবাক গলায় বললেন, ছেলেটা কী রে! ও তো যুবরাজ। তোর বন্ধু।

ওমর কোনও কথা বলল না। ঠোঁটে তার রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল। সেই হাসিটা দেখতে পেলেন না মা।

যুবরাজের ঘুম ভাঙল নটার দিকে। ঘুম ভাঙার পর যুবরাজ প্রথমে খানিকক্ষণ বুঝতেই পারল না কোথায় শুয়ে আছে সে। চোখ খুলে যুবরাজ দেখতে পেল সাদা কিন্তু বেশ ময়লা একটা মশারি। সেই মশারি ভেদ করে আসছে আবছা নীল একটা আলো। তবে আলোটা বেশ মোলায়েম। একদমই চোখে লাগছে না।

এই আলোটা দেখে যুবরাজ বেশ খুশি হলো। যাক আলোটা তার চোখ যে কামড়ে ধরেনি! চোখের যে কোনও ডিস্টার্ব করেনি! তাহলে ভোরবেলাই মেজাজটা খিঁচড়ে যেত যুবরাজের। কারণ ঘুম ভাঙার পরপরই তীব্র কোনও আলোর দিকে তাকাতে পারে না যুবরাজ। তীব্র কোনও আলো সহ্য করতে পারে না। যদি কোনও

www.shopnil.com

কারণে ঘুম ভাঙার পরপরই যুবরাজের চোখে এসে লাগে তীব্র কোনও আলো তাহলে সেই যে মেজাজটা বিগড়াবে যুবরাজের সারাদিনেও সেই মেজাজ আর ভাল হতে চাইবে না তার। দিনটাই মাটি। লোকজনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারবে না যুবরাজ। টোন ঠিক থাকবে না। যাকে যা নয় তাই বলে ফেলবে। আজ তেমন কিছু হলো না দেখে যুবরাজ খুবই খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু কোথায় শুয়ে আছে সে! কোন বাসায় ? কার বাসায় ? ঘুম ভাঙা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে শুরু করল যুবরাজ। ঘরটা বেশ ছোট ধরনের। চারপাশে সাদা দেয়াল। একদিকের দেয়ালে একটা জানালা। জানালাটা বন্ধ এবং চক্রাবক্রা একটা পর্দা দিয়ে ঢাকা। আরেক পাশের দেয়ালে আছে একটা দরজা। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজাটা আকাশি রঙে সদ্য রঙ করা হয়েছে। তারপর বিছানাটার দিকে তাকাল যুবরাজ। যে জায়গাটায় শুয়ে আছে সেটাও তো দেখা দরকার। বিছানা মানে সিঙ্গেল খাট। হাসপাতালের বেডের মতো সাদা ধবধবে চাদর বিছানো। মাথার তলায় জোরা বালিশ। বালিশের ওয়ারও সাদা। যুবরাজের খাটের একপাশে আছে ছোট্ট একটা টিপয় ধরনের জিনিস। নীল মোলায়েম আলোয় যুবরাজ দেখতে পেল সেই টিপয়ের ওপর একটা হেলমেট আর বেশ মোটা একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সব কথা মনে পড়ল যুবরাজের। আনমনে যুবরাজের একটা হাত তারপর চলে এল গলায়। মোটা চেনটা হাতে লাগল! এবং সেই চেনের স্পর্শে ভারি একটা স্বস্তি বোধ করল যুবরাজ। গতকালের সব কথা মনে পড়ল যুবরাজের। ওমরের কথা। তার বাবা-মার কথা। রিখুর কথা এবং হাসপাতালের সেই নার্স সাবিহার কথা। কিন্তু সাবিহা তো তেমন কেউ নয়। সামান্য একজন নার্স। সাবিহার কথাটাও কেন মনে পড়ল যুবরাজের!

কালরাতে সাড়ে এগারোটার পর নার্সিংহোম থেকে বেরিয়েছিল যুবরাজ। তখনও যুবরাজ জানে না সে এখন যাবে কোথায়, রাতটা কাটাবে কোথায়! প্রথম প্রথম তো ভেবেছিলাম নার্সিংহোমের বারান্দায় বসেই কাটিয়ে দেবে রাতটা। কিন্তু ওমরের মা-বাবা যখন বললেন, ওমরের জন্য অনেক করেছ তুমি, এবার বাড়ি যাও। কাল আবার এস। তখন খুবই হতাশ হয়ে গিয়েছিল যুবরাজ, কিন্তু করে পাচ্ছিল না এত রাতে কোথায় যাবে সে! কার কাছে, কার কাছে গিয়ে বলবে রাতটা আপনার এখানে থাকব। আনমনে রাস্তায় বেরিয়েছিল যুবরাজ হাতে হেলমেট, পকেটে ওমরের টাকা ভর্তি মানিব্যাগ। বাহন হিসেবে আছে ঝকঝকে প্রায় নতুন একটা মোটর সাইকেল। মোটর সাইকেল চালিয়ে যুবরাজ কি এখন আবার ফিরে যাবে ইনশিউরেন্সের দালাল আবুল খায়েরের বাসায়!

কিন্তু আবুল খায়েরের বউয়ের কথা ভেবে মুহূর্তে পরিকল্পনাটা নাকচ করে দিল যুবরাজ।

কিন্তু কোথাও না কোথাও তো যেতে হবে তাকে! রাতটা তো কাটাতে হবে! রাস্তা ঘাটে তো আর বসে থাকতে পারবে না! অন্যদিন হলে হয়তো তা-ও পারত যুবরাজ।

আজ তো পারার প্রশ্নই ওঠে না। সঙ্গে অত দামি একটা মোটর সাইকেল। গলায় অত মোটা মোটা সোনার চেন, পকেটে অত টাকা ভর্তি একটা মানিব্যাগ। মানিব্যাগের কথা মনে পড়তেই ধা করে বেশ একটা বুদ্ধি এসে গিয়েছিল যুবরাজের মাথায়। বুদ্ধিটা আসাতে মুহূর্তেই খুশি হয়ে গিয়েছিল সে। আরে বোকা নাকি আমি! আমার পকেটে এতগুলো টাকা আর কোথায় রাত কাটাব সেই নিয়ে এতটা চিন্তিত আমি। কোনও একটা হোটেলে গেলেই তো পারি! টাকা যে পরিমাণ আছে তাতে তো সোনারগাঁ শেরাটন কিংবা পূর্বাণী যে কোনও একটা হোটেলে অনায়াসে রাত কাটানো সম্ভব। হোটেলের নরম বিছানায় শুয়ে রাজকীয় ঘুম ঘুমানো সম্ভব। ভোরবেলা অনেকটা বেলা করে উঠব। উঠে কলিংবেল টিপে ডাকব একজন বেয়ারা। বেয়ারা এলে খুবই বড়লোকি চালে লোকটার মুখের দিকে না তাকিয়েই বলব, চা। বেয়ারা বিনীত ভঙ্গিতে চা নিয়ে এলে বিছানায় কাত হয়েই চা খাব। ভঙ্গিটা এমন থাকবে, যেন এরকমই আমার প্রতিদিনকার জীবন। অভ্যেস। সকালে প্রথম চা বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে এভাবেই প্রতিদিনি খাই আমি। এভাবে চা না খেলে দিনটা যেন শুরু হয় না আমার।

বাহ্ বাহ্, কী প্ল্যান! কী প্রোগ্রাম!

সাবাস যুবরাজ সাহেব! সাবাস! আপনার হবে। হবেই। কোন শালা ঠেকিয়ে রাখবে আপনাকে! কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে! রাত সাড়ে এগারোটায় নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে, প্রায় নির্জন হয়ে আসা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যুবরাজ। তারপর আস্তে ধীরে হেলমেট পরেছে মাথায়, হিপ পকেটে হাত দিয়ে একবার স্পর্শ নিয়েছে ওমরের স্বাস্থ্যবান মানিব্যাগটার। গলায় হাত দিয়ে অনুভব করেছে ওমরেরই প্রায় ভড়ি দেরেক ওজনের চেনের। তারপর মোটর সাইকেল স্টার্ট দিতে যাবে, দেখে রাস্তার ওপরেই একটি আবাসিক হোটেলের লাল নীল নিয়ন সাইন জ্বলছে।

হোটেলটার দিকে তাকিয়ে খুবই তাচ্ছিল্যের স্বরে ফিসফিস করে যুবরাজ বলল, এই সব হোটেলে যুবরাজ সাহেব থাকেন না। গরিব হোটেল। যুবরাজ সাহেব আজ থাকবেন সোনারগাঁ, শেরাটন নয়তো পূর্বাণীতে। নামের সঙ্গে তিন চারটে স্টার না থাকলে ওসব হোটেলে যুবরাজ সাহেবের মতন একজন অনারেবল লোক থাকেন কী করে! যুবরাজের মুখে ভীষণ অহঙ্কারি একটা হাসি ফুটে উঠল। দামি প্রায় নতুন সুজুকি মোটর সাইকেলে ভারি আহ্লাদী একটা শব্দ তুলে স্টার্ট দিল যুবরাজ। রাত সাড়ে এগারোটায় প্রায় ফাঁকা নির্জন রাস্তায় খুবই স্পিডে চলতে শুরু করল যুবরাজের মোটর সাইকেল। খানিক দূর থেকে এগিয়ে যুবরাজ ভাবল, প্ল্যানটা কি ঠিক হলো! পরের টাকা অকাতরে খরচা করে তারকাখচিত হোটেলে একটা রাত কাটিয়ে কী এমন লাভ হবে তার! দীর্ঘদিন ধরে একই কায়দায় গড়িয়ে যাওয়া জীবনটা বদলে যাবে! না বড় রকমের কোনও লাভ হবে! তারচে' নার্সিংহোমের উল্টো দিকে অবস্থিত লাল নীল নিয়ন সাইনঅলা গরিব হোটেলটাই তো ভালও। রাতটা নেহায়েত কাটাতে হবে বলেই না পয়সা খরচ করে কোনও হোটেলে থাকার কথা ভাবছে যুবরাজ। নেহায়েতই একটা

www.shopnil.com

নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বলেই না পয়সা খরচ করে রাত কাটাবার কথা ভাবতে হচ্ছে তাকে। এবং তাও টাকাটা অন্যের বলে!

তারপরই আরেকটা কথা মনে পড়ল যুবরাজের। কাল সকালেই তো আবার ওমরের সঙ্গে দেখা হবে, ওমরের মা-বাবার সঙ্গে দেখা হবে। ওমর তেমন করে মুখ খোলেনি বলে যত রকমের চাপাবাজি সম্ভব চালিয়ে যাচ্ছে যুবরাজ। যত রকমের চালাকি সম্ভব করে যাচ্ছে। মিথ্যে যত বলা যায় বলে যাচ্ছে। কিন্তু এসবের একটা শেষ তো আছে! ওমর মুখ খুললেই তো ফাঁস হয়ে যাবে সব। যুবরাজের গলায় নিজের চেনটা দেখে মুহূর্তেই চিনতে পারবে সে। হেলমেট দেখে চিনতে পারবে। আর মোটর সাইকেলটার তো কথাই নেই। নিজের মোটর সাইকেল কে না চিনতে পারে!

তখুনি মোটর সাইকেল নিয়ে রিখুকে বলা মিথ্যে কথাটা ভেবে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল যুবরাজ। ইস শালা, আমি যে এত বড় গর্দভচন্দ্র এতো আমার নিজেরই জানা ছিল না। রিখুকে যে আমি বললাম মোটর সাইকেলটা আমার। আপনার ভাই ওমরের আর আমার মোটর সাইকেল একই রঙের। একই কোম্পানির। আমাদের হেলমেটও একই রঙের। কথাটা বলার সময় তো ভাবিনি, রিখু যদি বলত, সবই বুঝলাম। কিন্তু আপনাদের মোটর সাইকেলের নাম্বারও যে এক। একই নাম্বারে দু তিনটে করে মোটর সাইকেল বুঝি চলছে আজকাল দেশে! তাহলে কথাটার কী জবাব দিতাম আমি! ওমরের মা-বাবার সামনে, রিখুর সামনে ধরা পড়ে যেতে তো মুহূর্তমাত্র টাইম লাগত না আমার! থ্যাংকস গড! বেঁচে গেছি বাবা! বড় বাঁচা বেঁচে গেছি!

তারপরই আরেকটা কথা মনে এল যুবরাজের। যুবরাজের গলায় ওমরের চেনটা দেখে টেনশানের মধ্যেও ওমরের মা-বাবা কিংবা রিখু কেউ চিনতে পারেনি যে চেনটা যুবরাজের নয়। চেনটা তো ওমরের। তাছাড়া চেন চিনতে পারা কাজটাও কঠিন। একই রকমের একই ওজনের দুটো চেন তো হতেই পারে! দুই বন্ধুর একসঙ্গে একই জায়গা থেকে তৈরি করিয়ে, কিংবা কিনে নিলেই হলো। সেটা নিয়ে কেউ কোনও আগ্রহ দেখায়নি, প্রশ্ন করেনি ঠিকই আছে।

কিন্তু মোটর সাইকেল!

তাহলে কি ওমরের মা-বাবা রিখু এরা কেউ ওমরের মোটর সাইকেলের নাম্বারই জানে না! আশ্চর্য ব্যাপার তো!

লোকজন দেখে তো বোঝা যাচ্ছে সংসারে এই চারজনই লোক তারা। মা-বাবা আর দুটি ছেলে-মেয়ে। পরিবার পরিকল্পনা অনুযায়ী সুখী পরিবার। আদর্শ পরিবার।

তাহলে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে এত বিচ্ছিন্ন কেন এরা! কেন সংসারের কেউ জানে না সংসারের একমাত্র ছেলেটি যে মোটর সাইকেল চালায় সেটার নাম্বার কত!

যুবরাজ তারপর বিরক্ত হয়ে ভাবল, ধুৎ শালা, অন্যের ব্যাপারে আমার এত মাথা ঘামাবার দরকার কী! আমি এখন নিজেকে নিয়ে ভাবব। নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়ে

www.shopnil.com

জানটা বাঁচিয়ে দিয়েছি ওমরের। আমার দায়িত্ব শেষ। পরিশ্রম করেছি ম্যালা। পারিশ্রমিক হিসেবে টাকাভর্তি মানিব্যাগ, প্রায় দেড় ভরি ওজনের একটা চেন আর এই মোটর সাইকেলটা আমি পেতে পারি। ব্যস, আমি তা পেয়েছি। এবং আমি এগুলো নিয়ে এখন আপছে কেটে পড়ব। ওমররা কেউ আর কখনও আমাকে খুঁজে পাবে না। নাটক থেকে মূল চরিত্র উধাও। সুতরাং যবনিকা পাত। ড্রামা ফিনিশ। নটে গাছটি মুড়ল।

এইসব ভেবে মোটর সাইকেলে স্পিড বাড়াতে গেল যুবরাজ, তখুনি তার মনে পড়ল রিখুর কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠল রিখুর ফুলের মতো সুন্দর পবিত্র মুখ। স্বপ্নের মতো চোখ। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে যুবরাজ মুহূর্তে সব ভুলে গেল। সব। মনে মনে বলল, রিখু তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। অনেক কথা। সে কথা তোমাকে না বলে কেমন করে পালিয়ে যাই আমি! আস্তে করে মোটর সাইকেল ঘোরাল যুবরাজ। তারপর যতদূর সম্ভব স্পিড বাড়াল। প্রায় উড়ে এল নার্সিংহোমের উল্টোদিকের এই আবাসিক হোটেলটির সামনে, মোটর সাইকেল হোটেলের সামনে দাঁড় করিয়ে দ্রুত ঢুকে গেল হোটেলের ভেতর।

রাত প্রায় বারোটা। হোটেলের মেইন গেট বন্ধ করার পাঁয়তারা করছে দারোয়ান। যুবরাজকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন কাউন্টারের ভদ্রলোক। বয়স্ক সৌম্য শান্ত ধরনের লোক। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি, মাথায় টুপি পরনে পাজামা পানজাবি। চেহারা দেখলেই কী রকম শ্রদ্ধা জাগে মনের খুব ভেতরে। ভদ্রলোক শীতল নরম গলায় বললেন, বলুন।

গলার স্বরে কী ছিল কে জানে, মুহূর্তে যুবরাজ প্রতিজ্ঞা করল এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটিও মিথ্যে কথা বলবে না সে। বহুদিন সে যা করেনি তাই করবে, প্রতিটি সত্য কথা বলবে। দেখবে সত্যের জয় এখনও টিকে আছে কিনা পৃথিবীতে। ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে যুবরাজ বলল, আমার একটা রুম দরকার।

কোত্থেকে এসেছেন আপনি?

রাস্তার উলটো দিক থেকে। মানে রাস্তার উলটো দিকে যে নার্সিংহোমটা আছে ওখান থেকে। ওখানে একজন রোগী আছে। তার সঙ্গেই ছিলাম আমি, ভাবছিলাম নার্সিংহোমেই থাকা যাবে।

কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। আজকের রাতটাই তো থাকবেন, নাকি! ষাট টাকা।

হিপ পকেট থেকে ওমরের মানিব্যাগটা বের করে একটা একশ টাকার নোট নিল যুবরাজ। মনে মনে বলল, ওমর আমি হিসেব রেখেই খরচ করব। খুব বেশি একটা করব না। যা করব তা হয়তো তোমাকে আবার ফেরতও দিতে পারি।

একশো টাকার নোট হাতে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আপনার নাম?

যুবরাজ।

পুরো নাম ?

আনিস রহমান।

পিতার নাম ?

মরহুম ফরিদ রহমান।

ঠিকানা ?

আপাতত কোনও ঠিকানা নেই। যেখানে ছিলাম সেখান থেকে আজই বেরিয়ে এসেছি। কাল পরশু হয়তো কোনও একটা ঠিকানা হয়ে যেতেও পারে। তবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

ভদ্রলোক আবার চোখ তুলে যুবরাজের দিকে তাকালেন। আমি বুঝতে পারছি আপনি কোনও চালাকি করছেন না। মিথ্যে বলছেন না। কিন্তু আমাদের নিয়ম আছে বোর্ডারদের ঠিকানা অবশ্যই রাখতে হবে।

আমার আসলে কোনও ঠিকানা নেই।

ঠিকানা ছাড়া মানুষ হয় কী করে! ছোট বড় গরিব ধনী যে-ই হোক কোনও না কোনও ঠিকানা তো তার থাকবেই!

কিন্তু আমার নেই। এক সময় আমার একটা পার্মানেন্ট ঠিকানা ছিল। নাম বললেই জায়গাটা আপনি চিনতে পারবেন। শহরের খুব নামকরা একটি অনাথ আশ্রম।

ফরিদ সাহেবের ?

জি ?

তার মানে আপনি রহমান সাহেবের ছেলে! ফরিদ রহমান সাহেবের!

না, ঠিক আপন ছেলে নই। তিনি আমাকে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সদ্যজাত শিশু হিসেবে রাস্তায় পড়েছিলাম আমি। তিনি আমাকে বুকে করে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের পরিচয়ে মানুষ করেছিলেন আমাকে। এইজন্য পিতার নাম কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি তাঁর নাম বলি। মায়ের নাম জিজ্ঞেস করলে বলতে পারি না। কারণ আমার বাবা চিরকুমার ছিলেন।

কথাগুলো বলতে বলতে কেন যে বহুকাল পর গলা ধরে আসে যুবরাজের। ভুলে যায় পয়সা দিয়ে হোটেলে রাত কাটাতে এসে কাউন্টারের ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে সে, যে জায়গায় এইসব কথা বলার কোনও মানেই থাকতে পারে না। তবুও বলে। মানুষের যে কখন কোথায় কার কাছে কী বলতে ইচ্ছে করে মানুষ নিজেই তা জানে না।

যুবরাজ বলল, আশ্রমের সেরা ছেলে হিসেবে আমাকে মানুষ করেছিলেন বাবা। কখনও বুঝতে দেননি আমি এক অনাথ বালক। সত্যিকার অর্থে পিতৃ-মাতৃহীন। পরিচয়হীন।

www.shopnil.com

আশ্রমে আমি যখন যা বলেছি তাই হয়েছে। যখন যা চেয়েছি বাবা আমাকে তাই এনে দিয়েছেন। এই সেদিন পর্যন্ত, আমি এম এ পড়ি, বাবা মারা যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বাবার গলা জড়িয়ে না ধরলে ঘুম আসত না আমার।

তারপর একটু থামল যুবরাজ। তার খুব সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পকেটে সিগ্রেট নেই। না থেকে অবশ্য ভালই হয়েছে। থাকলেও এই ভদ্রলোকের সামনে সিগ্রেট যুবরাজ হয়তো খেত না।

ভদ্রলোক কলিংবেল বাজালেন। শব্দটা খেয়াল করল না যুবরাজ। বলল, বাবা মারা যাওয়ার পর একটি মুহূর্ত আমি আর ওই আশ্রমে টিকতে পারিনি। না, অন্য কোনও কারণ নেই। আমি যে ঘরে থাকব সেই ঘরে বাবা নেই, বাবার গলা জড়িয়ে না ধরলে আমার ঘুম আসে না, আমি কেমন করে সেই ঘরে থাকি। তারপর থেকে আমার আসলে কোনও ঠিকানা নেই। দ্রুত মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আমার। যে কেউ ডেকে নেয়, তাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকি। তারপর আবার পথ। এই যে ব্যাগটা দেখছেন এতে আমার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর রাখা আছে। ব্যাগটা কাঁধে নিলে আমার আর কোনও পিছুটান থাকে না। যে দিকে ইচ্ছে চলে যেতে পারি আমি আজ সকালে পথে নেমেছিলাম, ব্যাগ কাঁধে। তারপরই জড়িয়ে গেছি বেশ একটা নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে।

ভদ্রলোক বললেন, উনিশ নাম্বার রুম।

যুবরাজ চমকে উঠল। জি।

না তোমাকে নয়। বেয়ারাকে বলছি।

যুবরাজ দেখে তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একজন বেয়ারা। খুবই বিনীত একটা ভঙ্গি তার চোখে মুখে।

বেয়ারার হাতে একটা চাবি দিলেন ভদ্রলোক। সাহেবকে রুমে পৌঁছে দাও। আর শোন যুবরাজ, তোমাকে আমি তুমি করে বলছি কিছু মনে কর না। তুমি আমার ছেলের বয়সী। তোমার রাতের খাওয়া হয়েছে ?

জি না।

তোমার রুমে খাবার পৌঁছে যাবে। তুমি একশো টাকা দিয়েছ, টাকাটা আমার কাছে রইল।

মোটর সাইকেলটা ?

মোটর সাইকেলের চিন্তা কর না। জায়গামতো থাকবে।

জি, আচ্ছা।

বেয়ারার পিছু পিছু যুবরাজ তারপর দোতলায় উনিশ নম্বর রুমে এসে ঢুকেছে। খানিকপর ভাত আর বেশ গরম খাসির মাংস দিয়ে গেছে বেয়ারা। খেয়ে-দেয়ে ডিম লাইট জ্বেলে শুয়ে পড়েছে যুবরাজ। কিন্তু শুয়ে পড়ার পর অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি

তার। বাবার কথা মনে পড়েছে। এই জীবনে বাবার গলা জড়িয়ে আর ঘুমানো হবে না যুবরাজের। এত বড় একটি পৃথিবীতে বাবা তাকে একলা ফেলে কোথায় কোন জগতে যে চলে গেছেন!

সকালবেলা ঘুম ভাঙার খানিক পর একে একে সব কথা মনে পড়ে যুবরাজের। হোটেল কাউন্টারের ভদ্রলোকের কাছে নিজের জীবনের সব কথা অকপটে বলে দিয়েছে যুবরাজ। কেন যে বলল! কোনও মানে আছে, মুহূর্তে দেখা একজন মানুষের কাছে এইসব কথা বলার!

আছে, মানে একটা আছে। ওই ভদ্রলোককে দেখে মুহূর্তের জন্য তার চেহারায় বাবার মুখটা দেখেছিল যুবরাজ। দেখে চমকে উঠেছিল। বাবার কাছে কি মিথ্যে বলা যায়! লুকানো যায় কোনও কথা! যুবরাজ তাই ওসব কথা অমন করে বলেছিল ভদ্রলোককে। কিন্তু ভদ্রলোক কে? হোটেলের ম্যানেজার?

ওই ভদ্রলোকের কথা ভাবতে ভাবতে বিছানা ছাড়ল যুবরাজ। সুইচ টিপে কলিংবেল বাজাল। এখন এক কাপ চা খেতে হবে তাকে, চা খেয়ে বাথরুমে ঢুকবে। ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে নাশতা খাবে। তারপর যাবে নার্সিংহোমে ওমরের সঙ্গে দেখা করতে। কাল যে নাটকটি যুবরাজ শুরু করেছে সেটির একটি চমৎকার শেষ করতে হবে না!

দরজায় টুকটুক করে শব্দ হলো। দরজা না খুলেই যুবরাজ বুঝতে পারল বেয়ারা এসেছে।

যুবরাজ বলল, চা আন। খুবই গরম হতে হবে চাটা।

আচ্ছা স্যার।

বেয়ারা চলে যাওয়ার পর নিজের দিকে তাকাল যুবরাজ। আন্ডারওয়্যার পরে ঘুমিয়ে ছিল। ইস এই অবস্থায় যদি দরজা খুলে দিত সে!

দ্রুত প্যান্টটা পরে নিল যুবরাজ। শার্টটা পরে নিল। তারপর চটপট মশারিটা তুলে বিছানায় কাত হলো। কালরাতের প্রতিটি কথা আবার মনে পড়ল তার। কাউন্টারের ভদ্রলোকের চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কথা মনে পড়ল যুবরাজের! রাতের খাবারটার কথা। অত রাতে ভাত এবং ওরকম গরম খাসির মাংস কোত্থেকে যুবরাজের রুমে পাঠালেন ভদ্রলোক! কোনও হোটেল থেকে বেয়ারা পাঠিয়ে কিনে আনিয়েছেন! অত রাতে তো কোনও ভাতের হোটেল খোলা থাকবার কথা নয়! তাহলে? তাছাড়া খাবারটা খেয়ে খুবই পরিতৃপ্ত হয়েছিল যুবরাজ। একদম বাড়ির খাবারের মতো। মাংসটা যে রকম রান্না হয়েছিল হোটেলে কখনও ওরকম রান্না হয় না। বাবা মারা যাওয়ার পর হোটেলে তো আর কম খাওয়া হয়নি যুবরাজের! কই, কখনও তো এত স্বাদের খাসির মাংস খায়নি সে। খাবারটা কি তাহলে কোনও বাড়ি থেকে আনিয়ে ছিলেন ভদ্রলোক! এই কথাটা হঠাৎ খুব জানতে ইচ্ছে হলো যুবরাজের। তখুনি দরজায় টুকটুক করে টোকা পড়ল। উঠে দরজা খুলে

দিল যুবরাজ। গরম চায়ের কাপ হাতে বেয়ারা এসে ঢুকল। খুবই বিনীত ভঙ্গিতে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল খাটের পাশের ছোট্ট টিপয় ধরনের জিনিসটার ওপর।

চায়ে চুমুক দিয়ে যুবরাজ বলল, কী নাশতা পাওয়া যাবে তোমাদের এখানে?

বেয়ারা বলল, আপনি কী খাবেন বলুন স্যার, বাইরে থেকে নিয়ে আসব।

পরোটা আর খাসির মাংস আন। কালরাতে যে মাংসটা খেলাম ওই মাংসটা কি পাওয়া যাবে?

কালরাতে তো আমার ডিউটি ছিল না, কোথাকার মাংস খেয়েছেন আপনি আমি তো স্যার জানি না। কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলে তারা বলতে পারবে। ওখানে যে ম্যানেজার সাহেব আছেন তাকে বললেই হবে, উনিশ নাম্বার রুমের বোর্ডার পরোটা আর কালরাতের সেই খাসির মাংসটা আনিয়ে দিতে বলেছে। বললেই তিনি বুঝতে পারবেন কোন মাংসটার কথা আমি বলেছি।

জি, আচ্ছা স্যার।

আর শোন, তোমার হাতের ঘড়িটা দেখ তো কটা বাজে?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বেয়ারা আগের মতোই বিনীত স্বরে বলল, পৌনে নয়টা স্যার।

ঠিক আছে। নাশতা নিয়ে তুমি ঠিক সাড়ে নটায় আসবে। আমি এখন বাথরুমে ঢুকব।

ঠিক আছে স্যার।

লোকটা চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াবে, যুবরাজ ডাকল, শোন। নাশতা আনার টাকা নেবে না?

কাউন্টার থেকে নেব স্যার।

ঠিক আছে, যাও।

বেয়ারা চলে যাওয়ার পর উঠে দরজা বন্ধ করে যুবরাজ। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে শার্ট প্যান্ট খুলে ফেলে। শুধু আন্ডারওয়্যার পরা। যুবরাজ তারপর তার ব্যাগের চেন খোলে। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একে একে বের করে একটা ফেড জিনসের প্যান্ট একটা হাতকাটা সাদা সুন্দর গেঞ্জি, সেভের জিনিসপত্র, ব্রাস টুথপেস্ট সাবান শ্যাম্পু, ক্রুটের আফটার সেভ আর ডিওডোরান্ট স্প্রে। তারপর মনে মনে বলে, এখন আমি পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট শরীরের ওপর পরিচ্ছন্ন অভিযান চালাব। সেভ করব, সাবান শ্যাম্পু দিয়ে গোসল করব। তারপর নাশতা সেরে ফেড জিনসের প্যান্ট আর সাদা হাতা কাটা গেঞ্জি পরে ওমরের সঙ্গে দেখা করতে যাব। যে নাটক কাল শুরু করেছিলাম সেটা আজ শেষ করব। তবে নাটক শেষ করার আগে ওমরের কাছে অবশ্যই আমাকে জানতে হবে আসল ঘটনাটি কী হয়েছিল। কারা অমন করে মেরে ওরকম নির্জন একটি জায়গায় ফেলে রেখে গিয়েছিল ওমরকে। এর মধ্যে কি আছে কোনও নারীচরিত্র!

www.shopnil.com

নারীচরিত্রের কথা ভাবতেই আবার রিখুর কথা মনে পড়ে যুবরাজের। বাথরুমে, বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে জিলেটের সেভিং ফোম লাগাতে লাগাতে যুবরাজ ফিসফিস করে বলল, রিখু, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। অনেক কথা। আমার সব কথা তুমি শুনবে?

রিখু বলল, পাপা তুমি অত দেরি করছ কেন?

ভোরবেলার কাজগুলো খানিক আগেই শেষ করেছেন বাবা। এখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শার্টের বোতাম লাগাচ্ছেন। ওমরের অ্যাকসিডেন্টের খবর শোনার পর চেহারায় একটা উৎকণ্ঠা কাল থেকে জমাট বেঁধে আছে বাবার। একটা পুরো রাত কেটে যাবার পরও উৎকণ্ঠার চিহ্নটা বিন্দুমাত্র কমেনি। ডান হাতের বোতাম লাগিয়ে বাবা বললেন, নাশতা তৈরি হয়েছে?

রিখু অস্থির গলায় বলল, সব রেডি। তুমি তাড়াতাড়ি কর।

তুই গিয়ে টেবিলে বোস। আমি আসছি।

না, তুমি তাহলে আরও দেরি করবে। আমার সঙ্গে চল।

বাবা তারপর দ্রুত চিরুনি চালালেন তার প্রায় টাক পড়ে আসা মাথায়। সেই ফাঁকে রিখুকে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে যে তাড়া দিচ্ছিস, তুই রেডি তো?

কথাটা শুনে রিখু একটু রেগে গেল। রেডি না মানে! তুমি দেখতে পাচ্ছ না?

চিরুনি রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বাবা। তারপর রিখুর দিকে তাকালেন। তাকিয়ে চমকে উঠলেন।

আরে রিখুর জায়গায় কে দাঁড়িয়ে আছে ওটা! শাড়ি পরা এক যুবতী। দেখতে হুবহু রিখুর মায়ের মতো। বিয়ের পর পর রিখুর মা দেখতে যেমন ছিল যুবতীটি অবিকল তেমন। বাবা মুগ্ধ গলায় বললেন, মামণি, শাড়ি পরেছ তুমি?

কথাটা শুনে লজ্জা পেয়ে গেল রিখু। মৃদু হেসে মাথা নিচু করল সে। কেন খারাপ লাগছে পাপা?

আরে না না, চমৎকার লাগছে দেখতে। এক সময় তোমার মা অবিকল এরকম ছিলেন দেখতে।

তারপর একটু থেমে বাবা বললেন, তোমাকে বোধহয় আজই প্রথম শাড়ি পরতে দেখলাম আমি।

আমি তো আজই প্রথম পরলাম। আর পড়িনি তো! পরলে তো তুমি দেখবে!

শাড়িতে তোমাকে চমৎকার লাগে। আসলে বাঙালি মেয়েদের পোশাক বলতে আমি তো শাড়িই বুঝি। আমাদের জেনারেশানে শাড়ি ছাড়া মেয়েরা অন্য কিছু পরছে এ আমরা ভাবতেই পারতাম না। অথচ তোমাদের জেনারেশানে শাড়িটাকে পাত্তাই দেয় না কেউ। কী সব উদভট ড্রেস পর তোমরা আজকালকার মেয়েরা।

হয়েছে, তোমার আর ভাষণ দিতে হবে না। চল!

নাশতা খেতে খেতেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রিখুকে দেখেন বাবা। ভোরবেলা উঠেই গোসল করেছে রিখু। রিখুর ফুরফুরে নরম কোমল চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে। মুখে হালকা প্রসাধন রিখুর। কপালে গোল লাল টিপ। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। পরনের শাড়িটা আকাশি রঙের। সোনালি চওড়া পার শাড়ির। আর শাড়িটা এত সুন্দর করে পরেছে রিখু, রিখুর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। গা থেকে রিখুর ভেসে আসছিল মিষ্টি মোলায়েম একটা পারফিউমের গন্ধ। অ্যাকসিডেন্ট করা ভাইকে নার্সিংহোমে দেখতে যাবে রিখু, এইজন্য অত সাজগোজ! অত সাজগোজ করে কেউ নার্সিংহোমে যায়? কথাটা ভেবে ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল বাবার। সেই হাসিটা দেখে ফেলল রিখু। নাশতা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে রিখুর। তখন মাত্র চায়ে চুমুক দেবে সে। বাবার মুখে ওরকম হাসি দেখে চায়ে আর চুমুক দিল না। বলল, কী হলো পাপা? তুমি অমন ঠোঁট টিপে হাসছ কেন?

এমনি?

না, এমনি না। এমনি এমনি তুমি কখনও হাস না। নিশ্চয় কোনও কারণ আছে।

কোনও কারণ নেই।

নিশ্চয় আছে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ।

না। সত্যি না।

রিখু চোখ পাকিয়ে বলল, মিথ্যে বলবে না পাপা। সত্যি করে বল কেন অমন করে হাসলে তুমি!

বলব? এত সাজগোজ করে তুমি নার্সিংহোমে যাচ্ছ এই ভেবে হাসি পেল।

সাজগোজ করে নার্সিংহোমে যাওয়া কি অন্যায়?

না, অন্যায় নয়। তবে সাধারণত অত সাজগোজ করে রোগী দেখতে নার্সিংহোমে কেউ যায় না।

যায়। তুমি জান না। সুন্দর সাজগোজ করে রোগীদের সামনে গেলে রোগীর মন ভাল হয়ে যায়। দ্রুত সেরে ওঠে সে। আমাকে দেখেও ভাইয়ার মন ভাল হয়ে যাবে আজ। দেখবে খুব খুশি হবে সে। এবং দ্রুত ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে আসবে।

বাবা খুশি হয়ে বললেন, সত্যি তো! আমি তো এমন করে ভেবে দেখিনি। চল, আমরা তাহলে বেরুই।

গাড়িতে চড়ার সময় রিখু মনে মনে বলল, আমি কিন্তু ভাইয়ার জন্য এমন করে সাজিনি। সেজেছি তোমার জন্য! যুবরাজ, তোমার জন্য আমি আজ এত সুন্দর করে সেজেছি। জীবনে প্রথম শাড়ি পরেছি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। অনেক কথা। আমার সব কথা তুমি শুনবে?

www.shopnil.com

মুনা মনে মনে বলল, ওমর, প্রিয়তম ওমর, তোমাকে আমি এখন কোথায় খুঁজব ? কোথায় ? তোমার সঙ্গে আজ দেখা না হলে আমি যে মরে যাব! সত্যি সত্যি মরে যাব। পৃথিবীর কোনও ডাক্তার আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। তুমি কোথায় আছ বল। প্লিজ বল! তুমি কি বাসায় নাকি কোনও নার্সিংহোমে ?

ওমরদের বাড়ি মুনা চেনে না। টেলিফোন নাম্বার জানে না। ওমরকে তাহলে কেমন করে খুঁজে বের করবে মুনা! কেমন করে! নিজের রুমে বসে এসব ভাবতে ভাবতে মুনা এক সময় কেঁদে ফেলল। এতটা অসহায় জীবনে কখনও বোধ করেনি সে। মুনা এখন কী করবে! কোথায় খুঁজবে ওমরকে! ওমরের সঙ্গে দেখা না হলে যে সত্যি সত্যি মরে যাবে সে! তখুনি প্রায় অলৌকিকভাবে একটা বুদ্ধি এল মুনার মাথায়। আচ্ছা, টেলিফোন গাইডে তো নিশ্চয় প্রতিটি হাসপাতাল, প্রতিটি নার্সিংহোমের টেলিফোন নাম্বার আছে। তাহলে প্রতিটি নাম্বারে মুনা কি এখন টেলিফোন করবে! যদি কোথাও পেয়ে যায় ওমরকে! যদি কোথাও থেকে থাকে ওমর! মুনা তারপর আর এক মুহূর্তও দেরি করে না। টেলিফোন গাইড আর টেলিফোন সেট নিয়ে রুমের মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে। একের পর এক টেলিফোন নাম্বার ঘুরিয়ে যায়। প্রতিটি নাম্বার ঘোরাবার সময় মনে মনে বলে, ওমর, প্রিয়তম ওমর, এই নাম্বারে তুমি থেকো। আমি আসছি। আমি এক্ষুনি তোমার কাছে আসছি। পৃথিবীর কেউ তোমার কাছ থেকে আমাকে আর সরিয়ে রাখতে পারবে না। আমার যাবতীয় অপরাধ ভালবাসায় ধুয়ে দেব আমি। তাছাড়া কাল যা ঘটেছে তাকেই বা আমি খারাপ বলি কেমন করে! গোগোরা যদি তোমাকে অমন করে না মারত, তোমার ওরকম অসহায় মুখ যদি আমার চোখে কাল না পরত তাহলে কেমন করে তোমাকে ভালবাসতাম আমি! কেমন করে তোমার জন্য প্রায় না ঘুমিয়ে, আধো ঘুম আধো জাগরণে রাত কেটে যেত আমার! কেমন করে ভোরবেলার প্রতিটি নিয়মিত কাজ অনিয়মিত হয়ে যেত! কেমন করে প্রতিটি চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যেত আমার চোখে! কেমন করে আমার দুঃখে মন খারাপ হয়ে যেত আকাশ এবং পৃথিবীর। ফুল এবং পাখির। হাওয়া এবং প্রজাপতির। আলো এবং অন্ধকারের। এসবই তোমার জন্য। ওমর, প্রিয়তম ওমর, কেবল তোমার জন্য আমার জীবন আজ নতুন করে শুরু হয়েছে। তুমি আমার ভালবাসা নেবে তো!

ভোরবেলা সেভ করার পর সাবান শ্যাম্পু দিয়ে সাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে গোসল করার পর মানুষের শরীর এবং মন দুটোই খুব ফ্রেশ হয়ে যায়। শরীর দেখে মনে হয় এ কোনও মানুষের শরীর নয়। মানুষের আকারে শরীর আসলে স্বর্গনগরীর কোনও বাসিন্দার। মুখ দেখে মনে হয় না এ কোনও মানুষের মুখ। মানুষের মুখের আদলে মুখটি আসলে কোনও দেবশিশুর। আর মনের ভেতর থেকে ঠিকরে বেরোয় অদ্ভুত এক আনন্দ, যে আনন্দের কোনও বর্ণনা দেয়া যায় না। বাথরুম থেকে বেরুবার

পর যুবরাজের অবস্থা এ রকম। এমনিতেই যুবরাজ দেখতে খুব সুন্দর। সেভ করার পর, ভাল সাবান শ্যাম্পু ব্যবহার করে দীর্ঘক্ষণ ধর গোসল করার পর তাকে লাগছে খুবই অসাধারণ। এই মুহূর্তে যুবরাজকে দেখে যুবতী মেয়েরা তো বটেই, যে কোনও পুরুষেরও মুণ্ডু খানিকটা বিগড়ে যাবে। যুবরাজকে দেখে ঈর্ষায় পুড়ে খাক হবে যুবরাজের বয়সী অন্যান্য যুবকদের বুক। মন ভাল হবে কোনও দুঃখী মানুষের।

ফেড জিনসের প্যান্ট আর হাতাকাটা গেঞ্জি পরে, নাশতা-টাশতা সেরে যুবরাজ যখন হোটেলের রুম লক করে বেরুল, মুহূর্তে যুবরাজের শরীর থেকে ঠিকরে বেরুনো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল আবাসিক হোটেলটির পুরনো বিল্ডিং। যুবরাজের শরীর থেকে বেরুনো ক্রুটের ডিওডোরান্ট স্প্রের গন্ধে আমোদিত হয়ে গেল চারদিক। সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসবার সময় মনের খুব ভেতরে এমন এক আনন্দ অনুভব করল যুবরাজ, মুহূর্তে সে প্রতিজ্ঞা করল কালরাতে হোটেল কাউন্টারের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার মতো প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আজ সত্য কথা বলবে সে। কারও সঙ্গে মিথ্যে বলবে না। কোনও রকম চালাকি করবে না। এসব ভেবে যুবরাজের মন আরও ভাল হয়ে গেল। হোটেল কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল যুবরাজ। আঙুলের ডগায় এতক্ষণ ধরে ঘোরাচ্ছিল চাবির রিং। কাউন্টারে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে নিজের অজান্তেই আঙুল ঘোরানোটা থেমে গেল তার। কাউন্টারে তো কালরাতে সেই সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক নেই। সেখানে অহঙ্কারী ভঙ্গিতে বসে আছে ফালতু ধরনের একটা লোক। এ রকম চেহারার লোক দেখলে মেজাজ সাধারণত খারাপ হয় লোকের। যুবরাজের তো হয়ই। যুবরাজ ভেবেছিল এত সুন্দর শরীর এবং মন নিয়ে কালরাতের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাউন্টারে দেখা হবে তার। দেখা হলে মনটা যাবে আরও ভাল হয়ে। না, তিনি নেই। আছে ফালতু চেহারার একটা লোক। যাকে দেখলে মন ভাল হওয়া তো দূরের কথা, মনের ভেতর ফ্রেশনেস যতটুকু থাকবে সেটিও হাওয়া হয়ে যাবে মুহূর্তে। ধুৎ! ভেতরে ভেতরে বেশ বড় রকমের একটা হোঁচট খেল যুবরাজ। খুবই বিরক্ত ভঙ্গিতে চাবিটা এগিয়ে দিল কাউন্টারে বসা লোকটির দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে যুবরাজের পেছন থেকে ভরাট সুন্দর এবং মায়াবী গলায় ভেসে এল, সুপ্রভাত যুবরাজ!

কণ্ঠটি এমন, মুহূর্তে যুবরাজের মুখ থেকে হাওয়া হয়ে গেল খানিক আগের বিরক্তি। মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেল মোহন এক হাসিতে। চঞ্চল ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে যুবরাজ বলল, সুপ্রভাত। আমি মনে মনে আপনাকেই খুঁজছিলাম।

তারপর ভদ্রলোককে আপাদমস্তক দেখে ভেতরে ভেতরে খানিকটা চমকাল কিংবা অবাক হলো যুবরাজ। ভদ্রলোক পরে আছে ক্রিম কালারের চমৎকার স্যুট, সাদা শার্ট আর ঘি রঙের মাঝখানে কালো স্ট্রাইপ দেয়া সরু টাই। পায়ে চকচকে জুতা। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁচি চালিয়ে যত্ন করে ছাঁটা হয়েছে। সৌম শান্ত এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা তো তার আছেই। কালরাতের তুলনায় সেই চেহারা আজ সকালে আরও বেশি ধারালো এবং প্রখর দেখাচ্ছে। সম্ভবত পোশাকের কারণে। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে

www.shopnil.com

একটা জিনিস কিছুতেই মিলাতে পারল না যুবরাজ, এই ধরনের একটি গরিব হোটেলের ম্যানেজার এত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন কী করে! এ রকম দামি পোশাক-আশাক জুতা টাই পরেন কেমন করে! এই হোটেলের ম্যানেজার তো হওয়ার কথা এখন কাউন্টারে যে ফালতু চেহারায় লোকটি বসে আছে তার মতো লোকের। ভদ্রলোক তাহলে কে? হোটেলটির মালিক নন তো! কিন্তু মালিক হলে অত রাতে ওই রকম নগণ্য পোশাক পরে কাউন্টারে বসে থাকবেন কেন তিনি! আবাসিক হোটেলটি দেখতে যত গরিব এবং সাধারণই হোক, শহরের এ রকম জায়গায় প্রায় সাত আট কাঠা জায়গার ওপর পাঁচতলা বিল্ডিং, ব্যাপারটি তো বিশাল। ভদ্রলোক তো তাহলে বেশ বড় মাপের বড় লোক!

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, কী হলো যুবরাজ?

যুবরাজ বেশ অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে। কথা বলে না, চোখে পলক ফেলে না দেখে ভদ্রলোক নিজেই প্রথম কথা বললেন। যুবরাজ থতমত খেয়ে গেল। না, কিছু না।

কী যেন বলছিলে?

বলছিলাম যে আমি মনে মনে আপনাকেই খুঁজছিলাম। আপনাদের এই হোটেলটায় ম্যানেজার কজন?

একজনই। ওই তো বসে আছে।

তাহলে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বুঝতে পেরেছি, তুমি কী বলতে চাইছ।

মুহূর্তে যা বোঝার বুঝে গেল যুবরাজ। ভদ্রলোক কথা বলবার আগেই যুবরাজ বলল, কালরাতেই আমি খানিকটা অনুমান করেছিলাম। ওই কাউন্টারে বসে কাজ করেছিলেন আপনি, আপনার ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মিলিয়ে জায়গাটায় আপনাকে ঠিক মানাচ্ছিল না। ঠিক মানে কী, একদমই মানাচ্ছিল না।

ম্যানেজার কাল একটু আগে আগে চলে গিয়েছিল। ওর বাসায় বোধহয় কোনও প্রবলেম ছিল। এই জন্য আমি নিজেই...

যুবরাজ উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, আপনার ভয়েস এত সুন্দর যে আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কী বলব, আমি একদম মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলেন না নিজের পুরো আত্মজীবনী বলে ফেললাম! সকালবেলা কাউন্টারে এসে আপনাকে না দেখে তো মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। ভেবেছিলাম আপনাকে দেখে দিনটা শুরু করব। তাহলে বহুকাল পর একটা দিন অন্তত খুবই সুন্দরভাবে শুরু হবে আমার। বাবা মারা যাওয়ার পর যা আর হয় না। আর সত্যি কথা বলতে কি, কালরাতে তো আপনাকে বলা হয়নি, আপনার চেহারায় কোথায় যেন আমার বাবার মুখের স্পষ্ট একটা ছায়া আছে। হয়তো এই কারণেই অমন করে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে অতগুলো কথা অকপটে বলে ফেলেছিলাম আপনাকে। সকালবেলা ঘুম ভাঙার পরই মনে পড়েছে আপনার কথা। কাউন্টারে এসে আপনাকে না পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

www.shopnil.com

কাউন্টারে এতক্ষণ খুবই আয়েশি ভঙ্গিতে বসে ছিল ফালতু চেহারার ম্যানেজারটি। যুবরাজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোক এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াবার পর থেকে স্ট্যাচুর মতো হয়ে গেছে সে। কখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে, কেউ খেয়াল করেনি। কখন যে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে তার, কেউ খেয়াল করেনি। দুজন বেয়ারা গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছিল কাউন্টারের দিকে। ভদ্রলোককে দেখে একদম ফিলমি কায়দায় একটা জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াল তারা। যেন একটা শট এইমাত্র ফ্রিজ করে দিল অদৃশ্য কোনও ক্যামেরাম্যান।

ভদ্রলোক বললেন, আমিও আসলে তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আমি তো ঘুম থেকে উঠি খুব সকালে। উঠে মর্নিংওয়াকে বেরুই। সে সব সেরে বাড়ি ফিরে গোসল-টোসল সেরে নাশতা করে বেরুব কেন যে তোমার কথা মনে পড়ল! সকালবেলা আমি সাধারণত হোটেলে আসি না। আমার আরও কিছু বিজনেস আছে, একটা অফিস আছে সেখানে চলে যাই। সাধারণত আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে পৌঁছে যাই। সেখানে আজ এখনও যাওয়া হয়নি তোমার জন্য।

যুবরাজ অবাক হয়ে বলল, আমার জন্য?

হ্যাঁ। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তোমার কথা মনে পড়ল। সোজা চলে এলাম এখানে।

আপনার বাড়িটা কোথায়?

এই তো, হোটেলের পেছনে। একই কম্পাউন্ডের ভেতর।

কথাটা শুনে হঠাৎ কাল অত রাতে ভাত আর ওরকম সুস্বাদু খাসির মাংসের কথাটা মনে পড়ল যুবরাজের। তাহলে রাতের খাবারটা কি...

যুবরাজ বলল, কাল অত রাতে ভাত এবং অত সুন্দরভাবে রান্না করা খাসির মাংস...

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমার বাড়ি থেকে আনিয়ে দিয়েছিলাম। বাই দা বাই, যুবরাজ, তুমি কি অনেক বেলা অব্দি ঘুমাও?

না, ঠিক অনেক বেলা অব্দি আমি ঘুমাই না। কাল খুব টায়ার্ড ছিলাম।

হ্যাঁ, আমি অনেকক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। শোন, কালরাতে তোমার কথাগুলো শোনার পর থেকে আমার মনের ভেতরটা কেমন করছে। কেবল তোমার কথা মনে হচ্ছে। আর মনে হয়েছে আমাদের চারপাশে অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার মতো অজস্র যুবরাজ। অনাদরে অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হিরের টুকরোর মতো আমাদের একেকটি সন্তান। আমাদের উচিত নয় তোমাদেরকে এভাবে নষ্ট হতে দেয়া।

যুবরাজ ফ্যালফ্যাল করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতর অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো তার। যুবরাজের মনে হলো বহুকাল পর বাবার কণ্ঠস্বর শুনছে সে। সামনে দাঁড়িয়ে বাবাই যেন মায়াবী গলায় কথা বলে যাচ্ছেন তার সঙ্গে।

www.shopnil.com

ভদ্রলোক বললেন, তোমার ব্যাপারে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যুবরাজ। আশা করি তুমি আমার কথা শুনবে। আমার হোটেলের যে রুমে তুমি আছ, আপাতত ওখানেই থাকবে। টাইমলি তোমার খাবার আসবে আমার বাড়ি থেকে। কোথাও তোমাকে কিছু পে করতে হবে না। কিছুদিন তুমি এভাবে থাকবে, তারপর তোমার জন্য তোমার স্ট্যান্ডারড অনুযায়ী কাজ দেব আমি। আজ থেকে তোমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। রহমান সাহেব বেঁচে থাকলে তিনি যেভাবে তোমার টেক কেয়ার করতেন, আজ থেকে আমি তা করব।

যুবরাজ যেমন করে তাকিয়েছিল, তাকিয়ে রইল। মুখে কোনও কথা এল না তার। কেবল চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল। ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আক্কাস, তুমি এতক্ষণ নিশ্চয় আমাদের সব কথা শুনেছ?

ম্যানেজার লোকটির নাম আক্কাস। সে খুবই বিনীত গলায় বলল, জি, শুনেছি স্যার।

এই যে ছেলেটিকে দেখছ এ আমার ছেলে। এখানে থাকবে। এবং মনে রাখবে আমার ছেলে হিসেবে থাকবে। আর কিছু বলবার দরকার আছে তোমাকে?

জি না স্যার, সব বুঝতে পেরেছি।

ঠিক আছে।

তারপর যুবরাজের কাঁধে হাত দিলেন তিনি। দু একদিন রেস্ট নাও। তারপর আমার সঙ্গে প্রতিদিন সকালবেলা বেরুতে হবে তোমাকে।

যুবরাজ কোনও কথা বলল না।

তখুনি যেন হঠাৎ একটি কথা মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে চমকালেন ভদ্রলোক। তারপর পকেটে হাত দিয়ে একটা একশো টাকার নোট বের করলেন। টাকাটা যুবরাজের হাতে দিয়ে বললেন, কালরাতে তুমি যে টাকাটা দিয়েছিলে সেটা। বাবার কাছে টাকা দিয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় না ছেলের।

ভদ্রলোক আর কোনও দিকে তাকালেন না। দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। টাকাটা হাতে নিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে রইল যুবরাজ। দুচোখ বেয়ে কখন যে জলের ধারা নেমেছে তার, যুবরাজ টের পায়নি।

মুনা বলল, আচ্ছা শুনুন ...।

কথা শেষ হওয়ার আগেই টেলিফোনের ওপাশ থেকে একটি আগ্রহী পুরুষকণ্ঠ বলল, বলুন।

মুনা বুঝে গেল বেশিরভাগ বাঙালি টেলিফোনঅলাদের মতো এই লোকটিও টেলিফোনে অচেনা মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। টেলিফোনে যদি একটু মশকরা করা যায় কোনও মেয়ের সঙ্গে। আকারে ইঙ্গিতে যদি বলা যায় কিছু

নোংরা কথা। তারপর টেলিফোন নাম্বার যোগাড় করে যদি রেগুলার টেলিফোন করা যায়, মানে স্কচ টেপের মতো লেগে থাকা যায় তাহলে ভবিষ্যতে হলেও হয়ে যেতে পারে কিছু একটা।

মুনা মনে মনে বলল, কেন অযথা চেষ্টা করছ বাবা! পৃথিবী উলটে গেলেও মুনাকে আর পাবে না অন্য কোনও পুরুষ। কালরাত থেকে মুনার একমাত্র মালিক হয়ে গেছে ওমর। শরীর মন, এককথায় মুনার সব কিছুর মালিক এখন ওমর। মাথা কুটে মরে গেলেও মুনাকে আর পাবে না অন্য কোনও পুরুষ।

মুনা মেজাজ খারাপ করে বলল, এই তো নার্সিংহোম, না?

ওপাশের কণ্ঠটি অযথা গলা মোটা করে, মেয়েদের কাছে হিরো সাজবার জন্য কিছু কিছু পুরুষ যেমন গলা যা নয় তারচে' অনেক বেশি মোটা করে কথা বলে, তেমন স্বরে বলল, ইয়েস ম্যাডাম।

ইংরেজি শব্দ দুটো শুনে মুনার মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। বাঙালিরা চান্স পেলেই, বিশেষ করে টেলিফোনে অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলবার সময় চান্স পেলেই ইংরেজিতে বলবার চেষ্টা করে। মধ্যবিত্তের আধুনিকতা আর কি!

দাঁতে দাঁত চেপে মুনা বলল, শুনুন, আপনাদের কি ওমর নামে কোনও পেসেন্ট আছে?

সেই অযথা মোটা করা কণ্ঠস্বর বলল, কবে এডমিশান নিয়েছে?

গতকাল।

কী প্রবলেম?

খুব মার খেয়েছে।

জি?

কণ্ঠস্বরের অযথা মোটা ভাবটা মুহূর্তে কেটে গেল। মুনা কিছু বলবার আগেই লোকটি কথা বলল। মার খেয়েছেন মানে?

মানে আবার কী! কয়েকজনে ধরে খুব করে মেরেছিল। নাম ওমর। আছে আপনাদের ওখানে?

না না। ওরকম কোনও পেসেন্ট তো আমার...

মুনা আর কোনও কথা না বলে লাইন কেটে দিল। অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোন করছে সে। টেলিফোন গাইডে নাম্বার আছে এরকম প্রায় সবগুলো হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে টেলিফোন করে ফেলেছে সে। কত রকমের মানুষের সঙ্গে যে কথা বলেছে! কিন্তু নেই। ওমর কোথাও নেই। রাগে-দুঃখে কান্না পেল মুনার। মনে মনে বলল, ওমর, প্রিয়তম ওমর, আর কেমন করে তোমাকে আমি খুঁজব। কোথায় খুঁজব। আমি কি এখন গাড়ি নিয়ে বেরুব! তারপর ঢাকা শহরের প্রত্যেকটা গলি প্রত্যেকটা বাড়ি খুঁজে দেখব কোথায় লুকিয়ে আছ তুমি!

টেলিফোন গাইডে তখনও রয়ে গেছে আরও কয়েকটা নার্সিংহোমের নাম্বার। সেই নাম্বারগুলোর দিকে তাকিয়ে জলে চোখ ভরে এল মুনার। দু হাতে চোখ মুছে আবার টেলিফোন তুলল মুনা। কী আশ্চর্য, এবার একটা ক্রস লাইন ঢুকে গেল মুনার টেলিফোনে। দুপাশে দুজন কথা বলছে। নারীকণ্ঠটি খুব সুন্দর। তবে আলাপের বিষয়টি কুৎসিত। স্বামীর অনুপস্থিতিতে অপর পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি মার্কা আলাপ করছে মহিলাটি। পুরুষটিও মহাখচ্চর। যে সব শব্দ উচ্চারণ করছে টেলিফোনে, ভাবা যায় না। অন্য সময়ে হলে অনেকটা সময় ধরে এদের আলাপ শুনত মুনা। তারপর এমন কিছু কথা বলত, ভয়ে দুজনের একজনও আর কখনও টেলিফোনে এই ধরনের অসভ্য আলাপ করার সাহস পেত না। কিন্তু এখন ওসব করল না মুনা। তার মন ভাল নেই। সে ওমরকে খুঁজছে। ওমরকে না পাওয়া পর্যন্ত তার কোনও স্বস্তি নেই। শান্তি নেই। ওমরকে না পাওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনও ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ নেই। এই মুহূর্তে যদি আচমকা শুরু হয়ে যায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়া এবং আমেরিকা যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করতে শুরু করে তাদের সর্বাধুনিক অস্ত্রগুলো, যদি মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৃথিবী এসে দাঁড়ায় ধ্বংসের একেবারে চরম মুহূর্তে, তবুও অন্য কোনও দিকে মনোযোগ দিতে পারবে না মুনা। সম্ভব নয়। লাইন কেটে দিয়ে আবার রিং করল মুনা। ওপাশে রিং হচ্ছে। একবার, দুবার। একটি মেয়ে ধরল টেলিফোন। হ্যালো! মুনা কোনও ভণিতা না করে বলল, আমি একজন লোককে খুঁজছি। আমার ধারণা সে কোনও নার্সিংহোমে আছে।

কী হয়েছে তার?

কয়েকজন মিলে প্রচণ্ড মেরে একটি পার্কে ফেলে রেখেছিল। নাম ওমর।

ওমর নামে আমাদের এখানে একজন আছে।

মুহূর্তে হৃদয়ের শব্দ পালটে গেল মুনার। শরীর এবং মন জুড়ে দেখা দিল এমন এক আনন্দের অনুভূতি যার কোনও ব্যাখ্যা মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। টেলিফোন ছুড়ে ফেলে চিৎকার করে প্রায় লাফিয়ে উঠতে গিয়েছিল মুনা। কী ভেবে নিজেকে কন্ট্রোল করল। এ তো আমার ওমর না-ও হতে পারে। অন্য কোনও ওমর হতে পারে। ধীর গলায় মুনা তারপর বলল, আপনাকে আমি দু একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না তো? ওমর নামের যে পেসেন্টটি আপনাদের ওখানে আছে সে এডমিশান নিয়েছে কবে?

কাল বিকেলে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

উত্তেজনায় গলার স্বর খুবই অন্যরকম হয়ে গেল মুনার। প্রায় চেঁচিয়ে সে বলল, তার প্রবলেমটা কী বলুন তো!

আমরা তো শুনেছি হাইজ্যাকাররা ধরেছিল। সঙ্গে মোটর সাইকেল ছিল...

কথাটা শেষ করতে দিল না মুনা। মাঝখান থেকে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল। সুজুকি মোটর সাইকেল। প্রায় নতুন।

মোটর সাইকেল এবং টাকা-পয়সা সব ছিনিয়ে নিয়েছে হাইজ্যাকাররা। তারপর খুব মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে।

শুনে মুনা একটু থতমত খেয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, হাইজ্যাকাররা ধরেছিল! না তো। মোটর সাইকেল ইত্যাদি তো কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। আমরা যখন চলে এলাম মোটর সাইকেলটা তো তখন...

ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠটি বলল, কিছু বলছেন?

না না। শুনুন আপনি আমার আর একটু উপকার করুন। ওমরের রুম নাম্বারটা বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে রুম নাম্বারটা বলে দিলেন মহিলা। মুনা বলল, আপনাদের অনেকক্ষণ জ্বালালাম। কিছু মনে করবেন না।

না, ঠিক আছে।

মুনা টেলিফোন রেখে দিতে যাবে, মহিলা বললেন, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করব?

প্লিজ!

যার সম্পর্কে এত খোঁজ খবর নিলেন তিনি আপনার কে হন?

আমার আমার...

মুনা একটা ঢোক গিলল। কী বলবে সে! বলবে আমার লাভার! প্রেমিক কিংবা বয়ফ্রেন্ড কিংবা ফিঁয়াসে! নিজেকে মুহূর্তের জন্য সামলাল মুনা। তারপর খুবই সরল গলায় বলল, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

নার্সিংহোমের দোতলার টানা লম্বা বারান্দা দিয়ে আনমনে হেঁটে যাচ্ছে যুবরাজ। মুখ চোখ কী রকম ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে তার। খানিক আগে নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে জল পড়েছে তার। কান্না। বাবা মারা যাওয়ার পর, আশ্রম ছেড়ে আসবার পর এই তার প্রথম কান্না। কান্নাটা কোনও কিছু হারাবার কান্না নয়। দুঃখের কান্না নয়। বেদনার কান্না নয়। কান্নাটা কোনও কিছু পাবার কান্না। সুখের কান্না। আনন্দের কান্না। কোনও কোনও মানুষ আছে কাঁদবার পর যাদের চেহারা সুন্দর হয়ে যায়। যুবরাজ সেই দলের মানুষ। সামান্য কেঁদেছে সে। তবুও চেহারাটা আগের তুলনায় সুন্দর হয়ে গেছে তার। নার্সিংহোমের টানা লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যুবরাজ তখন হোটেলের সেই ভদ্রলোকের কথা ভাবছিল। আশ্চর্য, ভদ্রলোকের নামটা এখনও জানা হয়নি যুবরাজের। তবে ওরকম লোকের নাম জানবার কোনও দরকার হয় না। এই নোংরা পৃথিবীতে এখনও কিছু কিছু সত্যিকারের মানুষ বেঁচে আছে যাদের নাম-ধামের কোনও দরকার হয় না। যারা মানুষের সত্যিকার প্রতিনিধি। ভদ্রলোক ওরকম একজন। তার নাম জানবার দরকার কী যুবরাজের। একজন বাবা এত বড় পৃথিবীতে যুবরাজকে একা

www.shopnil.com

ফেলে চলে গেছেন। তারপর মাঝখানে কেটে গেছে বেশ অনেকগুলো দিন। আর আবার একজন বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন যুবরাজের পাশে। কে বলেছে যুবরাজ দুর্ভাগা ছেলে! আসলে তো যুবরাজ সেই সৌভাগ্যবান ছেলে যার পাশে একের পর এক এসে দাঁড়ান মহাপুরুষের মতো দয়ালু সব মানুষ। কোনও এক অসৎ মা-বাবা অবহেলায় জন্ম দিয়েছিল যুবরাজকে। সামলাতে না পেরে ফেলে রেখে গিয়েছিল পথপাশে। তাতে কী এমন ক্ষতি হয়েছে যুবরাজের। মায়ের স্নেহ না হয় সে পায়নি। বাবার আদর ভালবাসা তো পেয়েছে। এতটা পেয়েছে যা খুব কম ছেলের ভাগ্যেই জোটে। সেই বাবা মারা যাওয়ার পর তারই মতো বুকভরা ভালবাসা নিয়ে আজ আরেকজন বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন যুবরাজের পাশে। এরকম ভাগ্য নিয়ে কজন মানুষ জন্মায় সংসারে! এই সৌভাগ্যর কথা ভেবেই কি নিজের অজান্তে চোখের জলে চোখ ধুয়ে গিয়েছিল যুবরাজের! এসব ভাবতে ভাবতে ওমরের রুমের দিকে হেঁটে যাচ্ছে যুবরাজ, পেছন থেকে একটি মেয়েকণ্ঠ ডাকল, এই যে শুনুন!

নিজের ভেতর এতই মগ্ন হয়ে আছে যুবরাজ, ডাকটা শুনতে পেল না সে। মেয়েকণ্ঠ আবার ডাকল, কী হলো, শুনতে পাচ্ছেন না? চমকে পেছন ফিরল যুবরাজ। সাবিহা নামের নার্সটি ডাকছে তাকে। যুবরাজ একটু অবাক হলো। প্রথমে সাবিহাকে সে চিনতেই পারল না। এই নার্সিংহোমের অন্য দশটি নার্সের মতোই মনে হলো সাবিহাকে। অথচ এই মেয়েটির সঙ্গে যে কাল খানিকটা চালিয়াতি করেছিল সে, খানিকটা চালাকি করেছিল কথাটা আদৌ মনে পড়ল না তার। কেন, এমন হলো কেন যুবরাজের! নিজের ভেতর অতিরিক্ত মগ্ন হয়ে থাকার ফলে কি রকম হলো! নিজের ভেতর অতিরিক্ত মগ্ন হয়ে থাকলে কী রকম হয় মানুষের! যুবরাজ ফ্যালফ্যাল করে সাবিহার দিকে তাকিয়ে রইল। তখনও বেশ খানিকটা দূরে ছিল সাবিহা। দ্রুত হেঁটে যুবরাজের কাছে এল সে। তারপর অপেক্ষাকৃত নিচু স্বরে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

যুবরাজ অবাক গলায় বলল, আমার সঙ্গে?

তারপরই সাবিহাকে চিনতে পারল সে। মেয়েটির সঙ্গে গতকাল সামান্য চালিয়াতি করে ছিল, মনে পড়ল যুবরাজের। এবং আজ সকালে ঘুম ভাঙার পরও যে সাবিহার কথা মনে পড়েছিল, মনে পড়ল। যুবরাজ উদাস গলায় বলল, বলুন।

এখানে বলা যাবে না। আমার রুমে চলুন।

এই নার্সিংহোমে প্রত্যেক নার্সের বসার জন্য কি আলাদা আলাদা রুম আছে?

না। প্রত্যেক ফ্লোরে নার্সদের জন্য একটা করে রুম আছে। এক শিফটে আমরা যে কজন থাকি ঘুরে-ফিরে প্রত্যেকে সেই রুমটায় বসি।

তাই চলুন। কিন্তু সেই রুমে এখন অন্য কেউ নেই তো!

না।

ঠিক আছে চলুন।

সাবিহার পিছু পিছু ছোট্ট একটা রুমে এসে ঢুকল যুবরাজ। রুমে একটা টেবিল। টেবিলের ওপর কিছু ফাইলপত্র, একটা টেলিফোন সেট আর কিছু ছড়ানো-ছিটানো ওষুধের ফাইল, ট্যাবলেট। টেবিলের একপাশে একটা হাতাঅলা চেয়ার, অন্য পাশে হাতা ছাড়া দুটো। রুমের একপাশে আছে একটা পুরনো ফাইল কেবিনেট। রুমে ঢুকেই হাতাঅলা চেয়ারটায় গিয়ে বসল সাবিহা। তারপর সরাসরি যুবরাজের চোখের দিকে তাকাল। বসুন।

যুবরাজ বলল, কিন্তু আমি তো বসতে পারব না। আমার টাইম নেই।

বেশিক্ষণ বসতে হবে না। মিনিট পাঁচেক।

খুবই সিরিয়াস কিছু বলবেন মনে হচ্ছে!

আপনার জন্য মোটেই সিরিয়াস নয়। তবে আমার জন্য খুব সিরিয়াস।

ঠিক আছে বলুন।

সাবিহার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে যুবরাজ। তখন সাবিহা আবার সরাসরি যুবরাজের চোখের দিকে তাকায়। আমাকে আপনি কোথায় দেখেছেন বলুন তো?

কোথায় দেখেছি মানে?

ওই যে কাল বললেন আমাকে খুবই চেনা চেনা লাগছে আপনার। কোথায় যেন দেখেছেন! বলুন না কোথায় দেখেছেন আমাকে। কার সঙ্গে দেখেছেন?

আসলে পুরো ব্যাপারটাই ছিল চালিয়াতি। যুবক ডাক্তারটির সঙ্গে সাবিহার গোপনে হাসাহাসি করতে দেখে তাকে একটু ডিস্টার্ব করেছিল যুবরাজ। খানিকটা ভড়কে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটার রেশ যে আজ পর্যন্ত থাকবে ভাবতে পারেনি সে। যুবরাজ মনে মনে বলল, সাবিহা তো দেখি খুবই সিরিয়াস টাইপের মেয়ে। যুবরাজের ওইটুকু কথাও মনে রেখেছে। যুবরাজের ইচ্ছে হলো আরও কিছু বানোয়াট কথা বলে আরও বেশি ভড়কে দেয়া যাক সাবিহাকে। দেখা যাক তারপর কী হয়। কী করে মেয়েটি। কিন্তু তখুনি যুবরাজের মনে পড়ল সে প্রতিজ্ঞা করছে আজ কারও সঙ্গে কোনও মিথ্যে কথা বলবে না। কোনও চালাকি করবে না। যুবরাজ উদাস গলায় বলল, না কালকের আগে, এই নার্সিংহোমের বাইরে কখনও কোথাও আপনাকে আমি দেখিনি।

যুবরাজের কথা একদম বিশ্বেস করল না সাবিহা। বলল, কেন মিথ্যে কথা বলছেন?

মিথ্যে বলছি?

মিথ্যে নয়তো কী! নিশ্চয় আপনি কোথাও আমাকে দেখেছেন। কারও সঙ্গে দেখেছেন বলুন না!

না, দেখিনি, কারও সঙ্গে দেখিনি। সত্যি।

যুবরাজ সাহেব, আপনি আমার সঙ্গে চালাকি করছেন।

না, কোনও চালাকি করছি না।

www.shopnil.com

তখুনি একটা কথা ভেবে চমকে উঠল যুবরাজ। সাবিহা তার নাম জানল কী করে!

আবার ফ্যালফ্যাল করে সাবিহার মুখের দিকে তাকাল যুবরাজ। আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে?

এবার সাবিহার মুখে দেখা গেল চাপা একটা রাগ। কেন আমার সঙ্গে চালাকি করছেন যুবরাজ সাহেব। কেন না চেনার ভান করছেন আমাকে? দেখা যখন হয়েই গেছে, ফাহিমের সামনে আপনি যখন বলেই ফেলেছেন আমাকে খুব চেনা চেনা লাগছে, আমাকে কোথায় যেন দেখেছেন আপনি, এখানে এখন তো আর ফাহিম নেই, তাহলে আর চালাকি করবার দরকার কী?

কিন্তু যুবরাজের কিছু মনে পড়ে না।

যুবরাজ বলল, ফাহিম কে?

ওই ডাক্তারটি। যিনি আপনার বন্ধুর ট্রিটম্যান্ট করছেন।

একটু চুপ করে থেকে যুবরাজ বলল, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আপনার আসলে সম্পর্কটা কী?

আপনার কী মনে হয়?

একসঙ্গে কাজ করেন বলে কলিগ হিসেবে একটা সম্পর্ক তো মানুষের সঙ্গে মানুষের থাকেই। তেমন কিছু একটা হবে। অথবা এরচে' বেশি, ধরুন বন্ধুত্বের সম্পর্কও থাকতে পারে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব থাকে না?

না, আমার দেশে এই বয়সী যুবক যুবতীর বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুত্বের নামে অন্য কিছু হয়ে যায়।

আপনি বেশ গুছিয়ে কথা বলেন তো!

যুবরাজের এই প্রশংসার ধারে কাছে দিয়েও গেল না সাবিহা। বলল, আপনি যা অনুমান করছেন ফাহিমের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তারচে' অনেক বেশি। আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ।

কথাটা শুনে বেশ একটা ধাক্কা খেল যুবরাজ। এতটা সে আশা করেনি। হেসে বলল, অদ্ভুত ব্যাপার তো! আপনাদের দেখে একদম বোঝা যায় না যে আপনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ। আপনারা যেভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে একে অন্যের দিকে তাকান হাসাহাসি করেন তাতে মনে হয় আপনাদের আছে খুবই গোপন একটা সম্পর্ক যা লোকে জানুক আপনারা চান না।

সত্যি তাই। আমাদের বিয়ের কথাটা আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না। বিয়েটা লুকিয়ে করেছি আমরা। ফাহিমরা খুব বড়লোক। ওর বাবা কিছুতেই আমার মতো একটা নার্স মেয়ের সঙ্গে ডাক্তার ছেলেকে বিয়ে দিতে রাজি হবে না। কিন্তু ফাহিম আমার জন্য পাগল, আমি ফাহিমের জন্য পাগল। ফাহিমকে না পেলে আমি মরে যাব। এই জন্য গোপনে বিয়েটা আমরা করে রেখেছি।

www.shopnil.com

কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

এগারো মাস।

এখনও আপনার কিংবা ফাহিমের ফ্যামিলির কাউকে জানান নি!

না, তবে আমার ফ্যামিলিতে তো কোনও প্রবলেম নেই আমার, মা-বাবা আর তিনটি ভাই বোন গ্রামে থাকে। গ্রামে জায়গা জমি আছে আমাদের, মানে গৃহস্থালি আর কি! ওসবে বেশ ভালভাবেই চলে সংসার। আমি সংসারের বড় মেয়ে। আইএ পাস করার পর নার্সিংয়ে ঢুকেছি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছি। আমাকে নিয়ে আমার মা-বাবার তেমন কোনও মাথাব্যথা নেই। আমি আমার ইচ্ছেমতো বিয়ে করলে কেউ কিছু বলবে না আমাকে, কেউ কিছু মনে করবে না। কিন্তু ফাহিমের ব্যাপারটা তো এমন নয়।

কথাগুলো বলতে বলতে সাবিহার গলা কেমন ধরে এল। কেমন উদাস হয়ে গেল সে।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে এত মায়া লাগল যুবরাজের, বলল, আপনি অত মন খারাপ করবেন না। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কাল আপনাকে দেখার পর থেকে মনে হচ্ছে কোনও কিছু আর ঠিক হবে না।

কথাটা শুনে হঠাৎ করে যেন ইলেকট্রিক শক খেল যুবরাজ। বুকের ভেতরটা মোচর দিয়ে উঠল তার। আরে আমি কি তাহলে নিজের অজান্তে কোনও ক্ষতি করে ফেলেছি মেয়েটির! যুবরাজ বলল, আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। নিজের অজান্তে আমি কি আপনার কোনও ক্ষতি করে ফেললাম?

তা করেছেন! আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই উচিত ছিল।

আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ফাহিম খুব সন্দেহপ্রবণ ছেলে। ওর ধারণা ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে, প্রেম হওয়ার আগে অন্য কারও সঙ্গে আমার কোনও না কোনও সম্পর্ক ছিলই। আমি অস্বীকার করেছি। অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। যখন বুঝাই তখন সে বুঝে ঠিকই। আমার সঙ্গে হু হ্যাঁ করে। যেন আমার সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বেস করেছে সে। মেনে নিয়েছে। কয়েকদিন আর এই নিয়ে কথা বলে না। কিন্তু তারপর হঠাৎ আবার একদিন নতুন করে জানতে চায়। বল না আমার আগে...

কথাটা শেষ করতে পারে না সাবিহা। জলে চোখ ভরে আসে তার। মাথা নিচু করে চোখের জল সামলায় সে। ধরা গলায় বলে, আসলে এটা একটা ম্যানিয়া হয়ে গেছে ফাহিমের।

সাবিহাকে আশ্বস্ত করার জন্য যুবরাজ বলল, বিয়ে আপনাদের হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একত্রে ঘরসংসার করছেন না বলেও এমন হতে পারে। একসঙ্গে বসবাস শুরু করলে, বাচ্চা-কাচ্চা হলে এসব একদিন ঠিক হয়ে যাবে।

সে যে কবে হবে কে জানে!

তারপর একটু থেমে সাবিহা বলল, কিন্তু আপনাকে কাল এখানে দেখার পর ভীষণ একটা ভয় ঢুকে গেছে আমার মনে। সেই ভয়ে কাল সারারাত আমি ঘুমুতে পারিনি, ফাহিমের সঙ্গে আমার যাবতীয় সম্পর্ক বুঝি আপনার কারণেই ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে! ফাহিম এতকাল ধরে যে সন্দেহ আমাকে করে আসছে তাই বুঝি সত্যি হয়ে দাঁড়ায় এবার!

সাবিহার কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না যুবরাজ। হা করে সাবিহার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

সাবিহা সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করল। তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, আমার একটা গোপন ব্যাপারে একমাত্র সাক্ষী ছিলেন আপনি।

আবার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল যুবরাজ। আমি আপনার গোপন ব্যাপারের সাক্ষী! কী বলছেন ?

ঠিকই বলছি। একমাত্র আপনিই সাক্ষী। আপনাকে কাল একপলক দেখেই চিনতে পেরেছিলাম আমি। আপনার নাম যুবরাজ, মনে আছে আমার। ওই দিনের কথা কেমন করে ভুলে থাকব আমি। কেমন করে!

যুবরাজের হঠাৎ খুব সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করল। এরকম পরিস্থিতিতে জীবনে কখনও পড়েনি যুবরাজ। একজন মানুষ অবিরাম তার সম্পর্কে কিছু কথা বলে যাচ্ছে কিন্তু সেসব কথার একটি বর্ণও বুঝতে পারছে না যুবরাজ। এরচে' অসহায় অবস্থা আর কী হতে পারে মানুষের! যুবরাজ বোকার মতো সাবিহাকে জিজ্ঞেস করল, একটা সিগ্রেট হবে আপনার কাছে ?

কথাটা বলে ভেতরে ভেতরে শীতল হয়ে গেল যুবরাজ। এটা সে কী করল। বাঙালি মেয়েকে জিজ্ঞেস করছে, সিগ্রেট হবে আপনার কাছে! স্বাভাবিক অবস্থায় হলে ঠাট্টা করে কোনও মেয়েকে হয়তো কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারত যুবরাজ। কিন্তু এখনকার ব্যাপারটি ঠাট্টা নয়। খুবই অসহায় বোধ করছিল যুবরাজ। সিগ্রেট খেতে খুব ইচ্ছে করছে তার। ফলে সাবিহা পুরুষ কি মেয়ে কিছু না ভেবেই বলে ফেলেছে, সিগ্রেট হবে আপনার কাছে!

কথাটা উথড্র করার জন্য যখন সাবিহার মুখের দিকে তাকিয়েছে যুবরাজ, যুবরাজকে চরম অবাক করে সাবিহা বলল, হবে।

তারপর চাবি ঘুরিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলল। একটা বেনসান এন্ড হেজেজের প্যাকেট আর একটা ম্যাচ বের করে যুবরাজের দিকে এগিয়ে দিল। আমার ড্রয়ারে থাকে।

প্যাকেটে পাঁচ ছটা সিগ্রেট আছে। একটা সিগ্রেট নিয়ে ধরাল যুবরাজ। বড় করে একটা টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার। বুকের ভেতর জমে থাকা উত্তেজনাটা হালকা হয়ে গেল। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যুবরাজ বলল, আপনি স্মোক করেন ? ফাহিমের জন্য রাখি। যখন তখন

www.shopnil.com

আমার কাছে সিগ্রেট চায় ফাহিম। আসলে একত্রে সংসার আমরা করছি না ঠিকই কিন্তু যতক্ষণ এই নার্সিংহোমে থাকি, দুজন কাছাকাছি থাকি তখন আমাদের দুজনেরই মনে হয় এটাই আমাদের বাড়ি। এটাই আমাদের সংসার। কে যে কখন কার কাছে কী চেয়ে বসবে আমরা দুজনের কেউ তা জানি না। হয়তো ফাহিম আনমনে আমার কাছে সিগ্রেট চাইল কিংবা আমি চাইলাম পাঁচটা টাকা। অথবা আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা ফাহিমের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলিলাম, ধর তো একটু, আমি শাড়িটা ঠিক করে নিই। এ আমাদের আসলে এক ধরনের সংসার করাই, ময়ূরের সংসার। সারাদিন কাছাকাছি থাকে দুটো ময়ূর! রাতেরবেলা আলাদা হয়ে যায়।

ভীষণ মজার ব্যাপার তো!

মজার নয়। আমার জন্য চরম দুঃখের ব্যাপার। আমার নিয়তি বোধহয় এরকমই। ফাহিমের বউ হয়েও, সম্পূর্ণ বউ হয়ে ফাহিমের সংসারে যাওয়া এই জীবনে হয়তো আমার কোনওদিন হবে না। ওর মা-বাবা মেনে নেবে না আমাকে। দিন চলে যাবে। এই দিন চলে যাওয়ার ফাঁকে যতটুকু পারি, যেভাবে পারি, যেখানে পারি স্বামী নিয়ে সংসার করার স্বাদ আমি নিচ্ছি। কাল আপনাকে দেখার পর এই স্বাদ বিস্বাদ হয়ে গেছে আমার। আমার জীবনের একমাত্র গোপন কাজটির সাক্ষী আপনি। সেটা যদি ফাহিমের কানে যায় আমার এই অদ্ভুত সুখের সংসারজীবন মুহূর্তে ভেঙে যাবে। তারচে' বড় দুঃখ আমার জীবনে আর কিছুই হতে পারে না।

সিগ্রেট খাওয়ার ফলে মাথাটা হালকা হয়েছে যুবরাজের, বুকটা হালকা হয়েছে। ফলে সাবিহার কথায় বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হলো না সে। সরল গলায় বলল, ব্যাপারটা আমাকে একটু খুলে বলুন তো! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সত্যি বুঝতে পারছেন না, নাকি বুঝেও না বুঝার ভান করছেন ?

না, সত্যি না। স্যোয়ার অন গড। আমি আপনার সঙ্গে কোনও রকম চালাকি করছি না।

সাবিহা খুবই করুণ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল যুবরাজের মুখের দিকে। তারপর ফাঁকা শূন্য গলায় বলল, সিদ্দিকীর কথা মনে আছে আপনার ?

কোন সিদ্দিকী ?

উনিশ শো বিরাশি সালের প্রথম দিককার কথা ভাবুন। মোহাম্মদপুরে দু রুমের একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত সিদ্দিকী।

সঙ্গে সঙ্গে সিদ্দিকীর কথা মনে পড়ল যুবরাজের। এবং যুবরাজ খুশিতে প্রায় হৈ হৈ করে উঠতে গেল। মুখে আঙুল তুলে সাবিহা তাকে নিরস্ত করল। আস্তে, কেউ শুনে ফেলবে।

যুবরাজ বলল, মনে পড়ছে। সিদ্দিকী আমার বন্ধু ছিল।

আমি কিছুদিন সিদ্দিকীর বাসায় ছিলাম। সিদ্দিকীর ফ্ল্যাটে আপনি আমাকে একদিন দেখে ফেলেছিলেন।

যুবরাজ তীক্ষ্ণ চোখে সাবিহার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না।

সিদ্দিকীর ফ্ল্যাটে প্রায়ই ডেটিং করতে যেতাম আমরা।

আমরা মানে?

আমি এবং শোয়েব নামের একজন। সিদ্দিকীর বেডরুমে আমাকে আর শোয়েবকে আপনি...

সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল যুবরাজের। বাবা মারা যাওয়ার কিছুকাল পরের কথা। যুবরাজ তখন উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। একেকদিন একেক জায়গায় থাকে। কিছুদিন ছিল সিদ্দিকী নামের এক বন্ধুর বাসায়। মোহাম্মদপুরে। সিদ্দিকী ব্যাচেলর মানুষ। আরেক বন্ধুর সঙ্গে ছোট্ট ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত। নিজে টুকটাক ব্যবসা করত। বন্ধুটি কোথায় যেন কোন একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করত। সেই ফ্ল্যাটের একস্ট্রা একটা চাবি কিছুদিন যুবরাজের কাছে ছিল। যখন তখন ফ্ল্যাটে যেত সে। বেরিয়ে আসত। এক দুপুরে ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে। তারপর দ্রুত এগিয়ে গেছে সিদ্দিকীর রুমের দিকে। সিদ্দিকীর রুমের দরজা সামান্য ভেজান ছিল। দরজা ঠেলে মাত্র ভেতরে ঢুকেছে, ঢুকেই ছিটকে বেরিয়ে এসেছে! সিদ্দিকীর বিছানায় একজোড়া যুবক যুবতী। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। না, দৃশ্যটি আর দেখতে পারেনি যুবরাজ। মন খারাপ করে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসেছিল। তার জানা ছিল সিদ্দিকীর বন্ধুরা প্রায়ই তাদের প্রেমিকা নিয়ে ডেটিং করতে আসে এই ফ্ল্যাটে। দুচারজনকে দেখেছেও সে। চেনেও। কিন্তু এরকম একটি দৃশ্য একদমই আশা করেনি যুবরাজ। তবে দৃশ্যটা দেখে রাগ কিংবা বিরক্ত কিছু হয় নি যুবরাজ। তার কেবল মন খারাপ হয়েছিল। খুবই উদাস ভঙ্গিতে ড্রয়িংরুমে বসেছিল সে। খানিক পর সেই যুবক যুবতী পরিপাটি হয়ে বেরিয়ে এসেছিল সিদ্দিকীর রুম থেকে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল ডাইনিংস্পেসে আর ছেলেটি এগিয়ে এসেছিল যুবরাজের কাছে। খুবই বিনীত গলায় বলেছিল, ভাই কিছু মনে করবেন না। এসময় যে এই ফ্ল্যাটে কেউ আসবে আমাদের ধারণা...

যুবরাজ ছেলেটির মুখের দিকে না তাকিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি।

আমরা দুজনই কি আপনার কাছে মাপ চাইব?

কোনও দরকার নেই। বললাম তো আমি কিছু মনে করিনি।

তারপর কতদিন কেটে গেছে, ঘটনাটি আর মনে পড়েনি যুবরাজের। একদমই ভুলে গিয়েছিল সে। জীবনের কত ঘটনা যে ভুলে যায় মানুষ!

যুবরাজ বলল, সেই মেয়েটি তাহলে...

সাবিহা বলল, সেই মেয়েটি আমি।

শোয়েবের সঙ্গে আপনার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। হয়নি কেন?

শোয়েব মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্টে...

www.shopnil.com

যুবরাজ থতমত খেয়ে বলল, স্যাড।

সাবিহা বলল, ফাহিমকে পেয়ে শোয়েবের কথা ভুলেছি আমি। কাল আপনাকে দেখার পর থেকে শোয়েবের কথা মনে পড়েছে আমার। শোয়েবকে মনে পড়ার চেয়েও ভয়টা হচ্ছে বেশি। আমার ওই একটি ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষী আপনি। ফাহিমের সামনে আপনি যখন বলছিলেন, আমাকে আপনার খুব চেনা চেনা লাগছে, ভয়ে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ওসব তো আমি ইয়ার্কি করে বলেছি। ওই ঘটনার নায়িকাটি যে আপনি এ তো আমার মনেই ছিল না। তাছাড়া আপনার তো মনে থাকা উচিত আপনার মুখের দিকে আমি সেদিন তাকিয়েও দেখিনি।

তা দেখেন নি। কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছিলাম এইজন্য আপনাকে কাল এখানে দেখেই...

কথাটা শেষ করতে পারল না সাবিহা। জলে চোখ ভরে এল তার। মাথা নিচু করে সাবিহা বলল, ফাহিম খুব সন্দেহপ্রবণ। ও যদি কোনওভাবে শোয়েবের কথা জানে তাহলে আমার যাবতীয় স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। শোয়েবকে হারানোর দুঃখ ফাহিমকে পেয়ে ভুলেছি আমি। ফাহিমকে হারাবার দুঃখ কাকে পেয়ে ভুলব! কতবার ভালবাসার মানুষ বদলাব আমি!

সাবিহা হু হু করে কাঁদতে লাগল।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে যুবরাজ খুব অসহায় বোধ করে। কী করবে বুঝতে পারে না।

টেবিলের ওপর সিগ্রেটের প্যাকেট এবং ম্যাচ পড়ে আছে। যুবরাজ সিগ্রেটের জন্য হাত বাড়াল। সেই হাতটা দুহাতে আঁকড়ে ধরল সাবিহা। কাঁদতে কাঁদতে জড়ানো গলায় বলল, আপনি এখান থেকে চলে যান যুবরাজ সাহেব। প্লিজ চলে যান! কখনও কোনও মুহূর্তে যদি ফাহিমের সামনে...

এবার পিতা কিংবা পিতৃস্থানীয় লোকের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল যুবরাজ। ডানহাতটা খুবই মায়াময় ভঙ্গিতে রাখল সাবিহার মাথায়। নরম কোমল গলায় বলল, তুমি ভয় পেয়ো না সাবিহা। আমি বেঁচে থাকতে তোমার স্বপ্ন ভাঙবে না। ফাহিম তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। যতদূরেই থাকি, তোমার সঙ্গে থাকব আমি। তোমার যাবতীয় বিপদে আমাকে তুমি পাশে পাবে। আমি তোমার শত্রু নই। বন্ধু।

রিখুকে দেখে মা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন রিখুর দিকে। রিখু আজ শাড়ি পরেছে। সুন্দর করে সেজেছে। রিখু ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যেন উজ্জ্বল হয়ে গেছে নার্সিংহোমে ওমরের এই রুম। এটা যে নার্সিংহোমের একটি রুম, এখানে যে অসুস্থ শরীর নিয়ে শুয়ে আছে একজন মানুষ এই মুহূর্তে রিখুকে

দেখে কথাটা কারও মনে পড়বে না। কেউ বিশ্বেস করবে না। মা-ও ভুলে গেলেন তার ছেলে ওমর কাল থেকে এই রুমে আছে। সে অসুস্থ। মার মনে পড়ল তাঁর প্রথম যৌবনের কথা। বিয়ের কিছুদিন আগ থেকে বিয়ের পরও বছর তিন চারেক আজকের রিখুর মতো দেখতে ছিলেন তিনি। কী যে সুন্দর! আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে পরিচিত আধা পরিচিত যে কেউ তাঁকে দেখে তখন মুগ্ধ হয়ে যেত। ওমর রিখুর বাবাও যখন তখন স্ত্রীর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন। এই কারণে ভদ্রমহিলার নিজেরও ছিল, প্রথম থেকেই ছিল না, লোকমুখে নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনতে শুনতে এক সময় তৈরি হয়েছিল বেশ একটা অহঙ্কার। যদিও অহঙ্কারটি তিনি কখনও প্রকাশ করতেন না। তবে কেউ তাঁর সামনে অন্য কোনও নারীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে ঈর্ষায় বুকের ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে যেত তাঁর। প্রশংসিত সেই মানুষটিকে দেখবার জন্য পাগল হয়ে যেতেন তিনি। আর যদি কোনওক্রমে সেই মানুষটিকে দেখে ফেলতে পারতেন তাহলে সেই মানুষটির চেহারা মনের ভেতর এঁকে রেখে নিজে দীর্ঘক্ষণ ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে মানুষটির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখতেন। মানুষটি তারচে' বেশি সুন্দর হলেও তাঁর কিছুতেই তা মনে হতো না। তিনি তা মেনে নিতে পারতেন না। হায় কোথায় চলে গেছে সেই সোনালি বয়স! সোনালি দিন! সোনালি জীবন! সৌন্দর্য নিয়ে সেই ঈর্ষা কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে তাঁর! মা মনে মনে বললেন, আহা আবার যদি ফেরা যেত সেই বয়সে! সেই দিনে, সেই জীবনে! সৌন্দর্য নিয়ে আবার যদি নামা যেত ওরকম ঈর্ষায়। না, তা আর হবার নয়। জীবন থেকে সময় একবার চলে গেলে সেই সময় আর কখনও ফিরে আসে না।

বাবা বললেন, কী হলো, রিখুকে দেখে তুমি কি আমার মতো মুগ্ধ হয়ে গেলে?

কথাটা শুনে বাস্তবে ফিরে এলেন মা। অনেকক্ষণ পর চোখে পলক ফেললেন তিনি। সামান্য কেঁপে উঠলেন। মৃদু হেসে বললেন, দেখেছ কী সুন্দর লাগছে আমার মেয়েটিকে?

মার কথা শুনে একটু বুঝি লজ্জা পেল রিখু। লাজুক হেসে মাথা নোয়াল সে। ভঙ্গিটা এত মনোমুগ্ধকর, মুহূর্তে আরও বেশি সুন্দর হয়ে গেল রিখু।

বাবা বললেন, আজ সকালে রিখুকে প্রথম দেখে তো আমি একদম চমকে উঠেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল সময়টা বুঝি এখন নয়। বিশ বাইশ বছর আগে। এবং আমার সামনে রিখু নয় তুমি দাঁড়িয়ে আছ।

কথাটা শুনে মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বাবা বললেন, বিয়ের পর পর তুমি ঠিক এরকম দেখতে ছিলে। মেয়েটির সঙ্গে তোমার খুব মিল।

আমার মেয়ে আমার সঙ্গে মিল হবে না!

আমারও তো মেয়ে!

www.shopnil.com

তখুনি হঠাৎ করেই যেন ওমরের কথা মনে পড়ল বাবার। বাবা বললেন, ওমর কই?

মা বললেন, বাথরুমে ঢুকেছে। আমাকে বলল গোসল করবে।

কী বলছ?

হ্যাঁ! ওমর তো একদম ভাল হয়ে গেছে। সকালবেলা একা একা বাথরুমে গেল। আর আমাকে বলছে আজই বাড়ি চলে যাবে। এখানে থাকতে ওর ভাল লাগছে না।

কিন্তু সে তো ফিজিক্যালি আনফিট।

আমি বলেছিলাম। বলল, না, আমি ঠিক হয়ে গেছি। বাড়ি গিয়ে দুচারদিন রেস্ট নিলে একদমই সেরে যাব।

কিন্তু ওমরকে দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে? মানে তোমার কি মনে হচ্ছে যে ওমর যা বলছে তা ঠিক?

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। শুধু ঠোঁটের ওটুকু জায়গা আর মুখের দুএকটা জায়গা ছাড়া ওকে দেখলে কেউ বলবে না যে গতকালই ওরকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল ওমরের জীবনে।

কথাগুলো শুনে বাবা খুব খুশি হয়ে গেলেন। ভুলে গেলেন এটা নার্সিংহোম। এখানে সিগ্রেট খাওয়া নিষেধ। পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করলেন তিনি। সিগ্রেট ধরালেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ওই ছেলেটি আসেনি?

মা অবাক হয়ে বললেন, কোন ছেলেটি?

ওই যে, আহা কী যেন নাম!

রিখু চঞ্চল স্বরে বলল, যুবরাজ।

না, এখনও আসেনি। ওমর আসলে যুবরাজের জন্যই অপেক্ষা করছে। যুবরাজ এসে গেলে তোমরা এখানে পৌঁছুবার আগেই হয়তো ওমরকে নিয়ে বাড়ি চলে যেতাম আমি, তোমাদেরকে চমকে দিতাম।

হেসে সিগ্রেট টান দিলেন বাবা।

মা বললেন, যুবরাজ আসতে দেরি করছে দেখেই বাথরুমে ঢুকল ওমর। বলল, শরীর খুব নোংরা লাগছে। পুরোপুরি গোসল করব না। শরীর ধুয়ে ফেলব। জামা কাপড়গুলোও নোংরা হয়ে গেছে। বদলাতে হবে।

বদলাবে কেমন করে! এখানে ওর জন্য জামাকাপড় আছে নাকি?

রিখু বলল, আছে। সকালবেলা আমি ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

বাবা বললেন, কিন্তু আমাকে যে বললে না?

মা বললেন, এটা আবার বলার কী হলো!

বাবা আবার সিগ্রেটে টান দিলেন। তাহলে এখন যুবরাজের জন্য অপেক্ষা! যুবরাজ এলেই ওমরকে নিয়ে বাড়ি যেতে পারি আমরা!

ঠিক আছে, আমি তাহলে নিচে অফিস রুমে গিয়ে ওদের বিলটিল পে করে আসি!

রিখু হঠাৎ করে বলল, মামণি, তুমিও পাপার সঙ্গে যাও। আমি এখানে আছি। ভাইয়া বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে কী করে, আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে!

বাবা বললেন, ঠিক আছে। রিখু থাক, চল আমরা যাই।

মা-বাবা বেরিয়ে গেলেন।

রিখু মনে মনে বলল, ইস্, ভাইয়া বাথরুম থেকে বেরুবার আগে যদি যুবরাজ এসে রুমে ঢুকত! যদি একাকী দুজনে দুজনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পেতাম আমরা!

তারপর মনে মনে যুবরাজকে ডাকতে লাগল রিখু। যুবরাজ এস। এস। এসে দেখ তোমার জন্য কী সুন্দর করে সেজেছি আমি! কী উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি তোমার জন্য! তুমি এস। এস।

ওমরের রুমে ঢুকে থতমত খেয়ে গেল যুবরাজ। ফাঁকা শূন্য রুমে কেবল রিখু বসে আছে। রিখুকে দেখে চোখে পলক পড়ে না যুবরাজের। মনে হয় না রিখু কোনও মানুষ। ওমরের রুমটাকে মনে হয় না মানুষের তৈরি কোনও পার্থিব বস্তু। মনে হয় রুমটা আসলে স্বর্গোদ্যান। রিখুকে মনে হয় স্বর্গোদ্যানে ফুটে থাকা কোনও অলীক ফুল। মানুষ কি কখনও ফুলের মতো সুন্দর হতে পারে! পারে। নিশ্চয় পারে। এই যেমন রিখু। রিখুকে দেখে এই মুহূর্তে কে বলবে রিখু কোনও মানুষ! কে বলবে না রিখু আসলে সম্পূর্ণ ফুটে ওঠা কোনও ফুল! নিজের অজান্তে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো রিখুর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল যুবরাজ। ভুলে গেছে রিখুর সঙ্গে তার অনেক কথা আছে। অনেক কথা। রিখু কি যুবরাজের সব কথা শুনবে!

রিখুকে দেখে যুবরাজের যেরকম মনে হলো যুবরাজকে দেখেও ঠিক তেমনই মনে হলো রিখুর। মনে মনে যুবরাজকে রিখু ডেকেছিল, ভুলে গেল। ভাইয়ার রুমে যুবরাজকে ঢুকতে দেখে থতমত খেয়ে গেল সে। নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়াল। যুবরাজকে দেখে চোখে পলক পড়ে না রিখুর। মনে হয় না যুবরাজ কোনও মানুষ। ভাইয়ার রুমটাকে আর মনে হয় না মানুষের তৈরি কোনও পার্থিব বস্তু। মনে হয় রুমটা আসলে স্বর্গোদ্যান। যুবরাজকে মনে হয় স্বর্গোদ্যানে এইমাত্র ফুটে ওঠা কোন অলীক ফুল। মানুষ কি কখনও ফুলের মতো সুন্দর হতে পারে! পারে। নিশ্চয় পারে। এই যেমন যুবরাজ। যুবরাজকে দেখে এই মুহূর্তে কে বলবে যুবরাজ কোনও মানুষ! কে বলবে না যুবরাজ আসলে সম্পূর্ণ ফুটে ওঠা কোনো ফুল! নিজের অজান্তে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো যুবরাজের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল রিখু। ভুলে গেল যুবরাজের সঙ্গে তার অনেক কথা আছে। অনেক কথা। যুবরাজ কি রিখুর সব কথা শুনবে!

খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দুজন মানুষ তখন সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে ছিল দুজনের দিকে। কারও চোখের পলক পড়ে না। কারো হৃদয়ের কোনও শব্দ হয় না। দুজনেরই কেবল মনে হয় মুহূর্তে পেরিয়ে যাচ্ছে অনন্তকাল। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে। একসময় নিজেদের অজান্তে কথা বলতে শুরু করল দুটি হৃদয়। মানুষ দুটি দাঁড়িয়ে রইল সম্মোহিতের মতো। মুহূর্তের জন্য নড়ে না তাদের ঠোঁট। চোখে পলক পড়ে না। কেবল হৃদয় তাদের কথা বলে হৃদয়ের সঙ্গে।

যুবরাজের হৃদয় বলল, রিখু, তুমি জান না তুমি কী সুন্দর!

মুহূর্তে জবাব দিল রিখুর হৃদয়। তুমিও তো জান না যুবরাজ তুমি কী সুন্দর! এতটা বয়স হলো আমার, চারপাশে কত রকমের যুবক দেখে বড় হয়ে উঠলাম আমি, কই, তোমাকে দেখার আগে কাউকে দেখে তো এমন লাগেনি আমার। কাউকে দেখে তো মনে হয়নি মানুষটি জন্মেছে আমাকে ভালবাসার জন্য। আমি জন্মেছি ওই মানুষটিকে ভালবাসার জন্য। কখনো তো কারও কথা ভেবে রাত কেটে যায়নি আমার। কারও কথা ভেবে ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পরপরই মনে হয়নি মানুষটার জন্য আমার আজ খুব সুন্দর করে সাজতে হবে। যেন সে আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। চোখ ফেরাতে না পারে। তোমার জন্যে যুবরাজ, শুধু তোমার জন্যে ভোরবেলা উঠে গোসল করেছি আমি। জীবনের প্রথম শাড়ি পরেছি। সবচে' বড় কথা হল ঘুম ভাঙার পরপরই আমার মনে পড়েছে তোমার কথা। এরকম করে কারও কথা কখনও মনে পড়ে নি আমার।

যুবরাজের হৃদয় বলল, আমারও ঘুম ভাঙার পরপরই মনে পড়েছে তোমার কথা। এরকম করে কারও কথা কখনও মনে পড়েনি আমার। তোমার কথা ভেবে কালরাতে পালিয়ে যেতে চেয়েও পালিয়ে যেতে পারিনি আমি। সকালবেলা উঠে দীর্ঘক্ষণ ধরে গোসল করেছি, পরিচ্ছন্ন হয়েছি শুধু তোমার কথা ভেবে। তোমাকে দুচোখ ভরে দেখবার জন্য আকুল হয়েছিলাম আমি। বাবা মারা যাওয়ার পর এই এতগুলো দিন কতসব জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি আমি কত রকমের মানুষের সঙ্গে মিশেছি। কত রকমের মানুষ দেখেছি। তাদের মধ্যে যুবতী মেয়েও তো ছিল কত। তাদের কেউ কেউ দেখতেও ছিল সুন্দর। আমার ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহও দেখিয়েছে দুএকজন। আমি পাত্তা দিইনি। ভুল করেও ফিরে তাকাইনি তাদের দিকে। কেবল তুমি, তুমি প্রথম। তোমাকে দেখে আপাদমস্তক কেঁপে উঠেছিলাম আমি। চমকে উঠেছিলাম। অনেক চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারিনি তোমার দিক থেকে। তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে তুমি জন্মেছ আমাকে ভালবাসার জন্য। আর আমি, আমি জন্মেছি কেবল তোমাকে ভালবাসার জন্য। তোমাকে দেখেই টের পেয়ে গেছি পৃথিবী আসলে আমাদের পুরনো দুঃখের পৃথিবী নয়। পৃথিবী আসলে মনোরম কোনও স্বর্গনগরী। এই নগরীর সবগুলো দরজা এতকাল বন্ধ ছিল আমার জন্য। সেই বন্ধ দরজার চাবি হাতে

www.shopnil.com

তুমি এসে দাঁড়িয়েছ আমার সামনে। তোমার খোলা মুঠোয় আছে, আমার স্বপ্ন দরজার সবগুলো চাবি। রিখু এতকাল কোথায় ছিলে তুমি! কোথায় লুকিয়ে ছিলে! তোমার সঙ্গে দেখা হলে এই জীবন আরও অনেক কাল আগেই অন্যরকম হয়ে যেত আমার। অনেককাল আগেই আমি জেনে যেতাম কোনখানে আছে স্বপ্নের ঘরবাড়ি! ভালবাসার পৃথিবী! রিখু, কেন আরও অনেক আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি?

রিখুর হৃদয় বলল, আমিও তো তাই বলি। কেন আরও অনেককাল আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তাহলে ভালবেসে আরও সুন্দর হয়ে যেতাম আমি। যুবরাজ একটা কথা বলো তো আমাকে, আমি যে খানিক আগে আমার যাবতীয় ভালবাসা এবং আবেগ দিয়ে তোমাকে ডেকেছিলাম তুমি কি তা শুনতে পেয়েছিলে?

পেয়েছিলাম। যুবরাজের হৃদয় বলল, পেয়েছিলাম। হৃদয়ের অনেক ভেতর থেকে তোমার সে ডাক শুনতে পেয়েছিলাম আমি। সেই ডাক শুনতে পেয়েই তো পাগলের মতো তোমার কাছে ছুটে এসেছি আমি। হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে এরকম ডাকার মানে কী রিখু?

হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে এরকম ডাকার মানেই তো ভালবাসা। এখন থেকে যখন-তখন এরকম করে তোমাকে ডাকব আমি।

ডেক। আজ থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তোমার সেই ডাকের অপেক্ষায় থাকব আমি। যেখানেই থাকি, যতদূরে থাকি, তোমার ডাক হৃদয়ের ভেতর থেকে শুনতে পেলেই সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তোমার কাছে ছুটে আসব আমি। পৃথিবীর কোনও শক্তি ধরে রাখতে পারবে না আমাকে, আটকে রাখতে পারবে না। যুবরাজের হৃদয়ের এসব কথা শুনে চমকে উঠল রিখুর হৃদয়। বলল, তাহলে কি তুমি আমাকে ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছ?

যুবরাজের হৃদয় বলবার আগেই দুজনের খুব কাছ থেকে কেউ ডাকল, রিখু!

প্রথম ডাকটা ওরা কেউ শুনতে পেল না।

কণ্ঠস্বরটি আবার ডাকল, রিখু!

এবার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল ওরা দুজন। মুহূর্তে কেটে গেল সম্পূর্ণ ঘোর। চোখে পলক পড়ল, দুজনার হৃদয়ে শব্দ হতে লাগল। একই সঙ্গে কণ্ঠস্বরটির দিকে চোখ ফেরাল ওরা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে কখন যে ওমর এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে, ওরা কেউ তা খেয়াল করেনি। এখন ওমরকে দেখে ছিটকে দুদিকে সরে গেল দুজন।

যুবরাজের দিকে তাকাল না ওমর। তাকাল রিখুর দিকে। তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বলল, বাহ্, শাড়িতে তো বেশ লাগে তোকে! রিখু কোনও কথা বলল না। মুচকি হেসে মাথা নিচু করল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ভয়ও পেয়ে বসল তাকে, ভাইয়া যুবরাজের একেবারে বুকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে রিখুকে। চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা দুজন। এই নিয়ে ভাইয়া যদি রিখুকে কিছু বলে!

কিন্তু ওমর এসবের ধারে কাছে দিয়েও গেল না। জিজ্ঞেস করল, তুই কি একা এসেছিস নাকি রিখু?

রিখু চঞ্চল চোখ তুলে সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ সময়ের জন্য যুবরাজের দিকে তাকাল। তারপর ওমরের দিকে তাকিয়ে বলল, না, পাপাও এসছে!

পাপা কোথায়?

মামণি আর পাপা নিচে অফিস রুমে গেছে।

ওমর ভুরু কুঁচকে বলল, অফিস রুমে কেন?

বিল-ফিল পে করতে। তুমি নাকি আজই বাড়ি চলে যেতে চাইছ। এজন্যই তো মামনি আর পাপা...

কথাটা শেষ করতে পারল না রিখু। ওমর বলল, ঠিক আছে। তুই যা, গিয়ে ড্রাইভারকে পাঠা। সব নিয়ে গাড়িতে তুলুক।

আচ্ছা।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে আরেকবার চোখ তুলে যুবরাজের দিকে তাকাল রিখু। ঠোঁটে মিষ্টি একটা হাসি ফুটে উঠল তার। হাসিটা ওমর দেখতে পেল না। যুবরাজ ঠিক দেখল।

গাড়ি পার্ক করে এক মুহূর্তও দেরি করল না মুনা, পাগলের মতো ঢুকে গেল নার্সিংহোমে। অফিস রুম থেকে মাত্র বেরিয়েছেন ওমরের মা-বাবা, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবেন, তাঁদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে অফিস রুমে ঢুকে গেল সে। মেয়েটির আচরণে মা-বাবা দুজনেই একটু মনক্ষুণ্ন হলেন।

বাবা বললেন, আশ্চর্য মেয়ে তো, গায়ের ওপর এসে পড়ে, সরিও করে না। দেখে তো ভদ্রলোকের মেয়েই মনে হয়। বিহেভ শেখেনি নাকি!

মা মুগ্ধ হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বোঝা যায় মেয়েটিকে দেখে খানিকটা আনমনা হয়েছেন তিনি। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন, আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো এরকমই হয়। মেয়েটি হয়তো খেয়ালই করেনি আমাদের।

কেন, খেয়াল করবে না কেন! জলজ্যান্ত দুটো মানুষ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এটা তো চোখে না দেখবার কোনও কারণ নেই।

এমনও তো হতে পারে মেয়েটির খুব কাছের কেউ ভীষণ অসুস্থ, এখন অন্য কোনও দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয়ার সময় নেই তার।

যাই হোক, মানুষের একটা মিনিমাম...

কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি, মা বললেন, কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করেছ। মেয়েটার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ?

www.shopnil.com

না তো! কেন, কী হয়েছে?

দেখ না। তারপর বলছি।

তখনও অফিস রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। সেখান থেকে আড়চোখে অফিস রুমের ভেতর মেয়েটার দিকে তাকালেন বাবা। তাকিয়ে একটু বুঝি আনমনা হলেন। এবং খানিক আগে মেয়েটির ওপর প্রচণ্ড রাগ করেছেন তিনি, মেয়েটির বিহেভ ইত্যাদি নিয়ে কথা বলছিলেন ভুলে গেলেন। সরাসরি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

মুনা তখন অফিস রুমে বসা একাউনটেন্ট কাম ক্লার্ক লোকটির সঙ্গে কথা বলছে।

মা বললেন, কী হলো?

মার দিকে না তাকিয়েই বাবা বললেন, মেয়েটি খুব সুন্দর।

এজন্যই তোমাকে দেখতে বলেছিলাম। খুব সুন্দর মানে কী, অদ্ভুত সুন্দর। যেমন চেহারা তেমন ফিগার।

আজকালকাল মেয়েরা খুব ফিগার-সচেতন।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ছোট ছোট মেয়েগুলো, মানে কিশোরী মেয়েগুলোও আজকালকার চমৎকার সব ফিগারের। ডায়েট কন্ট্রোল করে, একসারসাইজ করে। এটা হচ্ছে আধুনিকতার লক্ষণ। তার মানে এই জেনারেশানটা আমাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর। তুমি লক্ষ করবে এদের প্যানপ্যানানিও কম। আই মিন এদের কোনও ভান ভণিতা নেই। কায়দাকানুন নেই। যাই করে সরাসরি করে। এদের লুকোছাপা কম।

সব কিছু সরাসরি ভাল নয়। এই জেনারেশানের একটা জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে, প্রেম ভালবাসা ইত্যাদির ব্যাপারে এরা বড় বেশি খোলামেলা।

সত্যি আমাদের সময়ে অতটা খোলামেলা ছিল না। এসব ব্যাপারে আমরা মনে করতাম ব্যাপারটা লুকোছাপার। লুকোছাপার ব্যাপার ছিল বলেই আমাদের সময়কার প্রেম ভালবাসায় রহস্যময়তার অন্ত ছিল না। রোমাঞ্চের অন্ত ছিল না। প্রেম ভালবাসায় যদি রহস্যময়তাই না থাকল, রোমাঞ্চই না থাকল তাহলে ওসবে আর মজা কোথায়!

বাবা কিছু একটা বলতে যাবেন তখুনি প্রায় ছুটে অফিস রুম থেকে বেরুল মুনা। বেরিয়ে কোনওদিকে না তাকিয়ে গট গট করে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। মা-বাবা দুজনেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন মুনার দিকে। ভুলে গেলেন খানিক আগেই জেনারেশান গ্যাপ ইত্যাদি নিয়ে খুবই সিরিয়াস আলোচনায় মগ্ন হয়েছিলেন তাঁরা।

মুনা সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাওয়ার পর বাবা বললেন, শাড়িতে মেয়েদের সৌন্দর্যই খুলে যায়। রিখুকে দেখলে না, শাড়ি পরার ফলে রিখুকে আর আগের রিখুই মনে হলো

না আমার। মনে হলো এ অন্য কোনও রিখু। রিখু যে এতটা সুন্দর, শাড়ি না পরলে আমার কখনও তা চোখেই পড়ত না। এই মেয়েটিকেও দেখ শাড়ি পরার ফলেই এত বেশি সুন্দর লাগছে তাকে। অন্য পোশাক পরে থাকলে মেয়েটি হয়তো আমার চোখেই পড়ত না।

শাড়িটায় মেয়েটিকে খুব মানিয়েছে।

হ্যাঁ। যখন আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল মনে হলো মোগল আমলের কোনও রানী হেঁটে গেল।

কিন্তু মেয়েটি লাল শাড়ি পরে নার্সিংহোমে এসেছে কেন। চেহারায় বেশ একটা উৎকণ্ঠা, কিন্তু লাল শাড়ি এবং সাজগোজ দেখে চেহারার উৎকণ্ঠাটা মিলাতে পারছি না আমি। মনে হচ্ছে কোথায় যেন রহস্যময় কিছু একটা।

বাবা হেসে বললেন, অতিরিক্ত পড়াশুনার ফলে প্রতিটি জিনিস নিয়ে তোমার চিন্তাভাবনা একটু বেশি। একটি সরল জিনিসকেও ভাবতে ভাবতে রহস্যময় করে তোল তুমি। বিভিন্ন এঙ্গেলে ভাবলে যে কোনও সরল বিষয়ও জটিল হয়ে যেতে বাধ্য।

মা উদাস গলায় বললেন, যে কোনও বিষয়কে বিভিন্ন এঙ্গেলে ভাবাই ভাল।

তাহলে রিখু যে আজ শাড়ি পরেছে, এত সাজগোজ করে নার্সিংহোমে এসেছে আমরা কি ধরে নেব এর মধ্যেও কোনও রহস্য আছে?

মা নির্বিকার গলায় বললেন, থাকতেও পারে।

নিজের বেডে বগলের নিচে দুটো বালিশ দিয়ে কাত হলো ওমর। গোসল করার ফলে, ধোয়া জামাকাপড় পরার ফলে তাকে খুব ফ্রেশ লাগছে। নিচের ঠোঁটের স্টিচ দেয়া জায়গাটা ছাড়া খুব খেয়াল করে না দেখলে ওমরের জীবনে যে কাল ঘটে গেছে ওরকম একটা ব্যাপার কেউ তা মনে করবে না।

সরাসরি যুবরাজের চোখের দিকে তাকিয়ে ওমর বলল, আমার মোটর সাইকেল কই?

সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের মনে পড়ল মোটর সাইকেলটা যে কালরাতে হোটেলে রেখেছে, সকালবেলা সেটার আর খোঁজ নেয়া হয়নি। হেলমেট আর চাবি রয়ে গেছে হোটেলের রুমে। তবুও ঘাবড়াল না যুবরাজ। সে-ও সরাসরি তাকাল ওমরের চোখের দিকে। নির্বিকার গলায় বলল, আমার কাছে।

আমার চেন?

আমার কাছে।

মানিব্যাগ?

আমার কাছে। ওখান থেকে একটি পয়সাও ব্যয় করিনি আমি। একশো টাকা নিয়েছিলাম সেটা আবার জায়গামতো রেখে দিয়েছি।

www.shopnil.com

না রাখলেও পারতেন।

জি!

বললাম, না রাখলেও পারতেন। আপনি আমার জন্য যা করেছেন...

যুবরাজ হেসে বলল, তার মূল্য একশো টাকা।

কথাটা শুনে ওমর হেসে ফেলল। সত্যি আপনি ওভাবে না তুলে আনলে আমি হয়তো আরও বড় রকমের কোনও বিপদে পড়ে যেতে পারতাম। আপনি আমাকে সেভ করেছেন।

কিন্তু এখন আপনি আমাকে সেভ করুন।

কথাটা শুনে চমকে উঠল ওমর। আপনাকে আবার সেভ করার কী হলো?

আমি তো আপনার ব্যাপারে কিছুই জানি না। আপনি ওভাবে মার খেয়ে ওরকম একটা জায়গায় পড়েছিলেন, আমি কিছু না বুঝেই আপনাকে তুলে নার্সিংহোমে নিয়ে এসছি। আপনাদের বাড়িতে টেলিফোনে খবর দিয়েছি। আপনার সম্পর্কে কিছুই না জেনে বানিয়ে বানিয়ে বলেছি আপনাকে হাইজ্যাকাররা ধরেছিল। আপনার জিনিসপত্র সব ছিনিয়ে নিয়ে মেরে আপনাকে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল যেন আপনি গাড়ি চাপা পড়েন ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। আমি মোটর সাইকেল নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম, রাস্তায় আপনাকে পড়ে থাকতে দেখে তুলে নার্সিংহোমে নিয়ে এসছি।

ওমর হেসে বলল, আপনি খুবই ক্রিয়েটিভ লোক দেখছি। গল্পটা জবরদস্ত বানিয়েছেন।

কাল আপনি তো কোনও কথা না বলে বাঁচিয়েছেন আমাকে। প্রতিটি গল্প বলবার সময় ভেতরে ভেতরে ভয়ে শীতল হয়ে যাচ্ছিলাম আমি এই বুঝি আপনি চিৎকার করে বলেন, না, সব মিথ্যে কথা। তাহলে আমার যে কী অবস্থা হতো!

ওমর বলল, আমার কানে যে আপনার ওসব গল্প আসেনি তা নয়। দুএকবার ইচ্ছেও হয়েছে বলি যে ছেলেটি, আসলে তো আপনার নাম জানি না, নামটা তো আজ সকালে জানলাম মামণির মুখ থেকে। ধরা প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। যা হোক কোনওক্রমে পার পেয়েছি। যা বলছিলাম, দুএকবার ইচ্ছে হয়েছে বলি এসব বানোয়াট গল্প। এরকম কিছুই ঘটেনি আমার। যা ঘটেছে তা পুরো অন্য ব্যাপার।

বললেন না কেন?

আপনার কথা ভেবে খুব মায়া লাগল। মনে হলো একটা অচেনা অজানা লোক এভাবে তুলে এনে জানটা বাঁচাল আমার, কেন তার অনিষ্ট করব। বলুক না সে, বানোয়াট গল্প বলুক না। আসল ঘটনা কী হয়েছে সে তো কেবল আমি জানি। তাছাড়া আপনি আমার জন্য এতটা করলেন, আপনাকে মিথ্যেবাদী বানিয়ে বিপদে ফেলে লাভ কী আমার।

www.shopnil.com

ওমরের কথা শুনে কাল বিকেল থেকে বুকের ভেতর আটকে থাকা শ্বাসরুদ্ধকর একটা ভাব মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল যুবরাজের। দুহাতে ওমরের একটা হাত জড়িয়ে ধরে বড় করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই।

যুবরাজের হাতের ওপর অন্য হাতটা দিয়ে আস্তে আস্তে দুটো চাপর মারল ওমর। আরে কে কার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব তো আমি। আপনি আমাকে জানে বাঁচিয়েছেন। ও ভাল কথা, এখন থেকে আপনি কিন্তু আর চলবে না। তাহলে ধরা পড়ে যাব।

ওমরের হাত ছেড়ে দিয়ে যুবরাজ বলল, সিগ্রেট হলে খুব জমত।

তাই তো। আছে আমার কাছে। দাঁড়াও।

ওমর তার বিছানার একপাশ থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করল। ওমরের প্যাকেট থেকে সিগ্রেট নিয়ে যুবরাজ বলল, সিগ্রেট পেলে কোথায়?

কাল থেকেই পকেটে ছিল।

তুমি তোমার মা-বাবার সামনে সিগ্রেট খাও?

না। কাল থেকে তো খাইনি। পকেটে ছিল। সকালবেলা বাথরুমে যাওয়ার সময় বিছানার তলায় রেখে গিয়েছিলাম।

ওরা দুজনে একসঙ্গে সিগ্রেট ধরাল।

যুবরাজ বলল, কিন্তু তোমার মূল ঘটনাটা তো জানা হলো না আমার। কী হয়েছিল আমাকে একটু বল।

বলব বলব। আস্তে ধীরে সব জানতে পারবে। এখুনি বাড়ি ফিরে যাব আমি। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। তারপর তোমাকে আমি সব বলব। তার আগে তোমার সম্পর্কে বল। তোমার সম্পর্কে কিছুই তো জানি না আমি।

সিগ্রেটের ধোঁয়া উড়িয়ে যুবরাজ বলল, সেটাও না হয় পরে শুনো। কিছু কথা জমা হয়ে থাকল, পরে একসময় বলা যাবে। একবারে সব কথা শেষ হয়ে গেলে পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলে কী বলব। কোন কথা!

মানুষের কথার কখনও অভাব হয় না। যখুনি একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয় তখুনি তাকে বলবার মতো তৈরি হয় কিছু কথা। নয়ত মানুষ কথা বলা শেখার পর কত হাজার লক্ষ বছর কেটে গেছে, একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার বলেছে মানুষ, তবুও মানুষের কথা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি, ফুরিয়ে যায়নি। তেমন হলে কতকাল আগেই তো কথা বলা বন্ধ করে দিত মানুষ।

তবুও সব কথা না বলাই ভাল। কিছু কথা লুকিয়ে থাক হৃদয়ের গভীরে।

তুমি খুব সুন্দর করে কথা বল। তুমি দেখতেও খুব সুন্দর।

ওমরের এসব কথার ধারে কাছে দিয়েও গেল না যুবরাজ। সে বলল সম্পূর্ণ অন্য কথা। তোমার জিনিসপত্র সব হাইজ্যাকাররা নিয়ে গেছে ইত্যাদি তো বানিয়ে বলে দিয়েছি আমি, কিন্তু জিনিসগুলো তো আমার কাছে, ওসব এখন কেমন করে ম্যানেজ করবে।

ম্যানেজ করবার দরকার কী?

আরে তোমার জিনিস তুমি ফেরত নেবে না?

কী দরকার? আমার মা-বাবার কাছে তোমার গল্পটাই সত্য হয়ে থাক। তাঁরা মনে করুক হ্যাঁ, হাইজ্যাকাররাই ধরেছিল আমাকে, জিনিসপত্র সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

এটা কোনও কথা হতে পারে না।

পারে। না হয় ধর তোমাকে আমি জিনিসগুলো গিফট দিলাম।

মোটর সাইকেল চেন টাকাভর্তি মানিব্যাগ সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিস হবে। এত টাকার জিনিস কেউ কাউকে গিফট দেয় না।

কারও কথা জানি না, আমি তোমাকে দিলাম।

তুমি দিলেও আমি তা নিতে পারি না।

কেন?

সব কেনর জবাব হয় না।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন স্বরে যুবরাজ বলল, আচ্ছা ওমর, তোমার মোটর সাইকেলের নাম্বার তোমাদের বাড়ির কেউ জানে না?

বোধহয় না। আমরা চারজন মানুষ যে যাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। পাপা তাঁর বিজনেস নিয়ে, মামণি আছেন বইপত্র নিয়ে, আমি আমাকে নিয়ে, রিখু রিখুকে নিয়ে। সাধারণত কেউ কারও দিকে তাকিয়ে দেখি না আমরা।

কিন্তু তোমার মা-বাবা আর বোনকে কাল থেকে তোমার ব্যাপারে যতটা আকুল হতে দেখেছি তাতে তো মনে হয় না যে তোমরা যে যাকে নিয়ে ব্যস্ত থাক। অন্যের দিকে তাকিয়েও দেখ না।

এটা দেখে আমিও খুব অবাক হয়েছি। দীর্ঘকাল আমাদের ফ্যামিলিতে পরস্পরের জন্য এতটা টান আমি দেখিনি। এক দিক দিয়ে আমার গতকালকার ব্যাপারটি ভালই হয়েছে। একসঙ্গে থেকেও আমরা চারটি মানুষ যে আলাদা ছিলাম এতকাল, সেটি ভেঙে গেছে। অনেককাল আগের মতো, ছেলেবেলার মতো মামণি পাপা আমি আর রিখু আবার একত্রিত হয়েছি। এখন থেকে আর কখনও বিচ্ছিন্ন হব না আমরা।

যুবরাজ সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, এবার তাহলে কালকের ঘটনাটা বল। কারা ওরকম একটা জায়গায়...

কথাটা শেষ করতে পারল না যুবরাজ তার আগেই পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে ওমরের রুমে এসে ঢুকল মুনা। কোনও দিকে না তাকিয়ে সরাসরি ওমরের বেডের সামনে এসে দাঁড়াল সে। মুহূর্তের জন্য থামল। তারপর দুহাতে ওমরকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার জন্য, সব আমার জন্য। আমিই ওদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। আমার জন্যই ওরা তোমাকে অমন করে মেরেছে। ওমর, ওমর তুমি আমাকে মাফ করে দাও। মাফ করে দাও।

প্রথমে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিল ওমর। মুনার কান্না দেখে নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর দুহাতে মুনাকে জড়িয়ে ধরল। মুনার ঘাড়ের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমার একটুও লাগেনি। মুনা, সত্যি বলছি আমার একটুও লাগেনি।

দৃশ্যটা দেখে যুবরাজের ঠোঁটে মুচকি একটা হাসি ফুটে উঠল। ওমরের রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় যুবরাজ মনে মনে বলল, ও, তাহলে এই ব্যাপার!

ওমরের চোখের খুব ভেতরে তাকিয়ে মুনা বলল, বল তুমি আমাকে ভালবাসবে।

ওমরও তাকাল মুনার চোখের খুব ভেতরে। মুনার চোখের ভেতর দিয়ে দেখতে পেল তার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা আবেগ এবং চিরকালীন প্রেম। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে।

মুনা এসে ওমরের রুমে ঢুকবার পরই, ওমরের হাত জড়িয়ে ধরবার পরই ওমর মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিল গতকালকার সব কথা। মুনার বন্ধুরা মুনার কারণেই মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল ওমরকে। তারপর নির্জন একটি জায়গায় ফেলে রেখে এসেছিল। যুবরাজ তুলে না আনলে এতক্ষণ কোথায় থাকত ওমর, কী অবস্থায় থাকত কেউ জানে না। বেঁচে থাকত কি মরে যেত কেউ জানে না! আর বেঁচে না থাকলে মুনার সঙ্গে তার দেখা হতো কেমন করে! মুনাকে সে পেত কেমন করে!

মুনার চোখের গভীরে তাকিয়ে হৃদয়ের খুব ভেতর থেকে ওমর বলল, আমি বেঁচে আছি কেবল তোমাকে ভালবাসার জন্য। কেবল তোমাকে ভালবাসার জন্য। এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া বেঁচে থাকবার আমার আর কোনও আকর্ষণ নেই।

আলতো করে ওমরের হাতে হাতে রাখল মুনা। আলতো করে বলল, আর কাল তোমাকে ওভাবে ওখানে ফেলে রেখে আসবার পর, তুমি বিশ্বেস করবে না, একটা সময় তোমার জন্য ভেতরে ভেতরে একদম পাগল হয়ে গেলাম আমি। জোর করে রাস্তার মাঝখানে নামিয়ে দিলাম গোগোদের। তারপর পাগলের মতো গাড়ি চালিয়ে গেলাম তোমাকে যেখানে ফেলে এসছিলাম সেখানে। গিয়ে দেখি তুমি নেই। তোমার মোটর সাইকেল নেই। কেবল মাটির ঘাসের ওপর পড়ে আছে টকটকে কিছু লাল গোলাপ।

গোলাপগুলো আমি তোমার জন্য নিয়েছিলাম।

www.shopnil.com

আমার দুর্ভাগ্য তোমার ভালবাসার ফুল গ্রহণ করা হয়নি আমার। জান কথাটা ভেবে তোমার ওই ফেলে আসা ফুলের ওপর লুটিয়ে কী যে আকুল করা কান্না কেঁদেছি আমি। জীবনে অতটা দুঃখের কান্না আমি কখনো কাঁদিনি।

আমি তোমাকে আর কখনও কাঁদতে দেব না। ফুলের মাঝখানে সারাজীবন তোমাকে আমি ধরে রাখব।

মুনা মৃদু হেসে বলল, অত ফুল তুমি পাবে কোথায়?

মুনার হাসিটা খেয়াল করল না ওমর। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলল, ভালবেসে পৃথিবীতে অনেক অনেক ফুল ফুটবে। পৃথিবীর যাবতীয় ফুলই ভালবাসার জন্য ফোটে।

আমিও ফুটেছি ভালবাসার জন্যই।

তুমি কি ফুল!

কাল তোমার ওখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর সারারাত ধরে আমার কেবল মনে হয়েছে আমিও বুঝি কোনও ফুল। এতকাল কলি হয়েছিলাম। কলি ফুটতে চাহে, ফোটে না। কাল যে মুহূর্তে তোমাকে আমি ভালবাসলাম, বিশ্বেস কর, মুহূর্তে সম্পূর্ণ ফুটে উঠলাম আমি। আর সম্পূর্ণ ফুটে ওঠার কী যে সুখ! সেই সুখের রাতের একটি মুহূর্ত ঘুমুতে পারিনি আমি। ভোরবেলার চিরচেনা পৃথিবী আনকোড়া নতুন মনে হয়েছে আমার। যেন চোখ খুলে এই প্রথম পৃথিবীর আলো-হাওয়া এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটল আমার। এসবই তোমাকে ভালবাসার জন্য। ওমর, প্রিয়তম ওমর কেবল তোমার জন্যে, কেবল তোমার জন্য জন্মেছি আমি। তোমাকে ভালাবাসার জন্য ফুলের মতো সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছি। তুমি আমাকে নাও। গ্রহণ কর।

দুই করতলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে মুনার গোলাপ রঙ গোলাপের মতো মুখটা তুলে ধরল ওমর। হৃদয়ের আবেগ ভালবাসা এবং প্রেম একত্র করে বলল, তুমি আমার। আমার। কেবল আমার। যে মুহূর্তে তোমাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম সেই মুহূর্তেই ভালবেসেছিলাম। তুমি টের পাওনি। কতকাল, কতকাল তোমাকে পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন ঘুরে বেরিয়েছি আমি। কতরাত তোমার কথা ভেবে, শুধু তোমার কথা ভেবে কেটে গেছে আমার। কতকাল তুমি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও মানুষের কথা ভাবতে পারিনি আমি। তুমি জান না আমার প্রতিটি রোমকূপ কতকাল ধরে তোমার কথা বলে। আমার হৃদয় কতকাল ধরে উতলা হয়ে আছে তোমার আশায়। মুনা, আমার প্রেম, তুমি জান না একজীবনে তোমার বন্ধু গোগোদের চে' অনেক বেশি দুঃসাহী ছিলাম আমি। অনেক বেশি রাগী ছিলাম। জেদি ছিলাম। তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকে কখন কোন ফাঁকে যে ওসব রাগ জেদ হাওয়া হয়ে গেছে আমার শরীর থেকে আমি টের পাইনি। আমি একদম টের পাইনি কখন আমার শরীরের ভেতর রাগ জেদের জায়গায় জায়গা করে নিয়ে ভালবাসা, প্রেম। নয়তো তোমার বন্ধুরা যখন চারদিকে ঘেরাও করে মারছিল আমাকে, তুমি দেখেছ আমি একদম

প্রতিবাদ করিনি। অসহায় শিশুর মতো মার খেয়ে গেলাম। এমনকি মার ঠেকাবার চেষ্টা পর্যন্ত করিনি। যদিও আমার ভেতর এক সময় আলতো করে মাথা তুলেছিল আমার পুরনো রাগ, জেদ। নিজের অজান্তেই মুঠো হয়ে যাচ্ছিল হাত। উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু ভালবাসার কাছে নিঃশব্দে হেরে গেছে সব। মার খেতে খেতে জমি নিয়ে নিলাম আমি। অজ্ঞান হয়ে গেলাম। কিন্তু তোমাকে সত্যি করে বলছি ওসবের জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই আমার। দুঃখ নেই। হয়তো বা এই ছিল আমার নিয়তি, হয়তো বা এমনই ছিল কথা, তোমাকে আমি এমন করে পাব। তোমাকে পেয়ে গেছি, পৃথিবীর কাছে, কোনও মানুষের কাছে, আমার সমগ্র জীবনের কাছে আমার আর কিছু চাইবার নেই।

দুহাতে মুনার মুখটা তারপর বুকে চেপে ধরল ওমর। ওমরের বুকে গভীর আবেগে মুখ ঘসতে ঘসতে মুনা বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি। এমন ভালবাসা পৃথিবীতে কেউ কাউকে কখনও বাসেনি।

ওমরের বুক থেকে মুখ তুলল মুনা। বোধহয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই রুমের দরজায় তিনজন মানুষের ছায়া পড়ল। মা-বাবা আর রিখু। দরজার সামনে এসে সবাই থমকে দাঁড়াল। সবার আগে ছিল রিখু। রিখুই হাত ইশারায় থামতে বলল সবাইকে। তারপর চোখ ইশারায় মাকে ডাকল। মুখটা খুবই হাসি হাসি তার।

মুহূর্তে মুনার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মা। তারপর রুমের ভেতর তাকিয়ে দেখেন খানিক আগে দেখা অসাধারণ সুন্দর মেয়েটি তার ছেলে ওমরের বুকের কাছে বসে আছে। বসার ভঙ্গিটা এমন দেখে পৃথিবীর কোনও মানুষেরই বুঝতে অসুবিধা হবে না এই দুজন মানুষের সম্পর্ক কী হতে পারে।

দৃশ্যটা দেখে মনটা কী যে ভাল হয়ে গেল মার। হাত ইশারায় বাবাকে ডাকলেন তিনি। মুহূর্তে বাবা গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। তিনিও তাকালেন রুমের ভেতর। দৃশ্যটি দেখে তাঁরও মন খুব ভাল হয়ে গেল। তিনি ভুলে গেলেন খানিক আগেই এই মেয়েটিকে খুব বেয়াদব মনে হয়েছিল তাঁর।

তিনজন মানুষ যখন দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে মুনা আর ওমরকে দেখছে ওমরও এক সময় দেখতে পেল তাদের। দেখে বিন্দুমাত্র আরষ্ট হলো না সে। খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, কী হলো, তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, ভেতরে এস।

মুহূর্তে মা-বাবা আর রিখু এসে ঢুকল। তাঁদের ঢুকতে দেখে খুবই বিনীত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল মুনা।

ওমর বলল, মুনা, আমার মা, বাবা আর রিখু। আমার একমাত্র বোন।

মুনা খুবই নরম ভঙ্গিতে হাত তুলল।

ওমর বলল, আর এ হচ্ছে মুনা।

রিখু বলল, আগে তো কখনও দেখিনি।

www.shopnil.com

কেমন করে দেখবি! আজই তো প্রথম এল।

মা বললেন, ওমর চল তাহলে বাড়ি যাই।

চল।

বাবা বললেন, তুমিও চল মা। আমাদের বাড়িটা চিনে এস। ওমর তার বেড থেকে নেমে বলল, তোমরা এস। আমি মুনার সঙ্গে যাচ্ছি।

বারান্দায় বেরিয়ে ওরা দুজন পরস্পরের হাত ধরল। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে নার্সিংহোমের টানা লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগল।

বিকেলবেলা দোতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে রিখু। যে কেউ রিখুকে দেখে ভাববে বোধহয় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করছে না সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অলস সময় কাটাচ্ছে। আসলে কিন্তু তা নয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে রিখু তখন একজনের কথা ভাবছিল। সেই একজন রিখুর মনের মানুষ। যুবরাজ। যদিও যুবরাজের সঙ্গে এখনও কোনও কথা হয়নি রিখুর। কেবল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজন দুজনার দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। কথা যা হওয়ার হয়েছে হৃদয়ে হৃদয়ে। মুখে হয় নি। কবে যুবরাজকে নিজের ভালবাসার কথা মুখে বলবে রিখু! কবে হৃদয় থেকে ঠোঁটে আসবে রিখুর ভালবাসার কথা!

আকাশের দিকে তাকিয়ে রিখু মনে মনে বলল, বলব। দেখা হলেই যুবরাজের বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে, যুবরাজের চোখে চোখ রেখে হৃদয়ের যাবতীয় আবেগ দিয়ে আমি বলব, যুবরাজ আমি তোমাকে ভালবাসি। তারপর একটু থেমে বলব, বল তুমিও আমাকে ভালবাস। তুমি আমাকে ভাল না বাসলে আমি যে আমি যে...

ভাবনাটা শেষ হলো না রিখুর, তার আগেই রিখুদের বাড়ির বিশাল লনে সাঁ সাঁ করে এসে ঢুকল একটি নীল রঙের প্রায় নতুন সুজুকি মোটর সাইকেল। সেই মোটর সাইকেলে হেলমেট পরা যুবরাজ। লনে ঢুকেই দুটো পা মোটর সাইকেলের দুদিকে নামিয়ে দিল যুবরাজ। মাথা থেকে খুলল হেলমেট। দোতলার রেলিং থেকে রিখু দেখতে পেল বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় যুবরাজকে দেখাচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম যুবকের মতো। তারপর আর কিছু মনে রইল না রিখুর। পাগলের মতো ছুটে নিচে নেমে এল সে।

যুবরাজ যে এই বাড়িতে এসেছে খবরটা ততক্ষণে ওমরের কানেও গেছে। সে ছিল নিচের ড্রয়িংরুমে। খানিক আগেই চলে গেছে মুনা। মুনাকে বিদেয় দিয়ে ওপরে নিজের রুমে যাওয়ার আর সময় পায়নি ওমর। তার আগেই মোটর সাইকেল নিয়ে যুবরাজ সোজা ঢুকে গেছে তাদের লনে। মোটর সাইকেলের শব্দ পেয়ে ওমর এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। তারপর যুবরাজকে দেখে মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে তার।

www.shopnil.com

গভীর বন্ধুত্বের গলায় ওমর বলল, এস।

সঙ্গে সঙ্গে মোটর সাইকেল থেকে নামল যুবরাজ। হেলমেট রাখল মোটর সাইকেলের সঙ্গে ঝুলিয়ে। তারপর বারান্দায় উঠে, চাবিটা ওমরের হাতে দিয়ে বলল, এই তোমার মোটর সাইকেল ওমর।

চাবিটা হাতে নিয়ে থতমত খেয়ে গেল ওমর। আমার মোটর সাইকেল কি তুমি ফেরত দিচ্ছ?

যুবরাজ হেসে বলল, বাহ্, তোমার জিনিস তোমাকে ফেরত দিতে হবে না।

কিন্তু আমি যে তোমাকে গিফট দিয়েছিলাম।

কখন যে রিখু এসে দাঁড়িয়েছে ওমরের পেছনে ওমর খেয়াল করেনি। খেয়াল করল যুবরাজ। ওমরের কথার জবাব না দিয়ে রিখুর দিকে তাকাল সে। রিখু সরাসরি তাকিয়ে ছিল যুবরাজের দিকে। চোখে কী যে আকর্ষণ রিখুর! রিখুর দিক থেকে কিছুতেই নিজের চোখ সরাতে পারল না যুবরাজ।

ওমরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন দিকে যুবরাজের তাকিয়ে থাকা খেয়াল করল ওমর। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল সে। তারপর রিখুকে একপলক দেখে আবার মুখ ফেরাল যুবরাজের দিকে। যুবরাজ ততক্ষণে রিখুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনেছে।

গলায় দুহাত দিয়ে মোটা সোনার চেনটা খুলতে খুলতে যুবরাজ বলল, কোনও কাজ করে তার বিনিময়ে গিফট নেয়া যায় না বন্ধু! এই নাও তোমার চেন।

চেনটা ওমরের হাতে দিয়ে হিপপকেট থেকে ওমরের টাকাভর্তি মোটা মানিব্যাগটা বের করল যুবরাজ। ওমরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এখান থেকে একটি পয়সাও ব্যয় করিনি আমি। তুমি ভাল থেক। ভালবেসে সুন্দর হোক তোমাদের জীবন। চলি।

ওমর কথা বলবার আগেই বারান্দা থেকে লনে নামল যুবরাজ। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে গেটের দিকে হেঁটে গেল। পেছনে যে ওমরের চেও বেশি উৎসুক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে রিখু। যুবরাজ একবারও রিখুর কথা ভাবল না। রিখুর দিকে ফিরে তাকাল না। এতটা নিষ্ঠুর যুবরাজ হলো কেমন করে!

কথাটা ভেবে হৃদয় ভেঙে গেল রিখুর। চোখ ফেটে যেতে চাইল। রিখুর ছলছল চোখ যাতে ওমরের চোখে না পড়ে সেই ভয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠল রিখু। কিন্তু এখুনি তো দোতলায় আসবে ভাইয়া। মা-বাবা এবং ভাইয়া মিলে নিশ্চয় যুবরাজকে নিয়ে এখন আলোচনায় মাতবে। সেই আলোচনায় রিখুরও নিশ্চয় ডাক পড়বে। কিন্তু ওই তিনজন মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কোন প্রাণে কেমন করে যুবরাজের কথা শুনে যাবে রিখু! চেহারা বিষণ্ণ হয়ে যাবে না তার! চোখ ফেটে যাবে না! নিজেকে কেমন করে লুকিয়ে রাখবে রিখু! মা-বাবা এবং ভাইয়ার চোখ এড়াবার জন্য রিখু

তারপর সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠে গেল। ছাদে উঠে সিঁড়ি কোঠার পশ্চিম দিককার রেলিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে রিখুদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা বহুদূর অব্দি দেখা যায়। সেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে রিখু দেখতে পেল পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে খুবই আস্তে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে যুবরাজ। শেষ বিকেলের ফুরফুরে হাওয়ায় চুল উড়ছে তার। এই এত দূর থেকে যুবরাজকে যে কী অসহায় আর একা মনে হয়।

দৃশ্যটা সইতে পারে না রিখু। বুক ফেটে যায় তার। চোখ ফেটে যায়।

যুবরাজের দিকে তাকিয়ে রিখু মনে মনে বলল, তুমি কেন চলে গেলে! কেন! তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল! অনেক কথা! কেন আমার কথা না শুনে অমন করে চলে গেলে তুমি!

ছাদের রেলিংয়ে চিবুক রেখে হু হু করে কাঁদতে লাগল রিখু।

—

Thank You For Visiting

www.shopnil.com

A New Dream , A New Destination
www.shopnil.com
we request you to join our text and voice chat